আবুল ‘আতাহিয়্যা ও ইবনুল ফারিদ বিরচিত যুহদ কবিতা: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

(Ascetic Poems of Abul ‘Atahiyya and Ibnul Farid: A Comparative Analysis)

আরবী বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ(থিসিস)

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

গবেষক
মোহাম্মদ আমিনুল হক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

জুন, ২০২০ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

আবুল আতাহিয়্যা ও ইবনুল ফারিদ বিরচিত যুহদ কবিতা: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

(Ascetic Poems of Abul Atahiyya and Ibnul Farid: A Comparative Analysis)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ(থিসিস)

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

মোহাম্মদ আমিনুল হক

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

জুন, ২০২০ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক জনাব মোহাম্মদ আমিনুল হক রেজিঃ নং-হ-৬৬/২০১৬-২০১৭(পুনঃ), যোগদানের তারিখঃ ২১.১১.২০১৫খ্রি. কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত **"আবুল আতাহিয়্যা ও ইবনুল ফারিদ বিরচিত যুহদ কবিতাঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা** (Ascetic Poems of Abul Atahiyya and Ibnul Farid: A Comparative Analysis)" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ(থিসিস) টি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের(থিসিসের) সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রী/ ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভ (থিসিস) টি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং এটি আরবী বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার জন্য চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করছি।

তারিখ, ঢাকা

জুন, ২০২০ খ্রি.

(প্রফেসর ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **"আবুল আতাহিয়্যা ও ইবনুল ফারিদ বিরচিত যুহদ কবিতা: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা** (Ascetic Poems of Abul Atahiyya and Ibnul Farid: A Comparative Analysis)" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ(থিসিস)টি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক (পিইচ.ডি. আলীগড়)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটি আমার একক একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভ (থিসিস) টির সম্পূর্ণ বা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

তারিখ, ঢাকা

জুন, ২০২০ খ্রি.

(মোহাম্মদ আমিনুল হক)

পিএইচ.ডি. গবেষক

রেজি:নং-হ-৬৬/২০১৬-২০১৭(পুন:)

যোগদানের তারিখ: ২১.১১.২০১৫

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় মহান প্রভু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মেহেরবাণীতে "আবুল আতাহিয়্যা ও ইবনুল ফারিদ বিরচিত যুহদ কবিতা: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা (Ascetic Poems of Abul 'Atahiyya and Ibnul Farid: A Comparative Analysis)" শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করে পেশ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি। সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক, অধ্যাপক আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতি। শত কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও ছাত্র গবেষকদের নিরলস কল্যাণকামী জ্ঞানতাপস এই শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক আমার গবেষণা কর্মের জন্য অসামান্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর নিরন্তর অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও সার্বক্ষনিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে এবং তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার ফলে অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন হয়েছে। আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায় বিন্যস্তকরণ এবং এর অবয়ব ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁর নিরলস আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতায়। এ জন্য আমি তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী। এ মুহূর্তে আরো স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম আলহাজ্ব হযরত মওলানা হারুন-অর-রশিদ, শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান আলহাজ্বা ফজিলতুন-নিসা, আমার সহ-ধর্মীনি ফারজানা আনজুম বৃষ্টি, আমার কন্যাদ্বয় সোফিয়া নওরীন তোহ্ফা এবং সোহিফা নওশীন জাদ্ওয়াকে। তাঁদের অপরিসীম আত্মত্যাগের কারণেই আমি জীবনের এতটুকু পথ এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। আজ এমনই এক স্মরণীয় মুহুর্তে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আব্বা-আম্মার পবিত্র আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করছি।

গবেষণাকর্মটির সার্বিক উন্নয়নে বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ বিশেষ করে তৎকালীন বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও বর্তমানে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক আমাকে স্নেহের নজরে দেখেছেন। বিভাগীয় সেমিনার করার ব্যাপারে আরবী বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ আমার প্রতি ঐকান্তিক সহযোগিতা প্রদর্শন করেছেন। আরবী বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মো. আবদুল কাদির ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউছুফ গবেষণার দূর্লভ উপাত্ত সরবরাহ করে ও দিক নির্দেশনা দিয়ে আপন জনের মত আমাকে সহায়তা করেছেন। এতদ্ব্যতীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরীর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রতিও আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অফিসের জরুরী কাজে আরবী বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং রেজিস্ট্রার অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ আমাকে অকৃত্রিম ভালোবাসা দেখিয়েছেন। তাঁদের এ অবদানের কথা আমি কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্মরণ করছি এবং আল্লাহর দরবারে তাঁদের জন্য উত্তম প্রতিদানের নিবেদন করছি। পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করে সকলের সার্বিক কল্যাণ কামনায় বিনীত প্রার্থনা করছি। আমীন।

মোহাম্মদ আমিনুল হক
পিএইচ.ডি. গবেষক, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী প্রতিবর্ণায়ন নীতিমালা

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
ا	আ	ز	য	ق	ক
ب	ব	س	স	ك	ক
ت	ত	ش	শ	ل	ল
ث	ছ	ص	স	م	ম
ج	জ	ض	দ	ن	ন
ح	হ	ط	ত	و	ভ/ওয়া
خ	খ	ظ	জ	ه/ة	হ/ত
د	দ	ع	ـَـ	ء	ـُـ
ذ	য	غ	গ/ঘ	ي-ى	ইয়া
ر	র	ف	ফ	عُ	উ

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

		■ প্রত্যয়ন পত্র	i
		■ ঘোষণা পত্র	ii
		■ কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iii
		■ আরবী প্রতিবর্ণায়ন নীতিমালা	iv
ভূমিকা	:		১-২৮
প্রথম অধ্যায়	:	আবুল ‘আতাহিয়্যা ও ইবনুল ফারিদের সমকালীন আরবী কবিতা	২৯-৬০
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	আরবী যুহ্দ ও সূফী কবিতার উৎপত্তি ও বিকাশ	৬১-৮০
তৃতীয় অধ্যায়		আবুল ‘আতাহিয়্যার জীবন ও যুহ্দকাব্য	৮১-১২০
চতুর্থ অধ্যায়	:	ইবনুল ফারিদের জীবন ও সূফীকাব্য	১২১-১৬৪
পঞ্চম অধ্যায়	:	আবুল ‘আতাহিয়্যাহ ও ইনুল ফারিদ বিরচিত কবিতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য	১৬৫-১৮৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	আবুল আতাহিয়্যা ও ইবনুল ফারিদ বিরচিত যুহ্দ কবিতা :একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা	১৮৫-২১২
উপসংহার	:		২১৩-২২৪
গ্রন্থপঞ্জি	:		২২৫-২৩৪

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আরবী সাহিত্য দেড় হাজার বছরেরও অধিক সময়ের আরব সভ্যতার ঐতিহ্য ও জীবনবোধের শিল্পায়িত একটি অভিব্যক্তি। এ সুদীর্ঘ চলার পথে আরবদের জীবন শত ধারায় প্রবাহিত হয়। ধারা প্রবাহের এ বহুমাত্রিকতা 'ইরাক, সিরিয়া ও মিসরের আরবী পদ্য সাহিত্যে যেমন এনে দিয়েছে বৈচিত্র্য তেমনি করেছে একে সমৃদ্ধ। এক সময় বেদুঈন বেশে আরব কবিগণ তাদের মনের কথা রসসিক্ত-সরল অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ বর্ণনায় উচ্চারণ করেছেন। 'আব্বাসীয় যুগের শেষ প্রান্তে অথবা তারো অব্যবহিত পরে এসে আয়্যূবী সুলতানদের শাসনামলে কাব্যসাহিত্যের মাধ্যমে কবিগণ সুন্দরতম শৈল্পিক রূপকে অনায়াসে নির্মাণ করেছেন। আরবী কবিতা আরবী সাহিত্যেরই একটি প্রধান শাখা হিসাবে কবিতার মাধ্যমে আরবী সাহিত্যের প্রথম উন্মেষ ঘটে। জাহিলী যুগে আরবের অধিবাসীরা আরবী ভাষায় কথা বলতো। মিসর ও সিরিয়ার আয়্যূবী সুলতান ও শাসকবৃন্দ তুর্কী-কুর্দী বংশোদ্ভুত হলেও তাঁরা আরবী ভাষায় কথা বলতেন এবং ব্যাপক হারে এই ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতেন। তাঁদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় আরবী কাব্যচর্চা আব্বাসীয় ধারায় অব্যাহত থাকে। খৃষ্টীয় ১২শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আয়্যূবী সুলতানদের রাজত্বের (১১৮২-১২৬০খ্রি) প্রায় ৯০ বছরের মধ্যে মিসর ও সিরিয়ার আরবী কবিতায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকারী এবং সূফীপন্থি কবিগণের দল নামে দু'টি কাব্যধারা আত্মপ্রকাশ করে, যা সেখানকার কবিদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। এ উভয় আন্দোলনই সুন্নী মতাবলম্বী সালজূক সুলতানদের(১০৩৭-১৩০০খ্রি) অধীনে ফাতিমী 'আলবী শী'আদের বিপরীতে পরিচালিত এবং সাহিত্যিক পূণর্জাগরণের সঙ্গে সংশিষ্ট ছিল। আরবী কবিতার বিকাশ্বরূপে এই পুর্ণজাগরণ সালজূক সুলতানগণের অধীনে ইরাকে এবং যাঙ্গী ও আয়্যূবী সুলতানদের শাসনামলে সিরিয়া ও মিসরে বিস্তার লাভ করে। জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের প্রধান বাস্তব বিষয় ছিল সাহিত্যি, শিক্ষাদীক্ষা ও কাব্যচর্চাকে ক্রমান্বয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভের ফলে তা আয়্যূবী সুলতানদের যুগে ব্যাপক প্রসার লাভ করে।[১]

আরবী সাহিত্যের ইতিহাস বহুলাংশে ইসলামের ইতিহাসের উত্থান-পতনের সাথে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। আরবদেশগুলোর সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সাথেও আরবী সাহিত্যের ক্রমবর্ধমান উন্নতি অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিলো। ইসলামপূর্ব যুগ থেকে ইসলামের আগমন পর্যন্ত আরবী কবিতা বিশুদ্ধ জাগতিক ও সেকুলার সাহিত্য হিসাবে বিবেচিত হতো। তখন থেকে বর্তমানযুগ পর্যন্ত তা আরব বিশ্বে একটি উল্লেখযোগ্যলোকায়ত সাহিত্য হিসাবে বিস্তার লাভ করতে থাকে। বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফতের আমলে আরবী পদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ করে যুহ্দ কবিতা

Dhaka University Institutional Repository

রচনার ক্ষেত্রে কবি আবুল 'আতাহিয়্যা(হি.১৩০-২১১/খ্রি.৭৪৮-৮২৬) ছিলেন এক বিরল প্রতিভা এবং এর সাহিত্যাকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। এ সময় খলীফা মামুনুর রশীদ(৮১৩-৮৩৩খ্রি.) 'আব্বাসীয় খিলাফতের মসনদে আসীন ছিলেন। অবুল 'আতাহিয়্যা তাঁর অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার মাধ্যমে আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিরল স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। আবার, মিসরে 'আব্বাসীয় খিলাফতের নামে আয়্যুবী সুলতানদের শাসনামলের(১১৭১-১২৬০খ্রি.) বিখ্যাত সূফীকবি ইনুল ফারিদের(হি.৫৭৬-৬৩২/খ্রি.১১৮১-১২৩৪) সূফী কবিতা মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। আধুনিক যুগে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ইসলামী আধ্যাত্মিকতা বা মরমী হিসাবে যখন তাসাউফের বিকাশ হয় তখন এর ধারক ও বাহক সূফীগণ তাঁদের রাগ অনুরাগ ও অনুভূতি ব্যক্ত করার জন্য কাব্যের ছাঁচে রচনার প্রতি তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তাঁদের রচনাসমূহ মহান আল্লাহর প্রতি তাঁদের নিরলস ভালবাসার নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।[২] তাই বলা হয়:[৩]

"The overwhelming desire to be near him or even enter metaphysical union, their intoxication when God's presence could be felt, and their pain and feeling of being forsaken when God seemed far".

সূফী তত্ত্বের আধ্যাত্মিক পরিমাপের রীতি বা মডেল রূপে মরমী কবিতা তথা যুহ্দ কবিতা কবি আবুল 'আতহিয়্যা কর্তৃক প্রকাশ ও বিকাশ লাভ করে। প্রিয়সী পুরুষ অথবা মহিলা যে কেউ হোক না কেন, তখন থেকে আরবী গযল রূপে প্রেমকাব্য সাধারণত আধ্যাত্মিক কবিতা হিসাবেও রচিত হতে থাকে। দরিদ্র পরিবারে কবি আবুল 'আতাহিয়্যার জন্ম। বংশীয় কৌলিন্যও তাঁর ছিলোনা। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার্জন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে তিনি জীবন, জগৎ ও পারিপার্শিক অবস্থা থেকে ব্যাপক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। দারিদ্রের কাছে তিনি হার মানেননি। তাঁর ছিল অনন্য সাধারণ কাব্যপ্রতিভা। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। অফুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্য ও নিরলস সাধনার মাধ্যমে তিনি তাঁর কাব্যপ্রতিভার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হন। বহু ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে স্বীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। সমকালীন রাজন্যবর্গের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। তখন ছিল আব্বাসী খিলাফতের যুগ। খলীফা মাহদী, হাদী ও হারুনুর রশীদ তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি হয়ে উঠেন দরবারী কবি। খলীফাদের সুদৃষ্টি তাঁকে বিশাল সম্পদের অধিকারী করলেও তিনি জাগতিক ভোগ বিলাসে গা ভাসিয়ে দেননি। পারিপার্শিক জীবন ও জগতে ছড়িয়ে থাকা অসঙ্গতি ও অভিজাত শ্রেণির ভোগবাদী চরিত্র তাঁকে দুনিয়া বিমুখ করে তুলে। তিনি নির্মাণ করতে থাকেন অসাধারণ সব যুহদ বা তাপস কবিতা। এক সময় তিনি হয়ে উঠেন যুহদ কবিতার প্রতীক।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

আবুল 'আতাহিয়্যার পূর্বপুরুষের পেশা ছিল মৃৎপাত্র তৈরি করা। কবি তাঁর ভাইদের সাথে পারিবারিক মৃৎপাত্র তৈরির কারখানায় কাজ করতেন। এ জন্য তিনি 'আল জাররার' বা কুম্ভকার নামেও পরিচিত ছিলেন। আবুল 'আতাহিয়্যা শুধু মৃৎপাত্র তৈরিই করতেন না, তৈরি মৃৎপাত্রগুলো খাঁচি ও জালের থলে করে মাথায় ও পিঠে বহন করে কুফার পথে পথে ও অলিতে গলিতে বিক্রি করতেন। মালামাল ফেরি করার সময় তাঁর মনে কবিতা আবৃত্তির আবেগ জাগ্রত হতো এবং তখন মনের সুখে ও আনন্দে তিনি কবিতা আবৃত্তি করতে থাকতেন। এ ছাড়া মৃৎপাত্র তৈরি করার সময়ও তিনি কবিতা আবৃত্তি করতে থাকতেন। আবুল 'আতাহিয়্যা স্বীয় কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী ও সচেতন ছিলেন। সে সময় বাগদাদ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু। মাওসিলবাসী ইবরাহীম নামের এক বন্ধুর সাথে তিনি কুফা থেকে বাগদাদ পৌঁছেন। অতঃপর তিনি হীরাতে অবস্থান করতে থাকেন। এখানে তাঁর কাব্য সাধনা চলতে থাকে। চারদিকে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তখন ছিল বাগদাদে আব্বাসীয়দের শাসনামল। খিলাফতের আসনে সমাসীন ছিলেন খলীফা মাহদী বিন মানসূর। মাহদী যেমন ছিলেন প্রজাবৎসল তেমনি সাহিত্যামোদী। আবুল আতাহিয়্যার সুখ্যাতি মাহদীর দরবারে পৌঁছলে তিনি তাঁকে ডেকে পাঠান। কবি বাগদাদ গমন করেন এবং খলীফা মাহদীর দরবারে উপস্থিত হয়ে স্তুতিমূলক কবিতা পাঠ করে তাঁকে মুগ্ধ করেন। আবুল 'আতাহিয়্যার কাব্য প্রতিভায় বিমুগ্ধ খলীফা তাঁকে পুরস্কৃত করেন। অতঃপর খলীফা মাহদীর আশ্রয়ে কবি বাগদাদেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। খলীফা মাহদী থেকে খলীফা মামুন পর্যন্ত বাগদাদের সকল খলীফার সাথে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। আবুল 'আতহিয়ার মৃত্যুর তারিখ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশের গ্রহণযোগ্য মতে ২১১/৮২৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। এ সময় খলীফা মামুনুর রশীদ খিলাফতের মসনদে আসীন ছিলেন। বাগদাদের পশ্চিম উপকণ্ঠে তাঁকে দাফন করা হয়।[৫]

বিষয়বস্তুনির্বাচনের ক্ষেত্রে কবি আবুল 'আতাহিয়্যা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আবহমান কাল ধরে বয়ে আসা প্রাচীন সাহিত্যের বিষয়সমূহ বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে নতুন বিষয় নিয়ে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। এক প র্যায়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে কম রস পূর্ণ যুহ্দ কবিতা দিয়েই তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর বিরল প্রতিভা, নিরলস সাধনা ও অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি প্রধান নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। ধর্মতাত্ত্বিক এসব কবিতার মাধ্যমে তিনি জাতিকে বার্তা পাঠিয়েছেন – শুদ্ধতা, সততা, তাকওয়াহ, সৎকর্মই গৌরবের বিষয়; বংশ গরিমা, আভিজাত্য, উচ্চপদস্থ কর্মজীবন শ্রেষ্ঠত্বের কোন বিষয় নয়। দুনিয়াই শেষ ঠিকানা নয়;অনিবার্য মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আখিরাতে পদার্পণ করতে হবে। আর জবাবদিহিতার কঠিনতম স্থান এই আখিরাত। সেখানে যে ব্যক্তি মুক্তি অর্জন করবে সে-ই সফল। এই সফলতার স্বাদ সে অনিঃশেষ কাল ধরে ভোগ করতে থাকবে। আর

Dhaka University Institutional Repository

এ জন্য প্রয়োজন অল্পে তুষ্টি, সৎ জীবন-যাপন. ধৈর্য ও সহনশীলতা, তাওবা ও ইস্তিগফার সর্বোপরি মহান স্রষ্টা আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পদাংক অনুসরণ। এ ভাবেই শেষপর্যন্ত তাঁর রচিত কবিতা মরমীবাদের পথিকৃৎ হয়ে উঠে।[৬]

আবুল 'আতাহিয়্যা জন্মগতভাবেই স্বাভাবিক কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর কাব্যে অভিনবত্বের স্বাদ পরিলক্ষিত হয়। সহজ-সরল স্বাভাবিক লিখনভঙ্গি হ্রস্ব ছন্দ এবং উচ্চতর দার্শনিক ভাবধারা তাঁর কাব্যে লক্ষ্যণীয়। তাঁর কাব্যে ছিল এক মোহনীয় আকর্ষণ। নিরক্ষর বেদুঈন থেকে উচ্চ শিক্ষিত বিদগ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি পর্যন্ত তাঁর কবিতা আবৃত্তি করে থাকে। পৃথিবীর যে প্রান্তেই আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চা আছে সেখানেই আবুল আতাহিয়্যার কবিতা পঠিত ও সমাদৃত হয়ে থাকে। আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে সর্ব প্রথম তিনিই প্রমাণ করেছেন, কাব্যের সৌন্দর্যহানী না করেও অতি সহজ ও সাধারণ ভাষা ব্যবহার করে অসাধারণ সব কবিতা রচনা করা যায়। 'ভন ক্রেমার (von kremer)-এর মতে আবু নুওয়াস অপেক্ষা আবুল 'আতাহিয়্যার কাব্য-প্রতিভা ছিল অধিকতর। কবির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচীন কাব্য সম্পর্কে তিনি পাঠ নিতে পারেননি। তথাপি তাঁর কবিতার মান সমসাময়িক কবিদের কবিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিল। ছন্দ মেলানোর জন্য তিনি দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করতেন না। প্রাচীন নিয়ম-কানুনের বন্ধন মুক্ত অনাবিল স্রোতের ন্যায় সহজগামী কবিতা জাতিকে তিনি উপহার দেন। এ জন্য তাঁর রচনা অনায়াসেই বেছে নেওয়া যায়। অনাবিল ভাবধারা ও সহজ-সরল ভাষা দ্বারাই তার পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। আরবী ছন্দ শাস্ত্র উপেক্ষা করে তিনি বহু কাব্য রচনা করেছেন কিন্তু এগুলো কাব্য হিসেবে অপূর্ব হিসেবেই পরিগণিত। এ কথা তাঁর কঠোর সমালোচকরাও স্বীকার করে নিয়েছেন। ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁর এতো দখল ছিল যে, তিনি অনর্গল পদ্যে কথা বলতে পারতেন। এমন হঠাৎ রচিত কিছু কবিতা আছে, যা তাঁর অন্যান্য রচনার মতোই মান সম্পন্ন। তিনি বলতেন, ইচ্ছা করলে তিনি সর্বদা পদ্যে কথা বলতে পারেন।[৭]

আবুল 'আতাহিয়্যা এমন এক কাব্য প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন যা নানাবিধ প্রতিকূলতায় হার মানেনি। দারিদ্র্য আর শিক্ষার অভাব তাঁর প্রতিভাকে ধ্বংস করতে পারেনি। অস্বচ্ছল ও নিচু শ্রেণির বংশীয় পরিচয় তাঁর কাব্য প্রতিভাকে আরো শানিত ও বিকশিত করেছিলো। তিনি ছিলেন প্রচলিত কাব্য প্রথাভাঙ্গা সাহসী কবি। কবিতা রচনার জন্য তিনি ছন্দের কাছে যাননি। ছন্দই তাঁর কাছে এসেছে। আবহমান কাল ধরে আরবী কবিতায় আলোচিত মরুভূমির বাগাড়ম্বরকে সম্পূর্ণ পরিহার করে নাগরিক সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যশীল আরবীকাব্য তিনি জাতিকে উপহার দিয়েছেন। তাঁর প্রতিভা এতো বিভাময় ছিল যে, সমকালীন কাব্যের বিষয়বস্তু তিনি পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। যুহ্দ কবিতার মতো

Dhaka University Institutional Repository

অজনপ্রিয় কবিতা লিখে তিনি খ্যাতিমান হয়ে উঠেন। যুহ্দ কবিতায় তাঁর সফলতা দেখে সমকালীন অন্যান্য কবিও এ জাতীয় কাব্য রচনায় এগিয়ে আসেন। এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে আবু নুওয়াসের নাম প্রণিধানযোগ্য, যদিও তিনি তাঁকে এজাতীয় কবিতা রচনা করতে বারণ করে ছিলেন।[৮]

আবুল 'আতাহিয়্যা সামাজিকভাবে উপেক্ষিত ছিলেন। তিনি সু'দা, 'উতবা প্রেমেব্যর্থ, তদানীন্তন দরবারি, অভিজাত শ্রেণির ভোগ বিলাস, দুর্নীতি ও ধর্মের প্রতি উদাসীন ছিলেননা। শাসক শ্রেণির এহেন অনৈতিক কার্যকলাপ তিনি খুবই কাছ থেকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করে ব্যাথিত ও মর্মাহত হন। বিদগ্ধ এই মহান কবি রচনা করতে থাকেন– ধর্ম নিষ্টা, পার্থিব জীবনের অসারতা, মৃত্যুর চিরন্তন সত্যতা, কালের কুটিলতা, পরকালের পূণ্য সঞ্চয়, মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের ভয়াবহতা প্রভৃতি বিষয়ক কবিতা। তাঁর এসব কবিতা সমকালে এতো জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, তিনি একাগ্রচিত্তে এ জাতীয় কবিতা রচনায় ব্যাপকহারে নিবেদিত থাকেন এবং যথাযত সুখ্যাতি অর্জন করেন। যুহ্দ কবিতায় তাঁর সফলতা প্রত্যক্ষ করে আরো অনেক কবি এতদবিষয়ক যুহ্দ কবিতা রচনায় এগিয়ে আসেন। আবুল 'আতাহিয়্যা প্রথম জীবনে জন্মভূমিতে অবস্থান করলেও যুবক বয়স থেকে আমৃত্যু বাগদাদেই কাটান। তিনি দীর্ঘ ৮০ বছর হায়াত পেয়েছিলেন এবং দীর্ঘ সময় কবিতাই রচনা করে গিয়েছেন। শুধু রচনার আধিক্যে নয় –অনুপম রচনাশৈলী ও মানের আধিক্যের কারণেই তিনি আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত কবি হিসেবে পরিগণিত হয়ে অমর হয়ে আছেন। কবি আবুল 'আতাহিয়্যা ছিলেন সাদা মনের অধিকারী এক দিব্যপুরুষ। তিনি তাঁর দোষ-ত্রুটি অকপটে স্বীকার করে নিতেন। শেষ জীবনে তিনি নির্জনতাকে বেশি করে আঁকড়ে ধরেছেন। তাওবা ইস্তিগফার আর ইবাদাতের মধ্যেই তিনি সময় অতিবাহিত করেছেন। সংসারের সবকিছু ছেড়ে দিলেও কবিতা রচনা করা তিনি ছাড়েননি। তবে শেষ জীবনের কবিতাগুলো ছিল পরকালের মুক্তি ও নাজাতের উসিলা স্বরূপ। সে সময়কার যুহ্দ কবিতাগুলোতে কবির গভীর ধর্মীয় মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। শেষ বয়সে কবি সংসারের যাবতীয় ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হয়ে যান।[৯]

কবি এ ব্যাপারে বলেন:[১০]

تَجَرَّدْ مِنَ الــدُّنْيَـا، فَـاِنَّـكَ اِنَّمَـا   سَقَطتَ اِلَي الدُّنْيَـا، وَاَنْتَ مُجَـرَّدُ
وأفْضَلُ شَيْء نلتَ منْهَـا، فإنــه   مَتَــاعُ قَـليْـلُ يَضْمَحـلُ، وَيَنْفَــدُ

"সংসারের ঝামেলা থেকে মুক্ত হও, তুমি একাকীই সংসারে পতিত হয়েছ। দুনিয়া থেকে যে উৎকৃষ্ট বস্তু অর্জন করেছ যা সামান্য সম্পদ তা বিলীন ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।"

আমরা কবির ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি তাঁর কাব্যে লক্ষ্য করেছি। এর পরিমাণ এতো বেশি যে তাঁকে কোনভাবেই ধর্ম বিষয়ে উন্নাসিক ভাবতে পারি না। আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই কবি আবুল আতাহিয়্যা ছিলেন ইসলামী ভাবধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি ছিলেন দারিদ্র্যপ্রেমী। রাসূলুল্লাহ (স.) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা.)ও দারিদ্র্যপ্রেমী ছিলেন। তিনি একজন যাহিদ হিসেবে দারিদ্র্যকে ভালোবেসেছেন আর এজন্যই দরিদ্রের মতো জীবন কাটাতেই তিনি পছন্দ করতেন। দরিদ্র ব্যক্তির মূল্যায়নে তিনি বলেন:[১১]

اِذَا اَرَدْتَ شَرِيْفَ الـنَّـــاسِ كُلِّــهِـمْ   فَانْظُـرْ اِلَي مَلِكٍ فِىْ زيِّ مِسْكِيْـنٍ
ذَاكَ اللَّذيْ عَظُمَتْ في النَـاس حُرْمَتُـه،   وَذَاكَ يَصْلُحُ للـدنْـياَ، وَللديْـن

"যদি শ্রেষ্ঠ মানুষকে দেখতে চাও তাহলে কাঙালবেশী রাজাধিরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, মানুষের মাঝে যাঁর মর্যাদা অনেক উঁচুতে, আর যিনি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণকামী।"

কবি বিশ্বাস করতেন, প্রয়োজনের বেশি সম্পদ কল্যাণ বয়ে আনে না বরং তা মানুষের দুর্ভোগই বয়ে নিয়ে আসে। কবি আবুল 'আতাহিয়্যা বলেন:[১২]

لَمَّـا حَصَلْتُ عَلَي الْقَنَاعَــةِ، لَمْ اَزَلْ   مَلِكا، يَرَي الْاِكْثَـــارَ كَالْاِقْــــلَالِ
إن القَنَاعَـةَ بالكَفَـافِ هِـي الغِـني،   والفَقْرُ عَيْنُ الفَقْرِ فِي الأَمْـوَالِ

"তুষ্টি অর্জনের পর আমি এমন এক রাজ্যে প্রবেশ করি যেখানে সম্পদকে দুর্ভোগ গণ্য করা হয়। সামান্য পরিমাণে তুষ্টি প্রকৃত ঐশ্যর্য, আর সম্পদে দরিদ্রতাই হলো প্রকৃত দরিদ্রতা ।"

কবি আবুল 'আতাহিয়্যা জনগণের ও গণমানুষের কবি ছিলেন। খলীফার দরবারে থেকেও তিনি সাধারণ মানুষের কাতারে ছিলেন। দরবারি কবির বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে ছিল না বরং তাঁর কাব্যে ভোগ বিলাসের বিপরীত বক্তব্যই পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে গযল কবিতা লিখে পারদর্শীতা অর্জন করলেও শেষ বয়সে যুহদিয়াতই ছিল মূল স্থান। কবির কবিতাই তাঁর স্বভাব, প্রকৃতি বা চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে সমকালীন সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফীসাধক হিসেবেই পেয়েছি। উন্নত নৈতিক চরিত্র তাঁর ব্যক্তিত্বকে সুমহান করে তুলেছিল। এ জন্য তিনি আজও দুনিয়াবিমুখ সুফী বুজুর্গ হিসেবেই পরিচিত। আবুল 'আতাহিয়্যা সেই শিশুকালথেকে আমৃত্যু নিরবচ্ছিন্নভাবে কাব্য রচনা করে গিয়েছেন। তিনি অনেক সময় মুখে মুখে কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর এতো কবিতা যে, তা পূর্ণ সংরক্ষণ বা সংকলন সম্ভব হয়নি। আন্দালুসিয়া মুসলিম স্পেনের খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ ও ধর্মতত্ত্ববিদ ইব্ন আবদিল বার (রহ.) আবুল আতাহিয়্যার ধর্ম বিষয়ক (زهديات) কবিতা সমূহের একটি সংকলন

তৈরি করেছিলেন। কবির বন্ধু ইব্রাহীম আল মাওসিলী তাঁর বহু কবিতার সুরারোপ করেন। এগুলো বহু শহর ও গ্রামে গাওয়া হয়ে থাকে।[১৩]

'আবুল 'আতহিয়্যা তাঁর অনন্য সাধারণ কাব্য প্রতিভা যথাযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে আরবী সাহিত্যে এমন এক স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন যা তাঁর জন্যই সংরক্ষিত ছিল। সহজ-সরল-স্বাভাবিক লিখন ভঙ্গি ও বিষয়বস্তু নির্বাচনের গভীর চিন্তন শক্তি তাঁকে এ স্থানে সমাসীন করে। ফারসী সাহিত্যে যুহদ কবিতায় শায়খ সাদীর যে স্থান আরবী সাহিত্যে আবুল আতহিয়্যার সেই স্থান। তাঁর সমসাময়িক আরব কবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আবু নুওয়াস। ভনক্রেমারের মতে, আবুল আতাহিয়্যার কাব্য-প্রতিভা আবু নুওয়াস অপেক্ষা অধিকতর ছিল। সমকালীন কবিগণ আবুল আতাহিয়্যা সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছেন। তাঁদের মূল্যায়নে সমকালীন কবিদের মাঝে তাঁর স্থান নির্ধারণ করা যায়। প্রখ্যাত কবি আবু নুওয়াস এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, "বৃদ্ধ আবুল আতাহিয়্যা জীবিত থাকতে আমি বড় কবি নই।" জাফর ইব্ন ইয়াহইয়া ও প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ ইয়াহিয়া ইব্ন যিয়াদ আল-ফাররার মতে, "সমকালীন কবিদের মধ্যে তিনি আবুল আতাহিয়্যা সবচেয়ে বড় কবি।" স্বনামধন্য কবি দাউদ ইব্ন যায়িদ ইব্ন রাযীনকে জিজ্ঞেস করা হলো, এই সময়ের বড় কবি কে? তিনি বললেন, আবু নুওয়াস। অতঃপর তাকে বলা হল, আবুল 'আতাহিয়্যা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী? তিনি বললেন, "আবুল আতাহিয়্যা জীন ও ইনসানের মধ্যে বড় কবি"।[১৪]

আবুল 'আতাহিয়্যা তাঁর কবিতায় দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেননি। তিনি জনসমাজ কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দের গাথুনী দিয়েই পঙক্তি নির্মাণ করেছেন। আর তাঁর কবিতার বাক্য সহজ-সরল ও অনায়াসগম্য। মানুষের মুখের কথা তিনি পদ্যাকারে সহজ-সাবলীল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা তাঁর কাব্যকে সহজ-সরল অনাড়ম্বর ও স্বাভাবিক লিখন ভঙ্গি বলেই মনে করি। তাঁর কবিতার ছন্দ ছিল অবাধগামী । সাধারণত: হ্রস্ব ছন্দে তিনি কবিতা লিখেছেন। ছন্দের অনুরোধে কখনও তিনি দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করেননি। আবার আরবী ছন্দ শাস্ত্রকে উপেক্ষা করেও তিনি কবিতা নির্মাণ করেছেন। তাঁর কঠোর সমালোচকও স্বীকার করেছেন যে, তাঁর এসব রচনাও অপূর্ব। উপর্যুক্ত বিষয় সমূহের সাথে যুক্ত হয়েছিল কবির দার্শনিক চিন্তা-ধারা। কবির অর্ন্তদৃষ্টি তাঁর ভাবধারাকে শানিত ও মহিমান্বিত করেছিল। অর্থ ও আঙ্গিকে এক অসাধারণ সাযুজ্য ছিল তার কবিতায়। প্রচলিত ও সহজবোধ্য শব্দ, সরল ও অনাড়ম্বর বাক্য এবং হ্রস্ব ছন্দ–সবমিলে যেন বাচিকের ঝর্ণাধারা। সহজ-সরল বাগপদ্ধতি অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ভরা দার্শনিক চিন্তা-ধারা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই এর প্রতি সমর্থন দিয়েছেন। তাঁর কবিতার মধ্যে ছিল সুরের মূর্ছনা। তাঁর বন্ধু ইব্রাহীম আল মাওসিলী তার অনেক কবিতায় সুরারোপ করেন– যা বহু শহর, ও গ্রামে গাওয়া হয়ে থাকে। মোদ্দাকথা, আবুল

আতাহিয়্যা সমকালীন আরবী সাহিত্যসমাজে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গোটা আব্বাসী যুগে তাঁর সমকক্ষ কবি খুব কম সংখ্যকই ছিলেন। বিশেষ করে মরমী কবিতায় তিনিই ছিলেন সেরা কবি।[১৫]

কবি আবুল 'আতাহিয়্যা সাধারণ একজন কুম্বকার থেকে ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠেন। এজন্য তাঁকে দীর্ঘ বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। কবিত্ব শক্তির নিয়মিত পরিচর্যা ও কঠোর সাধনা তাঁকে সমকালীন সাহিত্যাঙ্গনে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে তিনি কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছেন। তিনি খুব কাছ থেকে ক্ষমতাসীন মানুষের ভোগ বিলাস ও অনাচার অবলোকন করে বিস্মিত ও হতভম্ব হয়েছেন সেই সাথে দুনিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এর আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন। ফলে প্রাসাদের কবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি কালক্রমে হয়ে উঠেন দুনিয়াবিমুখ কবি। তাঁর কবিতার পঙক্তিতে ঝরে পরেছে চিরস্থায়ী আখিরাতের পুঁজি গ্রহণের আকুলতা সেই সাথে দুনিয়ার প্রতি অবজ্ঞা। আব্বাসী যুগে যুহদ কবিতায় তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ কবি।[১৬]

মিসরে আয়্যুবী সুলতানদের শাসনামলের সূফী কবি ইনুল ফারিদ(১১৮১-১২৩৫খ্রি.) অধিকাংশ সমালোচকদের দৃষ্টিতে আজ পর্যন্ত আরবী আধ্যাত্মিক কাব্য সাহিত্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ সূফী কবি ছিলেন। ইবনুল ফারিদ তাঁর বিরচিত ছয়টি গযল(প্রেমকাব্য) কাসীদা জিমিয়্যার অত্যন্ত জটিল জীম অন্ত্যমিল কাসীদাটিতে স্ত্রী বাচক সর্বনাম এবং অবশিষ্ট পাঁচটি কাসীদায় পুরুষবাচক সর্বনাম ব্যবহার করেছেন। তিনি জটিল জীমিয়্যা কাসীদায় প্রেয়সীর চাহনীর মারাত্মক আঘাতের অভিযোগ করে বলেন:[১৭]

ما بين معترَكِ الأحداقِ والمُهجِ، أنا القتيلُ بلا إثمٍ، ولا حرجِ

مُحجبٌ، لو سرَي في مثلِ طُرته، أغنتْهُ غُرتُهُ الغَرَا عن السُرُجِ

وإن ضلِلتُ بليلٍ، من ذوائبِهِ، أهدي، لعيني الهدي صُبْحٌ من البَلَجِ

"দৃষ্টি ও অন্তরের মধ্যবর্তী যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমি বিনা অপরাধ ও দোষে আমি নিহত। তিনি পর্দার আড়ালে রয়েছেন, তবে তিনি যদি তাঁর ললাটের কাল কেশগুচ্ছ অন্ধকারে গমনাগমন করেন, তা হলে তাঁর উজ্জ্বল মুখমন্ডল আলো বিকরণের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং যদি আমি কোন এক রাতে তাঁর কালো কেশগুচ্ছ হারিয়ে ফেলি, তা হলে তাঁর উজ্জ্বল ভ্রু সদৃশ প্রাতকাল আমাকে আমার চোখের দীশা প্রদান করবে"।

একজন মরমী কবি হিসাবে ইবনুল ফারিদের মধ্যম-স্তরের মর্যাদার অধিকারী বলে তাঁর দীওয়ানের ভাষ্যকার গুরায়ব মন্তব্য করে বলেন:[১৮]

"The poet was neither a traditionalist saying that the Creator is a Supreme Being independent of His creation, nor did he believe that God is re-incarnated in the universe and that He is a transcendent reality of which the material universe and man are but mere manifestations. The poet believed that the relationship between God and the world is one of "mutual love", consequently, the universe is united with its Creator in a bond of ecstatic love. God needs the world to help reflect His supreme beauty and perfection. At the same time, the world needs God to come out of its nebulous state and thus regulate, organize and retain its continuity of existence".

মরমী কবি ইবনুল ফারিদের গবেষক ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হিলমী যুক্তিপ্রদর্শন করে বলেন যে, ইবনুল ফারিদ সর্বেশ্বরবাদী ছিলেননা, বরং তাঁর বেশী ঝুঁক ছিলো ইত্তিহাদের প্রতি যা তাঁর দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো। তবে নিকলসন বিষয়টি সম্পর্কে মন্তব্য সহজ নয় বলে মন্তব্য করেছেন।[১৯]

আয়্যুবী সুলতানদের শাসনামলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের একটি বড় ধরনের প্রভাব লেখক শিল্পীদের চাইতে কবিদের স্বভাব চরিত্রের উপর ব্যাপক বিস্তার করে। ফলে কবিগণ খীলফা, সুলতান, আমীর, উযীর ও শাসক শ্রেণীর অতি কাছে অবস্থান করতে সমর্থ হন। মন মানসিকতার পরিবর্তনের সাথে সাথে তাঁরা নতুন সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করার প্রতি অধিক মনোযোগী হয়ে পড়েন। তাঁরা শাসক শ্রেণীর সভায়, দপ্তর ও বিভিন্ন আসরে তাঁদের সঙ্গী হয়ে ও তাঁদের সাথে মেলামেশা করে খোশ-গল্পে নিমজ্জিত হতেন এবং কবিতা রচনা করতেন। সুলতান ও শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে কবিগণ কবিতা রচনার উদ্দেশ্যে মিসর ও সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে থাকেন। এই সুযোগ তাদের পূর্বসূরী কবিগণ কখনো পাননি বলে প্রতিয়মান হচ্ছে।[২০]

তবে ইবনুল ফারিদ এসুযোগ কখনো গ্রহণ করেননি। এরই ফলশ্রুতিতে প্রকৃতিগত ও স্টাইলগত আরবী কাব্য রচনায় তাঁদের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিদেশী ফার্সী ভাষার শব্দ ক্ষেত্র বিশেষে আরবী কবিতায় অনুপ্রবেশ ঘটে। যেমন- ইবন সানা' আল-মালিক-এর মুওয়াশশাহাত কাব্যে এর ব্যাপক অনুপবেশ ঘটে। তবে অপরিচিত শব্দের ব্যবহার পরিহার, বাক্যগঠনে কোমলতা ও সুক্ষতার আশ্রয়, নতুনকলা, শিল্প, ভাবধারা ও ভাষার অলংকারের অধিক ব্যবহার, বাস্তুভিটার স্মরণে কবিতার

সূচনা পরিহার, অট্রালিকা, মহল ও মদের বর্ণনা, উপমা, রূপালংকরের অধিক ব্যবহার, কাসীদার বিভিন্ন অংশের সাথে পরস্পর সম্পর্ক বজায় রাখা এবং কাব্যে ছন্দগত মিল স্থাপনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদি বিষয়গুলো আয়ূবী সুলতানদের যুগের কবিতায় ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। আকৃতি-প্রকৃতির দিক থেকে প্রথমত কবিতা (الشعر) দুই প্রকার। যথা- ১. খন্ড কবিতা, যাকে আরবীতে قطعة বলা হয় এবং ২. দীর্ঘ কবিতা যাকে আরবীতে قصيدة বলা হয়। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে কবিতাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন- ১. কাহিনী কাব্য বা মহাকাব্য (القصصى الشعر, Epic Poetry), ২. গীতি কবিতা (الغنائى الشعر) ও ৩. নাট্য কাব্য (التمثيلى الشعر) (Dramatic Poetry)।[২১]

মঙ্গোলীয়ান হালাকু খান(আনু.১২১৭-১২৬৫খ্রি.) কর্তৃক ৬৫৬/১২৫৮ সালে বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফত এবং ৫৬৭/১১৭১ সালে সালাহুদ্দীন আয়্যুবী কর্তৃক মিসরে ফাতিমীয় খিলাফতের পতন ঘটে। এ সময় সিরিয়া ও মিসরে বাগদাদভিত্তিক নামেমাত্র আব্বাসীয় খিলাফতের অনুকরণে আয়্যুবী সুলতানদের(১১৭১-১২৬০খ্রি) ৯০ বছরের সুন্নীশাসনের খিলাফত সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যুবী (১১৭১-১১৯৩খ্রি.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। চারজন আয়্যুবীসুলতান তথা, সালাহুদ্দীন আয়্যুবী, আল-মালিক 'আযীয, আল-মালিক 'আদিল ও আল-মালিক কামিল-এর শাসনামলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরবীকবি ইবনুল ফারিদ(হি.৫৬৭-৬৩২/ খ্রি.১১৮১-১২৩৫)-এর জন্ম ও মুত্যু হয়। যৌবন ও পরিণত বয়সপ্রাপ্ত হয়ে তিনি তাঁর অমর যুহ্দ্রথা সূফীকাব্য রচনা করে সূফীকবি সম্রাটের আসন অলংকৃত করেছেন। আয়্যুবী সুলতানদের সময় মিসর ও সিরিয়ায় যুহ্দ ও সূফীতত্ত্বের ব্যাপক অনুশীলন হয়। সুলতান সালাহুদ্দীন মিসরে খানকাহ্ সা'ঈদুস-সু'আদা'(السُعَدَاء سَعِيدُ خَانقاهْ) নামের 'দুওয়ায়রাতুস-সূফীয়্যাহ'(الصُوْفِيَة دُوَيْرَةُ) খানকাহটি প্রতিষ্ঠা করেন।[২২]

ইবনুল ফারিদের ১৬৪৪ চরণের একমাত্র ক্লাসিক ও সূফী কবিতাসংকলন 'দীওয়ান ইবনুল ফারিদ' বিশ্বজোড়ে স্থায়ীসুখ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হয়। তাঁর রচিত দীওয়ান একটি ব্যতিক্রমধর্মী আরবী সূফীকাব্য ও শিল্পসাহিত্য। কবিতায় অপরিচিত শব্দের ব্যবহার পরিহার, বাক্যগঠনে কোমলতা ও সুক্ষতার আশ্রয়, ভাষায় নতুন কলাকৌশল, ভাবধারা, সাংকেতিক, প্রতীকী ও রূপালংকার ব্যবহার, প্রিয়সির বাস্তভিটার স্মরণে কবিতার সূচনা পরিহার, সুরম্যঅট্রালিকা, রাজকীয়প্রাসাদ ও মদেরবর্ণনা, উপমা-উদাহরণ, কাসীদার বিভিন্নঅংশের সাথে পরস্পরসুসম্পর্ক এবং ছন্দের অন্ত্যমিল স্থাপনে গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদি বিষয়গুলো আয়্যুবীসুলতানদের শাসনামলে রচিত আরবী কবিতার বৈশিষ্ট্য ছিল। ইবনুল ফারিদের কবিতায় এ সববৈশিষ্ট্য ব্যাপকহারে ব্যবহার করা হয়। আয়্যুবীসুলতানদের

শাসনামলে রচিত আরবী কাব্যসাহিত্যের বিষয় ও উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে রয়েছে, চতুষ্পপদী বা চৌপদী(رباعيات), লোকগিতী (مواليات), দু'পদীপালাক্রমী(دوبيتات), রহস্যাবৃতধাঁধাঁ(ألغاز), অন্তমিল(سجع), শ্লেষালংকার (جناس), বিরোধালংকার (طباق), দ্ব্যর্থরোধকউক্তি (تورية), সাংকেতিক বা প্রতীকী (رمزية), সূফীস্তবক (صوفية موشحات) বা সূফীস্তবক কবিতা ইত্যাদির বিকাশ।[২৩]

সমকালীন কাব্যসাহিত্যের এসব বিষয়ের আদলেই ইবনুল ফারিদ তাঁর আরবী সূফীকাব্য রচনা করেন। আরবী কাব্যসাহিত্যের আকাশে তখন ইবনুল ফারিদ ছিলেন এক উজ্জ্বলনক্ষত্র। তিনি তাঁর অমর কাব্যগ্রন্থ দীওয়ান রচনার মাধ্যমে একটি নতুন আরবী সূফীকাব্য ধারার প্রবর্তন করেন। অদ্যাবধি পাঠক ও গবেষকদের কাছ থেকে তাঁর কাব্যস্মৃতি কখনো বিলীন হয়নি। তাঁর শৈল্পিক সূফীকাব্য বিনির্মাণের পেছনে সে সময়ের বেশ কয়েকজন কবি ও সাহিত্যিকের অনুপ্রেরণা কাজকরছিল। তাঁদের মধ্যে খামরিয়্যাহ কবিতা রচনায় পারদর্শী কবি আবূনুওয়াস(মৃ.১৯৯/৮১৪), হিজাযী কবিতা রচনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি শরীফ আর-রাযী(মৃ.৪০৫/১০১৬) এবং প্রেমকাব্য গযলরচনায় বিশিষ্টকবি' আব্বাস বিন আহনাফের (মৃ.১৯২/৮০৭) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সূফী কাব্যতত্ত্ব, আক্ষরিকঅর্থের পরিবর্তে সাংকেতিক ও প্রতীকীঅর্থ ব্যবহারের কারণে ইবনুল ফারিদের কবিতা সূধীজনের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে।[২৪]

একদা ইবনুল ফারিদ মিসরের জামি মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করতে প্রবেশ করে দেখেন যে, খতীব খুতবা দিচ্ছিলেন, আর নাম নাজানা একজন ব্যক্তি মসজিদের ভেতর গান গাচ্ছেন। তিনি লোকটিকে গোপনে আদবের সাথে দূরে সরিয়ে দিলেন। নামাজ শেষে সকল মুসল্লী প্রস্থান করলে ইবনুল ফারিদ বের হয়ে দেখেন যে, গায়ক লোকটি তাঁর সামনে এসে নিম্নের কবিতাটি রচনা করেন। কবিতাটি শুনে ইবনুল ফারিদ যুহ্দ কবিতার প্রতি অনুপ্রাণিত হলেন:[২৫]

قَسَمَ الإِلَهُ الأَمْرَ بَيْنَ عِبَادِهِ فَالصَبُ يُنْشِدُ وَالْخَلِيُ يُسْبِحُ
وَلَعَمْرِيْ التَسْبِيْحُ خَيْرُ عِبادَةٍ لِلنَاسِكِيْنَ وَذاَ لِقَوْمٍ يَصْلِحُ

"আল্লাহ বান্দাদের মাঝে তাঁর নির্দেশ(হুকুম) ভাগাভাগি করে দিয়েছেন। অতএব, তাঁর অনুরক্ত বান্দা কবিতা রচনা করেন; আর, তাঁর রিক্তহস্ত বান্দা তাসবীহ পড়েন। আমার জীবনের শপথ! অনুসরণকারী (নাসিক, যাহিদ) ও জাতীর সংস্কারকদের(মুসলিহ) জন্য তাসবীহ উৎকৃষ্ট ইবাদত"।

আবুল আতাহিয়্যার কবিতায় যুহদ বেশি পরিমাণে থাকলেও অন্যান্য বিষয়েও তিনি কাব্য রচনা করেছেন। প্রথম জীবনে তিনি কিছু গযল বা প্রেমের কবিতা রচনা করেছেন। প্রেয়সী উৎবাকে নিয়ে রচিত সেসব কবিতা মানোত্তীর্ণও হয়েছে। শৈশব থেকে কবি দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছেন। তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করেছেন কালের কুটিলতা, দুঃখ-যন্ত্রণা আর মিথ্যার বাগাড়ম্বর। তাঁর

সাথে যুক্ত হয়েছে প্রেয়সীকে হারানোর অসহ্য যন্ত্রণা। জীবন ও জগতে ছড়িয়ে থাকা অসঙ্গতি কবি হৃদয়কে ব্যথিত করেছে। শাসক ও অভিজাত শ্রেণির আস্ফালন ও ভোগবাদী চরিত্র তাঁকে ভোগ-বিলাস থেকে বিমুখ করেছে। চিরন্তন ও অনিবার্য মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরের জীবনের বিভীষিকা কবি হৃদয়কে ভীত সন্ত্রস্ত করেছে। কবির উপলব্ধি মহান স্রষ্টা আল্লাহর নিকটই মানব জাতির শেষ প্রত্যাবর্তন। ফলে আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে সন্তুষ্টি অর্জন করে নেওয়া বাঞ্চনীয়। উপর্যুক্ত বিষয় সমূহ তাঁর কাব্যে আলোচিত হয়েছে। এসব বিষয়কে মোটা দাগে যুহদিয়াত বলা চলে। অর্থাৎ কবির গযল বিষয়ক কবিতা বাদ দিলে আর যেসব বিষয়ের উপর তিনি কবিতা লিখেছেন সেগুলো অবশ্যই মরমী কবিতার আওতাভুক্ত।[২৬]

সূফীতত্ত্বের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:[২৭]

"Sufism is that you should be with God--without any attachment." (Junayd al- Baghdadi). "Sufism consists of abandoning oneself to God in accordance with what God wills." (Ruwaym ibn Ahmad). "Sufism is that you should not possess anything nor should anything possess you." (Samnun). "Sufism consists of entering every exalted quality (khulq) and leaving behind every despicable quality." (Abu Muhammad al-Jariri). "Sufism is that at each moment the servant should be in accord with what is most appropriate (awla) at that moment." (Amr b. 'Uthman al-Makki)".

এপর্যায়ে কবি আবুল ‘আতাহিয়্যাহ ও ইবনুল ফারিদের বিরচিত যুহুদ কবিতা: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির উপর আলোচনা উপস্থাপন করতে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। আয়্যুবী শাসনামলে (১১৮০-১২৫০ খ্রি.) মিসর ও সিরিয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাস্কৃতিক অবস্থার কিছু বর্ণনা দেয়া প্রাসঙ্গিক হবে। আয়্যুবী শাসনামলে (১১৮২-১৫১৬খ্রি.) মিসর ও সিরিয়ার রাজনৈতিক সামাজিক ও সাস্কৃতিক অবস্থা: খিলাফতের যে ধারাটির সূচনা ফাতিমী উবায়দীয়রা চালু করে ইসলামী পন্ডিতগণ এটাকে আদৌ খিলাফত বলে স্বীকার করেন নাই। উবায়দীয়দেরকে তারা আদৌ খলীফা মনে করেন না এবং ইসলামী অইন ও অনুশাসনের আলোকে এদের যে মর্যাদা ছিল তাতে এদের আনুগত্য অবশ্য পালনীয় হবে বলে তাঁরা ধারনা করেন না। এরা (উবায়দীয়রা) শিরক ও বিদআতের প্রবর্তন করেছে। ইসলামী প্রতীকসমূহের অমর্যাদা করেছে এবং নানা ধরনের পাপাচার ও অনাচারে লিপ্ত হয়েছে। মিসরে ৫৬৭/১১৭১ পর্যন্ত এদের রাজত্ব কায়েম ছিল। এরপর সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যুবী উবায়দী রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে আয়্যুবী রাজত্বের সূচনা করেন। মিসরে পুনরায় খিলাফতে আব্বাসীয় খুতবা চালু হয়।[২৮]

সিরিয়া ও ইরাকের আতাবিকরা কুর্দিস্থানের অধিবাসী একজন ইমামুদ্দীন যঙ্গী জনৈক কুর্দীর সর্দার আয়্যূব ইবন শাদীকে তাঁর পক্ষ থেকে শহরের শাসক নিযুক্ত করে পাঠান। কালক্রমে তিনি একজন বড় নেতা হিসাবে পরিগণিত হন। আয়্যুবের অনুজ ছিলেন শিরকূহ। ইমামুদ্দীন যঙ্গীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নুরুদ্দীন মাহমূদ সিংহাসনে আরোহণ করে শেরকূহকে হিমস্ ও বাহবার শাসন ক্ষমতা প্রদান করেন। শিরকূহের যোগ্যতা ও শৌর্য বীর্য দেখে নুরুদ্দীন তাকে নিজের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। শিরকোহকে মিসরে প্রেরণ করার সময় নূরুদ্দীন যঙ্গী শিরকূহের ভ্রাতুস্পুত্র সালাহুদ্দীন ইবন আয়্যূবকেও মিসরে পাঠিয়েদেন। সালাহুদ্দীন ৫৬৪হি./১১৬৮খ্রি.মিসরে তাঁর নিজ রাজত্বের গোড়াপত্তন করেন। তারপর অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর রাজত্ব মিসর, সিরিয়া ও হিজায পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। সালাহুদ্দীনের প্রতিষ্ঠিত এই রাজত্ব আয়্যূবী রাজত্ব নামে অভিহিত হয়ে থাকে। ৬৪৮/ ১২৫০ পর্যন্ত এ বংশের রাজত্ব স্থায়ী হয়। সালাহুদ্দীনের পর এ বংশটিও কয়েকটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। সিরিয়ায় হামাত ভূখন্ডটি এ বংশের একটি প্রশাসনিক শাখা যা ৭৪২/১৩৪১ পর্যন্ত রাজত্ব করে। এই বংশের শাখাটি মিসরে রাজত্ব করেছিল। তাদেরকে আয়্যূবী ও আদিলিয়া বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।[২৯]

৬৪৮/১২৫০ সাল পর্যন্ত মিসর, সিরিয়া ও হিজাজে সুলতান সালাহুদ্দীনের বংশধরদের রাজত্ব টিকে ছিল। সুলতান সালাহুদ্দীন যেহেতু বংশে ছিলেন কুর্দী তাই তাঁর বংশধরদের রাজত্বকে যেমন আয়্যূবী রাজত্ব বলা হয়েথাকে; তেমনি কুর্দী রাজবংশের রাজত্বও বলা হয়ে থাকে। আয়্যূবী রাজবংশের সপ্তম বাদশাহ ছিলেন সুলতান সালাহুদ্দীনের সহোদরের পৌত্র মালিক আস-সালিহ। তিনি তার স্ববংশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাত থেকে নিরাপদ থাকার উদ্দেশ্যে কোফকাফ এলাকা তথা সারাকসিয়া প্রদেশ থেকে বার হাজার ক্রীতদাস ক্রয় করে একটি পদাতিক রক্ষীবাহিনী বিশেষভাবে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরই রাজত্বকালে ফ্রন্সের খৃষ্টান বাদশাহ নবম লুইস মিসরের ওপর নৌ হামলা চালান। ক্রীতদাস বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে লড়াই করে রণক্ষেত্র থেকে ফ্রান্সের বাদশাহকে গ্রেফতার করে। এ কৃতিত্ব প্রদর্শনের পর ক্রীতদাস বাহিনীর মর্যদা বৃদ্ধি পায়।[৩০]

মালিক আস-সালিহের ওফাতের পর তাঁর পুত্র মালিক মু'আজ্জাম তূরাণ শাহ্ মসনদে আরোহণ করেন। কিন্তু মাত্র দু'মাস অতিক্রান্ত না হতেই সুলতান মালিক আস-সালিহের এক আদরিণী দাসী শাজারাতুদদুরকে বিবাহ করার পর সে (শাজারাতুদদুর) সিংহাসন দখল করে। তাঁর রাজত্বকাল বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়। শাজারাতুদদুর মাত্র তিন মাসকাল রাজত্ব করার পর আত্মগোপন করেন এবং নামেমাত্র আয়্যূবী বংশের এক ব্যক্তি মালিক আল-আশরাফ মূসা ইবন

ইউসুফকে সিংহাসনে বসানো হয়। তাঁর রাজত্বকালে ক্রীতদাস বাহিনীর ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায়। অবশেষে ৬৫৩/১২৫৫ মামলূকরা (ক্রীতদাসরা) তাদেরই একজন আবীব আইবেক সালিহীকে মালিক আল-মুইয্য উপাধীতে ভূষিত করে সিংহাসনে বসায়। এভাবে মিসরে আয়্যুবী শাসনের অবসান হয়ে মামলূক শাসনের সূচনা হয় এবং তা দীর্ঘকাল পর্যন্ত টিকে থাকে।[৩১]

মিসরে ১১৭১খ্রি. সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কুর্দীদের আয়্যুবী সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য স্থায়ী হয়েছিল ১১৩৯-১২৬০ খ্রি.পর্যন্ত। ইউসুফ ইবন আয়্যুব ছিলেন (১১৩৯-১১৪০খ্রি.) এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। নূরুদ্দীন যঙ্গীর সেনাপ্রধান শিরকূহ এর ভ্রতুষ্পুত্র, চাচার মৃত্যুর পর ইউসুফ সালাহুদ্দীন উপাধি নিয়ে তাঁর স্থালাভিষক্ত হয়েছিলেন। তাঁর মাতা-পিতা ছিলেন কুর্দী বংশের। তাঁর পিতা আয়্যুব ছিলেন বা'লাবাকের সেনাপতি। ১১৬০খ্রি. মিসরের উযির হন। ১১৭১খ্রি. তিনি জুমআর খুতবায় মিসরের ফাতিমী খলীফার নাম অন্তর্ভূক্ত করেন। ১১৭৪ খ্রি. সালে তিনি মিসরের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সিরিয়ারও অধীশ্বর হন। হিজায ও অন্যান্য শহরও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। ১১৭৫খ্রি. (আব্বাসী) খলীফা তাঁকে মিসর, মাগরিব, প্যালিস্তাইন ও মধ্য সিরীয়ার শাসকের সম্মানে অভিষিক্ত করেন। তখন হতে তিনি নিজেকে সার্বভৌম সুলতান বলে মনে করতেন। ১১৭৬খ্রি. তিনি রশীদুদ্দীন সিনানের সদর দপ্তর কাসইয়াদ অবরোধ করেন এবং তাঁকেও নতি স্বীকার করতে বাধ্য করেন। তিনি ফ্রান্সদের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে থাকেন এবং ১১৮৭ খ্রি. টিবেরিয়াস দখল করেন। তারপর হিট্রিনের যুদ্ধে জেরুজালেমের রাজা গাই দ্যলুসিগনান সহ বহু নেতাকে বন্দী করেন এবং পরে আল-কারাকের শক্তিশালী উদ্ধত শাস রেজিনাল্ডকে হত্যা করেন। ১১৮৭ খ্রি. সালে জেরুজালেম তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করে। সালাহুদ্দীনের সৈন্যরা খৃষ্টান আধিপত্যের প্রতীক, প্রাসাদচূড়ার সোনার ক্রুশ ভেঙ্গে দেন। ১১৮৯-৯২ খ্রি. সালে জার্মানীর সম্রাট প্যেডারিক বারবারেসা, ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড ও ফ্রান্সের রাজা ফিলিগ আগাষ্টাসের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে চলে সালাহুদ্দীনের ক্রুসেডের জেহাদ। দীর্ঘদিন অবরোধ চলার পর সন্ধির উদ্দেশ্যে রিচার্ড ১১৯১খৃ. সালাহুদ্দীনের ভাই আল-মালিক আল-আদীল সাইফুদ্দীন এর সঙ্গে তাঁর ভগ্নীর বিয়ে দেন। তাঁকে যৌতুক হিসাবে জেরুজালেমের শাসনভার দেন। ১১৯২খৃ. মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উপকূলবর্তী অঞ্চল লাতিনদের এবং আভ্যন্তরীণ অঞ্চল মুসলমানদের অধীনস্থ হয়। ১১৯৩ খ্রি. সালাহুদ্দীন দামিস্কে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৫৫বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তারপর, (১১৯৩-৯৮) তাঁর তিন পুত্র আল-মালিক আল-আফজাল (দামিস্কাসে), এমাদুদ্দীন আল-আযীয (কায়রোয়) ও আয-যাহির (আলেপ্পোয়) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর পরের রাজা মুহাম্মদ আল-মানসূর (১১৯৮-৯৯খ্রি.), ১ম আল-'আদিল সায়ফুদ্দীন (১১৯০-১২১৮খ্রি.), মুহাম্মদ আল-কামাল (১২১৮-৩৮খ্রি.), ২য় আল-'আদিল (১২৩৮-

৪০খ্রি.), নাজমুদ্দীন আস-সালিহ্ (১২৪০-৪৯খ্রি.), শাজারাতুদ-দূরর (১২৪৯-৫০খ্রি.), আল-মুআযযাম শাহ্ তুরাণ ১২৫০খ্রি. ও মূসা আল-আশরাফ (১২৫০-১২৫২ খ্রি.)।[৩২]

ছয় বছরের বালক মূসা আল-আশরাফকে নামে মাত্র শেষ আয়্যূবী সুলতান করা হয়। সেই সঙ্গে লোক দেখান রাজা করা হয় মামলূক আইবেককে। সালজূক রাজাগণের অধীনে আব্বাসী খলীফাগণ পুতুলের মত ছিলেন।

১২৫৮ খ্রি. মোগল বাদশাহ চিঙ্গিয খানের পৌত্র হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণ করে, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকান্ড চালালে, শেষ আব্বাসী খলীফা আল-মুসতা'সিম বিল্লাহ সপরিবারে নিহত হন। যারা বেচেঁ ছিলেন, তাঁরা মিসরে পলায়ন করে ছিলেন। আব্বাসী খলীফাদের সাধের রাজধানী ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। সুদীর্ঘ আব্বাসী খেলাফতের অবসান ঘটে। আরবদের প্রাধান্য লোপ পায়। এই শাজারাতুদদূর প্রথমে ছিলেন খলীফা মুসতা'সিমের তুর্কী ক্রীতদাসী, পরে সালাহুদ্দীন আয়্যূবীর ক্রীতদাসী এবং তার পুত্রের গর্ভধারিণী স্ত্রী। ১২৪৯খৃ. তিনি ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন এবং ৮০ দিন দেশ শাসন করেন। তিনিই আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার একমাত্র মহিলা সুলতানা। তিনি নিজের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রস্তুত করেন এবং জুমুআর খুতবায় তাঁর নাম অন্তর্ভূক্ত করেন। পরে তাঁর ওমারাগণ তাঁর সহযোগী সেনাপতি আতাবিক আল-আসকারকে ইযযুদ্দীন আইবাক উপাধি দিয়ে প্রথম মামলূক সুলতান মনোনীত করলে, তিনি তাঁকে বিয়ে করেন। কিন্তু পরে তাঁকে হত্যা করেন এবং নিজেও নিহত হন।[৩৩]

সুলতান সালাহুদ্দীন ইবন আয়্যূব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি রাজবংশের নাম। এই বংশীয় লোকেরা হি.৬ষ্ঠ/ খ্রি.১২শ শতাব্দীর শেষদিক এবং ৭ম/১৩শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মিসর, সিরিয়া, মুসলিম ফিলিস্তীন, দিজলা ও ফুরাতের মধ্যবর্তী উচ্চ অঞ্চল ও ইয়ামানের শাসক ছিলেন। নাজমুদ্দীন আয়্যূব ইবন শাযী ইবন মারওয়ান এর নামানুসারে আয়্যূব বংশের নামকরণ করা হয় আয়্যুবী বংশ। সালাহুদ্দীন এই বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের ইতিহাসকে তিনটি কালে ভাগ করা যায়: ১. স্বয়ং সালাহুদ্দীনের সময় কাল যা ছিল প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠাকাল এবং যাতে তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ বিদ্যমান। ব্যক্তিত্বের বিচারে তিনি ছিলেন তাঁর বংশে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তি। যদিও অনেক বিষয়ে তাঁর উত্তরাধিকারীদের নীতি তার নীতির বিপরীত ছিল। ২. তাঁর প্রাথমিক উত্তরাধিকারীদের সময়কাল, এই সময়টা ছিল সংগঠন ও সংঘবদ্ধ করার কাল, আল-মালিকুল-'আদিলের মৃত্যু ৬৩৫/১২৩৮ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ৩. সমাপ্তিকাল, যা একটি দীর্ঘ পতনকাল বলা যায়। (ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ.৬৩৩, খ.২য়) অবশ্য শীরকূহ ও সালাহুদ্দীন মিসরে সেভাবেই ক্ষমতা লাভ

করেছিলেনযেভাবে তাঁদের পূর্ববর্তী ফাতিমী উযীরগণ ক্ষমতা লাভ করেছিলেন এবং যেভাবে খলীফা ‘আদিদ সরকারী সনদ দান করে তাঁদের ক্ষমতাকে প্রত্যায়িত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন সালজূকদের নিকট থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রাচীন সামরিক ধারার প্রতিনিধি। সেই সময়ে এশিয়ার মুসলিম দেশসমূহের সকল তুর্কী শাসকের ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রায় একই ধরনের ছিল এবং নূরুদ্দীনের মাধ্যমে তা বিশেষরূপে প্রকাশ লাভ করে।[৩৪]

৫৬৭/১১৭১ সালের মুহাররম মাসের প্রথম জুমু‘আয় ‘আব্বাসী খলীফা আল-মুস্তাযী বিআমরিল্লাহ-এর খলীফা আল-আফিন্দি লি দীনিল্লাহ-এর মৃত্যু হলে মিসর থেকে দুইশত বছরের ফাতিমী খিলাফতের সমাপ্তি ফটে। ফাতিমী পরিবারের সঙ্গে সালাহুদ্দীন সদ্ব্যবহার করেন। সালাহুদ্দীন প্রথমে ফাতিমী খলীফা ও পরে ‘আব্বাসী খলীফা দ্বারা পদাথিষিক্ত হন। একই সঙ্গে তিনি নূরুদ্দীনের অনুগতও থাকেন। পরিশেষে আল-মালিকূস-সালিহ প্রকাশ্যে সালাহুদ্দীনের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। অবশেষে একটি সন্ধি স্থাপিত হয় এবং এর ভিত্তিতে আল-মালিকূস-সালিহ এর নাম খুতবা হতে বাদ দেওয়া হয়। সালাহুদ্দীন নিজ নামে মুদ্রা চালু করেন। অত:পর তাঁকে বাগদাদের খলীফার পক্ষ হতে সম্মানজনক খিল‘আত কালা পতাকা এবং মিসর ও সিরিয়ার শাসনাধিকারে সনদ প্রদান করা হয়। ৫৭২/১১৭৬ সালে তিনি মিসরে ফিরে যান। পরে সেখানে থেকে ৫৭৮/১১৮২ সালে ক্রুসেডারদের কবল থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য সিরিয়ার দামিশক নগরীতে পৌঁছেন। মিসর থেকে যাওয়ার সময় সালাহুদ্দীন একজন উযীর মাত্র ছিলেন এবং যখন মিসরে আসেন, তখন মিসর সিরিয়া ও ইরাকে তাঁর চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কেহ ছিলনা। তিনি একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সফলতা লাভ করেছিলেন। তিনি সেই রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলকে আবার সংযুক্ত করেছিলেন এবং পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যে সীমানার বিস্তৃতি ছাড়াও একে আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী করেছিলেন। ১১৮৩খ্রি. সাল ছিলো এই সকল বিষয় ও স্বল্প সময়ের ঘটনা। তখন তিনি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিলেন। এই ভাবে শক্তি অর্জনের পর সালাহুদ্দীন মুসলিম এলাকা সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জেরুজালেমের অভ্যন্তরীণ সমস্যার সুযোগে জেরুজালেম ও সিরিয়া হতে তিনি খৃষ্টান শাসকদেরকে বিতাড়িত করেন।[৩৫]

সমসাময়িক কালেও পরবর্তী কালের বংশধরদের নিকট তাঁর বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের মূলে ছিল তাঁর এই সফলতা। ৫৮৩/১১৮৭ সালে হিত্তীন নামক স্থানে ফ্রান্সদের ধ্বংস করেন, ফলে আশি বৎসর পর জেরুজালেম আবার মুসলিম অধিকারে আসে। তখনকার খৃষ্টানদের সাথে সালাহুদ্দীন যে সদয় ব্যবহার করেছিলেন তাঁর প্রশংসা করে ঐতিহাসিক খধসব চড়ড়ষব বলেন, সেখানে এমন কোন ঘটনা

ঘটে নাই যে, কোন খৃষ্টান শহরবাসীর উপর বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, দেশকে অভ্যন্তরীণ ও বহি:শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করা। তিনি তাঁর উদ্দেশ্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন। তিনি সিরিয়া প্রত্যাবর্তন করে ফ্রান্সদের মুকাবিলায় মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা করেন। অতএব সমস্ত খৃষ্টান এলাকা সালাহুদ্দীনের করায়ত্ত হয়।[৩৬]

সাংস্কৃতিক অবস্থা

প্রাথমিক জটিলতা ও সমস্যা মিটিয়ে যাওয়ার পর সালাহুদ্দীনের জীবদ্দশায় এই সকল বিষয়ের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়। নতুন শাসকদের জন্য ইবনুত-তুওয়ায়র ফাতিমী শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। খারাজ সম্পর্কে কাযী আবুল-হাসান প্রবন্ধ লিখেন। আরো উলেখ্য, ইবনুল-মামাতীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কাওয়ানীনুদ-দাওয়াবীন উপরিউক্ত বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। এইগুলির সাথে আরো কিছু গ্রন্থ ও যোগ করা যায়। যথা পরবর্তীকালে প্রণীত ইবন শীত আল-কারশীর দীওয়ান সম্পর্কিত (অধিকতর সাহিত্য) গ্রন্থ। এই সুশৃঙ্খল বর্ণনার তুলনায় এবং এর পরিপূরকরূপে আয়্যুবী শাসনামলের শেষদিকে আরোও প্রবন্ধ ও পুস্ড়ক রচিত হয়েছে, যেগুলি উছমান ইবন ইবরাহীম আন-নাবুলুসীর বিভিন্ন উদ্বৃতিতে সংরক্ষিত আছে, যা রচয়িতাদের বাস্ড়ব অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[৩৭]

মিসরে উযীর পদের প্রয়োগ ছিল খুবই কম। সালাহুদ্দীনের দৃষ্টিতে কাদী ফাদিলের মর্যাদা যাই হউক না কেন, তিনি কখনো উযীর উপাধী লাভ করেন নাই এবং কখনো মন্ত্রীর দায়িত্ব ও পালন করেন নাই। এর কারণ ছিল বাদশাহ নিজেই সরকারের সকল দায়িত্ব পালন করতেন। শাহজাদা ও উযীরের পরেই ছিল কেন্দ্রীয় প্রশাসন, যা তকগুলি দীওয়ানে বিভক্ত ছিল। এগুলোর নাম ও আরোপিত দায়িত্ব ফাতিমী শাসনামলের দীওয়ান সমূহের অনুরূপ ছিল না। প্রকৃত পক্ষে তখন পর্যন্ড় সৈন্যবাহিনীর জুয়ূশের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। ইবনুল মাম্মাতীর প্রবন্ধে অন্যান্য, দীওয়ানের আলোচনা বাদ দিয়ে কোষাগার নির্মাণের আয়-ব্যায় সংক্রান্ত বিস্ড়ারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। তুতীয় বৃহৎ দীওয়ান, যাকে কোন কোন দিক দিয়া উপরিউক্ত দীওয়ানের উপরে স্থান দেয়া হয়ে থাকে। তা হল দীওয়ানুল-ইনশা। এই বিভাগের দায়িত্ব ছিল পত্র যোগাযোগ ও দলীল সংরক্ষণ। এই বিভাগের পরিচালক কাদী আল-ফাদিল বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ফাতিমী শাসকদের আমলে পদস্থ কর্মচারীদের অন্যতম ‘ইমাদুদ্দীন আল-ইসফাহানী, সালাহুদ্দীনের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। সর্বশেষ ছিল দীওয়ানুল ‘হুবুস; কিন্তু গুরুত্বের দিক দিয়ে এটি অন্যগুলির তুলনায় কোন অংশে কম ছিল না। আন-নাবুলুসী এর উলে-খ করেছেন। অন্যান্য দীওয়ানের বিপরীতে এর সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন বজায় ছিল।[৩৮]

যাঙ্গী ও সমসাময়িক কালের অন্যদের ন্যায় আয়্যূবীগণও সুন্নী ছিলেন। তাঁরা ধর্ম বিমুখতার বিপরীতে ইসলামের সনাতন দর্শমতের প্রসারে চেষ্টা করেন। মিসর কর্তৃক পুনরায় 'আব্বাসী নেতৃত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়া সর্বপ্রথম এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটে। মুসলিমরা এই বিষয়ে ঐক্যমত হয় আয়্যূবী স্বায়ত্বশাসনের কোন রকম হ্রাস না করে খিলাফতের মর্যাদা শুধু নামেই থাকবে না। উদাহরণত পারস্পারিক বিবাদ মিটানোর জন্য অধিকাংশ সময় খলীফার কূটনৈতিকগণকে (ইবনুল-জাওযী) মধ্যস্থতা করার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হত।

আয়্যূবী শাসকদের ধর্মনিষ্ঠার একটি প্রমান এই যে, সালজূক ও যাঙ্গীদের পর তাঁরা ও তাদের উচ্চস্ড়রের আমীরগণ সিরিয়া ও জাযীরায় মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং মিসরে প্রথমবারের মত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। জানা যায়, আস-সালিহ আয়্যূব একটি নূতন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন যাতে চার মাযহাবের ফিকহ শিক্ষা দেওয়া হত এবং এর ক্যাম্পাসে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাকে কবরর দেওয়া হত। অপর দিকে আয়্যূবী শাসকগণ সূফী মতাদর্শকেও স্বাগত জানান, এই পদ্ধতিটি মূলের বিচারে প্রাচ্যের সহিত সম্পর্কিত ছিল। আয়্যূবী শাসকগণ এর চর্চার জন্য শায়খুশ-শুয়ূখের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন খানকাহ নির্মাণ করেন। অপর দিকে সালজূক ও যাঙ্গিদের ন্যায় আয়্যূবীদের আশেপাশে ও কিছু সংখ্যক দেশত্যাগী দেখা যেত। যারা বর্তমান অথবা প্রাচীন ইরানী বংশোদ্ভূত ছিল। তাদেরকে, বিশেষত বুদ্ধিজীবী সমাজে ও সাহিত্য সমাবেশে দেখা যেত। তাছাড়া আয়্যূবী শাসকদের আর একটি প্রবণতা ছিল, তারা চাইতেন, এই সকল বিজ্ঞ ব্যক্তি কাদী হিসাবে ও ধর্মীয় পরিমন্ডলে সরকারের সঙ্গে আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের শাসনামলে আওলাদুশ-শায়খ (শায়খ-তনয়) নামক পরিবারটির নাম বিশেষভাবে উলেখযোগ্য। এই পরিবারটি খুরাসান বংশোদ্ভত ছিল। সাধারণত কোন পরিবার হয়ত সামরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে অথবা মাযহাব ও ফিকহ এর ক্ষেত্রে অথবা প্রশাসনিক কাজকর্মে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল, কিন্তু উক্ত পরিবারটি এই তিনটি বিভাগেই খ্যতি অর্জন করেছিল।[৩৯]

আয়্যূবী রাজ্যগুলিতে ব্যাপক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের একটি কারণ সেখানকার স্বাভাবিক আবহাওয়া। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতব্দীতে সিরিয়া মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্রছিল এবং আরবী এর বাহন ছিল। কিছু কাল পর মিসরও এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত সেখানকার প্রাচীন উপাদান ও আয়্যূবীদের পছন্দনীয় নূতন উপাদানের মধ্যে কোন সমন্বয় হয় নাই। সাংস্কৃতিক ব্যাপারে সকল কৃতিত্ব আয়্যূবীদের প্রাপ্য নয়। তবে শাহাজাদাদের অবদান সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হলে অবিচার হবে। কেননা খলীফা বলে ঘোষণা করার বিস্ময়কর প্রচেষ্টা চালান। তাঁর পতনের পর আল-'আদিল

ও আল-কামিল উভয়েই ইয়ামান যাতে তাঁরা হস্তচ্যুত না হয় সে বিষয়ে একমত হয়ে আল-কামিলের এক পুত্রকে সেখানকার শাসনভার দিয়ে প্রেরণ করেন। তথাপি আল-কামিল রাসূলীগণকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হন। রাসূলীগণ প্রথম দিকে নিজেদেরকে আয়্যুবীদের মিত্র চলে প্রকাশ। কিন্তু পরবর্তীকালে মক্কায় আধিপত্য বিস্তারে প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। তা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক কখন ও ছিন্ন হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়।[৪০]

আয়্যুবী শাসকদের পরস্পরের মধ্যে ক্ষমতা দখলের সামরিক প্রতিযোগিতা

আল-কামিলের মৃত্যুর পর প্রকৃত আয়্যুবী শাসনের অবসান ঘটে। তবে এটা ঠিক যে, বংশটির প্রশাসনিক ভিত্তি মূলেই এর পতনের বহু কারণ নিহিত ছিল। আল-কামিল তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আস-সালিহ আয়্যুবকে হিসন-কায়ফারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে নির্বাসিত করেছেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র 'আদিলকে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। আল-আদিল নিজেকে জনগণের অপ্রিয় করে তোলে এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদিগণ সালিহ এর নিকট সাহায্য প্রর্থনা করে। আস-সালিহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর (কয়েকবার পরাজিত হবার পর) সিংহাসন লাভে সমর্থ হন। তিনি আবার আয়্যুবী রাজ্যগুলির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করেন কিন্তু তার মৃত্যুর পরপর তা আর থাকে না।এই ঐক্য সাধনে শুধু কনিষ্ঠ ভ্রাতাই নয়, সিরিয়ার অধিকাংশ আয়্যুবীকে, বিশেষত দামিশকের শাসনকর্তা সালিহ ইসমাঈলকে ও প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। এটা ঠিক যে, প্রথম থেকেই আয়্যুবীদের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এই মতবিরোধ কোন ফলকেই সুলতান অর্থাৎ বংশীয় প্রধানের নিকট তার অধীনস্থ অঞ্চলের শাসনভার লাভে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে নাই। আবার এই মতবিরোধকে নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বংশীয় সংহতিকে রক্ষা করা হয়। কিন্তু এখন বিরুদ্ধবাদীগণ একে অপরকে অন্যায় দখলকারীরূপে মনে করতে লাগল। সর্বোপরি সালিহ কেবল শক্তিবলে জয়লাভ করতে সক্ষম হন। এই শক্তি প্রাচীন কুর্দী-তুর্কী সৈন্যবাহিনী দ্বারা গঠিত ছিলনা। আল-কামিলের জীবদ্ধশায় আস-সালিহের পদাবনতির কারণ ছিল মিসওে পিতার প্রতিনিধিত্ব করার সময় কুর্দীদের সর্ম্পকে তাঁর অবিশ্বাস ও বিপুল সংখ্যক তুর্কী দাসকে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করা। মিসওে শাসক নিযুক্ত হওয়ার পর যে সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন তাও ছিল খাটি তুর্কী। কিন্তু এই তাঁর সফলতার পশ্চাতে ছিল একটি অধিকতর উদ্বেগজনক উপাদান খাওয়ারিযমীগণ যারা সালজূকদেও অধীনে চাকুরী করেছিল সেখান থেকে বিতারিত হয়েছিল। আস-সালিহ তাদেরকে দিয়ার মুদার-এর শাসনভার অর্পণ করেন এবং জাযীরা ও সিরিয়ায় শত্রুদের মুকাবিলায় তাদেরকে আহব্বান করেন। কিন্তু তাদের জন্যই এই যুদ্ধ কিছু পরিমানে ধ্বংসাত্মক ও নির্মম হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের আর কোন প্রয়োজন ছিলনা বলে সালিহ তাঁর দক্ষিণ সিরীয় ভ্রাতাদের দ্বারা তাদেরকে নির্মূল করেন।

যদিও পূর্বেকার আয়্যুবী শাসকগণ ফ্রন্কদের সঙ্গে শান্তি রক্ষা করেছিলেন, এমনকি এক সময় আল-কামিল তার ভ্রতাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রেডারিক এর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও প্রকৃত পক্ষে এই শান্তি প্রচেষ্টা কখনো ফলপ্রসূ হয়নি। এই সময় ফ্রান্কগণ আস-সালিহ ইসমাঈল ও কারাকের শাসনকর্তা আন-নাসির দাউদের মিত্ররূপে আস-সালিহ আয়্যুব ও খাওয়ারিযমীদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ফ্রান্কদের এই পক্ষপাতিত্ব ফ্রান্ক ও আস-সালিহ ইসমাঈল উভয়ের জন্য মারাত্মক দুর্বিপাক সৃষ্টি করে। ফ্রান্কদের এই আচরণের ফলে নতুন ক্রুসেড সংঘটিত যুদ্ধের শুরুতেই আয়্যুবী শাসকের ইনতিকাল হয়।[৪১]

সম্ভবত আস-সালিহ আয়্যুবী বংশের শেষ শাসক ছিলেরন, তাঁর পুত্র তুরাণ শাহ কয়েক মাস পর স্বীয় সৈন্যদের হাতে নির্দয়ভাবে নিহত হন। যদিও কিছুকাল পর্যন্ত কয়েকজন অল্প বয়স্ক বাদশাহ আয়্যুবী বংশের নাম টিকিয়ে রেখেছিলেন, তথাপি প্রকৃতপক্ষে ৬৪৭/ ১২৪৯ সাল হতেই তথাকথিত মামলূক শাসনের গোড়াপত্তন হয়েছিল। এই শাসনের প্রকৃত স্রষ্টা ছিলেন আস-সালিহ। তাঁর শাসনামলে রাষ্ট্রীয় অবস্থার মূল নিয়ন্ড়া ছিল তুর্কী দাসদের সমন্বয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনী। নীল নদেও একটি দ্বীপে তারা বসবাস করত বলে তাদেরকে বাহরিয়্যা বলা হত। আস-সালিহ ও তুরাণশাহ কেহই সমর নেতা ছিলেন না। তূরাণশাহ যদি ভারসাম্য রক্ষা করতে পারতেন। তাহলে আয়্যুবী শাসন হয়ত আরও কিছুদিন টিকে থাকত। পরিশেষে তূরাণ শাহের নিহত হওয়ার পর তারা একজন তুর্কোমান নেতা ‘ইযযুদ্দীন আয়বেককে প্রথমে আতাবিক এবং পরে সুলতানের পদে অধিষ্ঠিত করে। সমসাময়িকদের ভাষায় কুর্দী বংশের স্থলে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪২]

উত্তরাঞ্চলে আয়্যুবী শাসন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল। কিন্তু শাসকগণ উলেখযোগ্য কোন সফলতা অর্জন করতে পারেন নাই। মোঙ্গলদের আগমনের অংশকায় সন্ত্রাসের ভিতর জীবন কাটাচ্ছিলেন। তাঁরা অত্যন্ড় দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কারণ একদিকে মোঙ্গলদের আনুগত্য স্বীকার করলে তাঁদের অস্ড়িত্ব বিলুপ্তির আশংকা ছিল;অন্যদিকে তাঁরা আগেই সশস্ত্র প্রতিরোধের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। তা সত্ত্বেও আলেপ্পোর (হলবের) শাসনকর্তা আন-নাসির মামলূক শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আয়্যুবী শাসকদের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার চেষ্টা করেন। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাগদাদের খলীফা এই মর্মে একটি মধ্যস্থতা চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য হন যে, সমগ্র সিরিয়া আন-নাসিরের শাসনাদীন থাকবে এবং মামলূক সুলতান কেবল মিসর শাসনে সন্তুষ্ট থাকবেন। ৬৫৬/১২৫৮ সালে বাগদাদের পতন ঘটে এবং ৬৫৮/১২৬০ সালে আলেপ্পো দামিশক ও মায়্যাফারিকীন আক্রমণকারীদের যাদেরকে প্রতিরোধ করা দু:সাধ্য মনে হয়েছিল। অধিকারে আসে অথবা বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু আন-নাসির অন্যদের বিপক্ষে মিসরে আশ্রয় গ্রহণ করার সাহস

করেন নাই। পরিশেষে তিনি মোঙ্গলদের হাতে ধৃত হন। প্রথমে মোঙ্গলগণ তাঁর সাথে সদ্ব্যবহার করে ;কিন্তু ঐ বছরের শেষ দিকে তারা যখন সংবাদ পান যে, সিরিয়ার 'আয়ন-জালূত নামক স্থানে মোঙ্গল বাহিনী মামলূকদের দ্বারা পরাজিত হয়েছে, তখন তারা আন-নাসিরকে হত্যা করে। এরপর মামলূক সুলতান বায়বারস সিরিয়া জয় করলে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুর"ত্বপূর্ণ স্থান কারাক (যা দাউদ বংশীয়দের অধিকারের পূর্বেই ৬৪৬/১২৪৮ সালে অধিকারভুক্ত হয়েছিল।) রাজ্যটি অধিকৃত হয়। আলেপ্পো ও হিমসের রাজ্যগুলি নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কেবল হামাতরাজ্যটি স্বীয় শাসক আবুল-ফিদা এর জন্য, যিনি একজন খ্যতিমান লেখক রাজপুত্র ছিলেন, প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তিনি পূর্ণ আনুগত্যের জন্য ৭৪৩/১৩৪২ সাল পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন।[৪৩]

এই বংশের অপর একটি শাখা হিমস-কায়ফার (কায়ফার দুর্গ) পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মোঙ্গল ও তাদের উত্তরাধিকারীদের অধীনে দুই শতাব্দীর অধিককাল টিকেছিল। তাঁদের মর্যাদা হ্রাস পেয়ে স্থানীয় জায়গীরদারে নেমে এসেছিল। রাজ্যটি অশ্চর্যজনকভাবে স্বীয় প্রাচীন ধারার দিকে প্রত্যাবর্তন করে অর্থাৎ রাজ্যাটর শক্তির ভিত্তি ছিল সেই সকল কুর্দী গোত্র, যারা প্রবল প্রতাপের অধিকারী ছিল। এবং রাজ্যটি সেই সকল গোত্রের পারস্পারিক বিবাদ মিটানোর ক্ষেত্রে মধ্যস্থ ভূমিকা পালনের জন্য বারবার চেষ্টা করতে থাকে। তায়মূরের আক্রমণের ফলে যেই আকস্মিক বিপদ দেখা দিয়েছিল, রাজ্যটি তা কাটিয়ে উঠতে এবং স্বীয় একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু পরিশেষে আক-কোয়ুনলু-এর হাতে এর বিলোপ ঘটে। 'উছমানী বিজয়ের সময় এই বংশের কোন কোন সদস্য স্থানীয়ভাবে আবার কিছুটা গুরুত্ব অর্জন করেছিল।[৪৪]

মিসরে আব্বাসী খিলাফত

সুলতান সালাহুদ্দীন ইবন আইয়ূব মিসওে ফাতিমী উবায়দী রাজত্বের অবসানের পর আয়্যূবী রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। ৬৪৮/১২৫০ সাল পর্যন্ত মিসর, সিরিয়া ও হিজাজে সুলতান সালাহুদ্দীনের বংশধরদের রাজত্ব টিকে ছিল। তিনি যেহেতু বংশে কুর্দী ছিলেন তাই তাঁর বংশধরদের রাজত্বকে যেমন আয়্যূবী রাজত্ব বলা হয়ে থাকে। তেমনি কুর্দী বংশধরদের রাজত্বও বলা হয়ে থাকে। আয়্যূবী রাজবংশের সপ্তম বাদশাহ ছিলেন সুলতান সালাহুদ্দীনের সহোদরের পৌত্র মালিকুস সালিহ। তিনি তাঁর স্ববংশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাত থেকে নিরাপদ থাকার উদ্দেশ্যে কোফকাফ এলাকা তথা সারকাশিয়া প্রদেশ থেকে বার হাজার ক্রীতদাস ক্রয় করে একটি পদাতিক রক্ষীবাহিনী বিশেষভাবে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরই রাজত্বকালে ফ্রান্সের খৃষ্টান বাদশাহ মিসরের উপর নৌ হামলা চালান। ক্রীতদাস বাহিনী অত্যন্ড় দক্ষতার সাথে লড়াই করে রণক্ষেত্র থেকে ফান্সের বাদশাহকে গ্রেফতার করে। এ কৃতিত্ব প্রদর্শনের পর ক্রীতদাস বাহিনীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।[৪৫]

মালিকুস সালিহের ওফাতের পর তাঁর পুত্র মালিক মুয়াযযম তুরাণ শাহ মসনদে আরোহণ করেন। কিন্তু মাত্র দু'মাস অতিক্রান্ত না হতেই সুলতান মালিকুস সালিহের শাজারাতুদদুর নাম্মী এক আদরিণী দাসী সিংহাসন অধিকার করেন। তবে এর রাজত্বকাল বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়। শাজারাতুদদুর মাত্র তিন মাসকাল রাজত্ব করার পর আত্মগোপন করেন এবং নামেমাত্র আয়্যুবী খানদানের এক ব্যক্তি মালিকুল আশরাফ মূসা ইবন ইউসুফকে সিংহাসনে বসানো হয়। এর রাজত্বকালে ক্রীতদাস বাহিনীর ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায়। অবশেষে ৬৫৩/১২৫৫ সালে মামলূকরা (ক্রীতদাসরা) তাদেরই একজন আযীব আইবেক সালিহকে মালিকুজ মইজ উপাধিতে ভূষিত করে সিংহাসনে বসায়। এভাবে মিসরে আয়্যুবী শাসনের অবসান হয়ে মামলূক শাসনের সূচনা হয় এবং তা দীর্ঘকাল পর্যন্ত টিকে থাকে। ৬৫৫/১২৫৭ সালে মালিকুল মইজের পর তাঁর শিশুপুত্র আলী মসনদে উপবিষ্ট হন। তাঁর লকব রাখা হয় মালিকুল মানসূর। তিনি তখনো শিশু বলে ৬৫৭/১২৫৮ সালে শাস্ত্র পন্ডিতদের ফাতাওয়া নিয়ে তাকে পদচ্যুত করা হয়। তাঁর স্থলে আমীর সাইফুদ্দীনকে মসনদে বসানো হয়। আর তাঁর খেতাব হয় মালিকুল মুযাফফর। সাধারণত: মামলূকরা নিজেদের মধ্যে থেকে বিশ পঁচিশ ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে তাঁদের উপরই শাসনকার্যের দায়িত্ব অর্পণ করতেন। এই বিশ পঁচিশ ব্যক্তিই শাসক পরিষদের সদস্য বা র্বিাহীবৃন্দ বলে গণ্য হতেন। এদের মধ্য থেকে কাউকে তাঁরা আমীর নিযুক্ত করতেন। তাঁরাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে বাদশাহদের মত মসনদে আরোহণ করতেন এবং সুলতান বা মালিক নামে অভিহিত হতেন। তারপর সুলতানরা পরিষদের অপর সদস্যদেরকে বড় বড় সামরিক ও প্রশাসনিক পদে নিয়োগ দান করতেন। মামলূক বাহিনীর কিছু লোক যখন মারা যেতো তখন সরকারী কোষাগার থেকে অর্থব্যয় করে সেই সংখ্যাক সরকারী ক্রীতদাস ক্রয় করে এনে সে সংখ্যা পূরণ করা হতো। মামলূকদের দ্বিতীয় স্তরের হাতে এ নীতিমালা সর্বাধিক নিষ্ঠার সাথে পালিত হতো।[৪৬]

ভারতে ও মামলূক বংশ বলে একটি বংশ রাজত্ব করেছে। কিন্তু এখঅনে দু' তিন জন ব্যতিক্রম ছাড়া অবশিষ্ট সকল সুলতানই ছিলেন সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশের বংশধরদের মধ্যে থেকে। অর্থাৎ সেই বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের অভিশাপ এখানেও বর্তমান ছিল। পক্ষান্তরে মিসরে মামলূক সুলতানদের অধিকাংশই ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই ক্রীতদাস। তাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা বলেই তারা রাষ্ট্রের শঅর্ষ পদে অধিষ্ঠিত হতেন। মিসরী মামলূক রাজত্বের এই উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যের কথাটি কেউই স্পষ্ট করে লিখেননি। কিন্তু একক অনস্বীকার্য সত্য যে, মিসরে মামলূক রাজত্বের কোন কোন ব্যাপার সংশেঅধনের অতীত না থাকলেও এ ব্যাপারটি তাঁদের ম্রধ্য অবশ্যই অত্যন্ড় প্রশংসনীয় ছিল যে, বাদশাহ নির্বাচন তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাধীনভাবে করতেন। মালিক মুযাফফর যখন শুনতে

পেলেন যে, মোগল অর্থাৎ তাতারী সৈন্যরা বাগদাদ, ইরাক, খুরাসান, ফারিস, আযারবায়জান, জাযিরা, মুসেল প্রর্ভতি এলাকা ধ্বংস করে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে সিরিয়া অঞ্চলেও ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে তখন তিনি তাঁর মামলূক বাহিনীও মিসরীয় সৈন্যদের বাহিনী নিয়ে মিসর থেকে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন।[৪৭]

৬৫৫/১২৫৭ সালে নহরে জালুত নামক স্থানে মামলূক বাহিনী সিপাহসালার রুকনুদ্দীন বাইবার্স নেতৃত্বে মোগলদেরকে এমনি শোচনীয়ভাবে পরাস্ড় করলেন যে, এমন শোচনীয় ও অপমানজনক পরাজয় ইতিপূর্বে আর কোথাও তারা বরণ করেনি। হাজার হাজার মোগল সৈন্য রণক্ষেত্রে নিহত হলো। যারা বেঁচে থাকল তারা মামলূকদের সামনে থেকে এমনভাবে পালিয়ে গেল যেমন ছাগল-ভেড়ার পাল সিংহ দেখলে পালায়। মোগলদের অনেক দ্রব্য-সাম্ভার মামলূকদের হস্তগত হলো। তাদের অন্তরে মামলূকদের ভয় ও দাপট এমনভাবে অংকিত হলেঅ যে, তারা কত রাজ-রাজাদের রাজত্বের অবসান ঘটিয়েছে। কত রাজ্য চুরমার করে দিয়েছে কিন্তু মামলূকদের ভয়ে মিসরে মামলূকদের দিকে কোনদিন আড়চোখে তাকাতে সাহস পায়নি। মামলূকরা আলেপ্পো পর্যন্ত মোগলদের পশ্চাদ্ধাবন করে। তারপর তারা মিসরে ফিরে যায়। ৬৫৮/১২৫৯ সালে মালিকুল মুযাফফর নিহত হলে রুকনুদ্দীন বাইবার্স মসনদে আরোহণ করেন মালিকুয যাহির খেতাব ধারণ করে।[৪৮]

মালিকুয যাহিরের ক্ষমতাসীন হওয়ার পর জানা গেল যে, ৩৭তম ও শেষ আব্বাসীয় খলীফা মুস্তাসিম বিল্লাহর চাচা আবুল কাসিম আহমদ যিনি বাগদাদে অন্তরীর্ণ অবস্থায় ছিলেন এবং বাগদাদ ধ্বংস ও মুস্তাসিমের নিতহ হওয়ার কোনমতে কয়েদখানা থেকে গোপনে পালিয়ে গিয়ে মিসিয়ার কোন এক স্থানে আত্মগোপন করে বাস করেছেন। মালিকুয যাহির দশজন সম্ভ্রান্ত আরব সম্বলিত একটি প্রতিনিধিদলকে মিসর থেকে উক্ত আবুল কাসিম আহমদ ইবন যাহির বি আমরিলাহ আব্বাসীয় খোঁজে সিরিয়ায় পাঠালেন। তারা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মিসরে প্রত্যাবর্তন করলেন। মালিকুজ জাহির আবুল কাসিমের আগমন সংবাদে মিসরের সমস্ত বিদ্বজ্জন ও অমাত্যবর্গকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে রাজধানী কায়রো থেকে বেরিয়ে আসলেন। তাকে অত্যন্ড় সম্মানের সাথে শহরে এনে ৬৫৯/১২৬০ সালে তার হাতে বায়আত গ্রহণ করলেন। তখন থেকে তাঁর খেতাব হলো আল-মুস্তানসির বিল্লাহ। তাঁর নামে খুতবা পঠিত এবং মুদ্রা তাঁর নামে অঙ্কিত হলেঅ। খুতবায় বনী আব্বাস বংশের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়। তিনি নিজের পক্ষ থেকে মালিকুজ জাহিরকে নায়েবে সুলতান নিযুক্ত করে মিসরে পূর্ণ ক্ষমতা তারই হাতে তুলে দেন। এভাবে সাড়ে তিন বছর আল-মুস্তানসির বিলল্লাহ আবুল কাসিম

আহমদ খলীফা পদে আসীন থাকার পর ৬৬০/১২৬১ সালে যখন মালিকুয যাহিরের নিকট থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাতারদের দমনের উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। তখন একটি যুদ্ধ চলাকালে নিহত অথবা নিখোঁজ হয়ে যান। তারপর দীর্ঘ এক বছর আর কাউকে খলীফা করা হয়নি অত:পর আরেকজন শাহজাদার সংবাদ পেয়ে মালিকুয-যাহির তাকে মিসরে এনে খলিফা পদে আসীন করেন। এই শাহাজাদার নাম ছিল আবুল আব্বাস আহমদ হাসান ইবন আলী ইবন আবূ বকর ইবন খলিফা মুস্তারশিদ বিল্লাহ ইবন মুস্তাযী বিল্লাহ। তার- প্র-পিতামহ পর্যন্ত কয়েক পুরুষের কেউ কখনো খলিফা হন নি। এভাবে খলিফা মুস্তারশিদের বংশধরদের মধ্যে পুনরায় আব্বাসীয় খিলাফতের সূচনা হলো। এ খলিফার উপাধি হয় হাকিম বি-আমরিল্লাহ।[৪৯]

৬৬১/১২৬২ সালে হাকিম বি-আমরিলাহ সিংহাসনে আরোহণ করার পর ৬৭৪/১২৭৬ সালে মালিক যাহির সুদান দেশ জয় করেন। এটা ছিল এক বিরাট বিজয়। ৬৭৬/১২৭৬ সালে মালিক যাহিরের মৃত্যু হলে মালিক সাঈদ সিংহাসন আরোহণ করেন। ৬৭৮/১২৭৯ সালে মালিক মানসূর মিসরের সুলতান পদে আসীন হন। ৬৮০/ ১২৮১ সালে তিনি সিরিয়ায় উপস্থিত হয়ে তাতারীদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেন। ৬৮৯/১২৯০ সালে মালিক মানসূর ইনতিকাল করেন এবং মারিক আশরাফ ক্ষমতাসীন হন। ৭০১/১৩০১ সালে খলিফা হাকিম বি-আমরিল্লাহ চলিশ বছর রাজত্ব করার পর মৃত্যু বরণ করেন এবং তাঁকে কায়রোতে সমাধিস্থ করেন। তাঁর স্থলে তাঁরই পুত্র আবুর রবী মুস্তাকাফী বিল্লাহ ক্ষমতায় আসীন হন। মোটকথা ৯২২/১৫১৬ সাল পর্যন্ত স্বাধীন মামলূক রাজত্ব কায়েম থাকে। ৭৮৪/১৩৮২ সালি পর্যন্ত বাহরিয়া মামলূক নামে অভিহিত সরকেশী মামলূকরা রাজত্ব করেন। তারপর তাদের অপর সম্প্রদায় চরকেসী মামলূকরা ক্ষমতাসীন হতে থাকেন। বাহরিয়া মামলূকদের শেষ সুলতান মালিক সালিহ ৭৮৪/১৩৮২ সালে পদচ্যুত হন এবং তাঁর স্থলে বরকুফ, চরকস, মালিকুয যাহির খেতাব নিয়ে মসনদে আরোহণ করেন। তারপর ৯২২/১৫১৬ সাল পর্যন্ত একেরপর এক চরকেসী গিজরী মামলূকরা মিসরে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে থাকেন। গির্জী বা চরকসী সুলতানদের শেষ সুলতান তুমান-বে সুলতান সালীম উসমানীর হাতে পরাস্থ হওয়ায় মিসর উসমানীয়া সুলতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।[৫০]

মামলূকদের রাজত্ব শুরুর প্রথম দিকেই মিসরে আব্বাসী খিলাফতের দ্বিতীয় যুগের সূচনা হয়। ৯২২/১৫১৬ সালে মামলূক রাজত্বের অবসানের সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। মিসরে আব্বাসীয় খিলাফত অনেকটা আজকালকার পীরের গদীর মতই ছিল। নামে এরা খলিফাই ছিলেন এবং তাদের উত্তরাধিকারী ও মনোনীত হতেন। ভারত এবং অন্যান্য দেশের মুসলমান বাদশাহ তাদের নিকট

থেকে রাজ্য শাসনের সনদ এবং খেতাব ও হাসিল করতেন। মিসরের মামলূক সুলতানগণও নিজেদেরকে সেই খলীফাদের নায়েবে সালতানাত (ভাইসরয়ই) বলে অভিহিত করতেন। বাহ্যত: তাঁরা তাদের প্রতি সম্মান সম্ভ্রম প্রদর্শন করতেন। খুতবায়ও তাঁদের নাম পাঠ করা হতো। কিন্তু আসলে তাঁদের কোন শক্তি সামর্থ্য ছিল না। তাঁদের বেতন ভাতা নির্ধারিত ছিল। মিসরের সুলতানরা না দিতেন তাদেরকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে না দিতেন তাঁদের সাথে কাউকে মেলামেশা করতে। এই খলিফা তাঁদের পরিবারের সদস্যবর্গসহ তাদের প্রাসাদসমূহের মধ্যই অনেকটা রাজনৈতিক শাহী কয়েদীদেরই মতই নামে তাঁরা ছিলেন খলীফা।[৫১]

কিন্তু আসল ইসলামের খলীফা যে, অর্থ বহন করে তার সাথে তাদের ফারাক ছিল আসমান যমীনের। সুলতান সালীম 'উছমানী মিসর অধিকার করার পর মিসরের আব্বাসী খলীফা মুহাম্মদের উপরই তিনি আধিপত্য লাভ করেন। মুহাম্মদ ছিলেন মিসরের খলিফাদের মধ্যে অষ্টাদশতম এবং খলিফা হিসাবে শেষ খলিফা।এই খলিফার কাছে যে বিশেষ পতাকা এবং জুব্বা খিলাফতের নিদর্শন স্বরূপ বিদ্যমান ছিল। সুলতান সালীম তাঁকে সম্মত করে তা নিজে হস্ড়াত করে নেন। মিসর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় সুলতান সালীম ও আব্বাসী খলিফাকেও সাথে করে নিয়ে যান। আব্বাসী খলিফা সুলতান সালীমকে তাঁর উত্তরাধিকারী খলিফারূপে মনোনয়ন ও দান করেন। এভাবে ৯২২/১৫১৬ সালে আবুল আব্বাস সাফফাহ থেকে শুরু করে চলে আসছিল আব্বাসীদের খিলাফত দীর্ঘ আটমত বছর পর নামমাত্র খিলাফতের রূপ পরিগ্রহ করে তার অবসান ঘটে এবং সে যুগে খিলাফতের সবচাইতে যোগ্য হকদার 'উছমানীদের খিলাফতের সূচনা হয়। আব্বাসীয় বংশের সাইত্রিশজন খলিফা বাগদাদ তথা ইরাকে এবং ১৮জন মিসরে রাজত্ব করেন। এদের মোট সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ জন।[৫২]

পাদটীকা ও তথ্য-নির্দেশিকা

১ ড. উমার ফুর্‌রূখ, তারিখুল আদাবিল 'আরবী (বৈরূত:দারুল 'ইলমি লিল মালা'ঈন, ১৪০১/১৯৮১), খ.২, পৃ.৩৩-৪৭, ১৯০-৫; ড. শাওকী দায়ফ, তারিখুল আদাবিল 'আরাবী, মিসর(কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৯০ খ্রি.), খ.৭, পৃ.৩৪২-৬৭।

২ যাসারী হোলেডে, "পয়েটরী এন্ড রিসুয়েলড", যুক্ত রাষ্ট্র: দক্ষিণ ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ২০০৮ খ্রি., পৃ. ১৪; আহমাদ আমীন, জুহরুল ইসলাম(কায়রো: মু'আস্যাসাতু হান্দবী,২০১২ খ্রি.), খ. ৪, পৃ.৮৩৯-৪০।

৩ ড. 'আবদুল লতীফ হাযা, আল-আদাবুল মিসরী মিন কিয়ামিদ দাওলাতিল আয়ূবিয়্যা ইলা মজিয়িল হামলাতিল ফ্রান্সিয়া(কায়রো: আল-হায়্যাতুল মিসরিয়্যা লিরকুত্তাব, ২০০০খ্রি.), পৃ. ৪৮-৫১, ৯৭-১০২; ঐ, আল-হারকাতুল ফিকরিয়্যা ফি মিসর (কায়রো: আল-হায়্যাতুল মিসরিয়্যা লিরকুত্তাব, ২০১৬খ্রি.), পৃ.১২০-৩১।

৪ ড. নাজাহ 'আত্তার, আবুল 'আতাহিয়্যা হিজ লায়ফ এ্যান্ড হিজ পয়েট্রি(লন্ডন: এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৫৮খ্রি.), পৃ.১-৩০, ৩২-৭০, ১১৮-২৩৬।

৫ ড. সোলেমান ডেরিন, ফ্রম রাবি'আ টু ইবনুল ফারিদ(লন্ডন: লীডস ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৯ খ্রি.), ২৫-৯৯।

৬ আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী(কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, ১৩৬৯/ ১৯৫০), খ.৪, পৃ. ১-১১২।

৭ ড. শাওকী দায়ফ, তারিখুল আদাবিল 'আরাবী, মিসর(কায়রো:দারুল মা'অরিফ, ১৯৯০ খ্রি.), খ.৭, পৃ.৩৫৭-৬৫।

৮ আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী, খ, ৪, পৃ. ১০-১১২।

৯ ড. শাওকী দায়ফ, তারিখুল আদাবিল 'আরাবী, মিসর, খ.৭, পৃ.৩৫৭-৬৫।

১০ আবুল 'আতাহিয়্যা, দীওয়ান, সম্পাদনা, করম আল-বুস্তানী(বৈরূত: দারু বৈরূত, ১৪০৬/১৯৮৬), পৃ.১২৮।

১১ আবুল 'আতাহিয়্যা, দীওয়ান, পৃ. ৪৩৯।

১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০।

১৩ ইব্নু 'আবদিল বারর আল-কুরতুবী,আল-ইহতিবাল বিমা ফি শিরি আবিল 'আতাহিয়্যা(আবু জাবী:দারুল কুতুবিল ওয়াতানিয়্যা, ১৪৩০/২০০৯), পৃ. ৭-৩০; ড. শুকরী ফায়সাল, আবুল 'আতাহিয়্যা আশ'আরুহু ওয়া আখবারুহু(দামিশক: মাতবা'আ জামি'আ, ১৩৮৪/১৯৬৫), পৃ,২৩-৩১।

১৪ কিতাবুল আগানী, খ.৪, পৃ. ১০০-১১২; ড. আবুল 'আলা আল-'অফীফী, আত-তাসাওফুছ ছাওরাতির রুহিয়্যা(বৈরূত: দারুশশা'ব, ১৯৬৩ খ্রি.), পৃ. ২১৫-২০।

১৫ 'আবদুল হক ফরীদী, "আরব কবি আবুল 'আতাহিয়্যা", মাসিক মুহাম্মদী, ঢাকা, ১৩৩৪ বাং, ১ম বর্ষ, সংখ্যা, ৫, পৃ. ২৮১-৮৮; ঐ, "আবুল 'আতাহিয়্যা", ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশসন, ঢাকা, ২০০৫ খ্রি., খ.২, পৃ. ১০৮-১২।

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১০।

১৭ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ.১৪৪।

১৮ Dr. Abul Kalam Chowdhury, "The Theme of Mysticism and its Impact to Arabic Poetry", International Journal of Humanities and Social Science Studies, Asam, India, July, 2015, pp.182-6.

১৯ ড. মুহাম্মদ মুস্তাফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ.২৭৮-৩৪২।

২০ CI Chacen, "Al-Ayyubiyya", "আয়্যূবিয়্যা", ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ, খ.২, ২য় সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি., পৃ.৬৩৩-৪৭।

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৩-৪৭।

২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৩-৪৭; ড. 'আবদুল লতীফ হামযা, আল-আদাবুল মিসরী, পৃ.৪৯-৫০।

২৩ CI Chacen, "Al-Ayyubiyya", "আয়্যূবিয়্যা", ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ, খ.২, ২য় সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি., পৃ.৬৩৩-৪৭।

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৩-৪৭।

২৫ ড. মুহাম্মদ মুস্তাফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী(কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৪৩-৪৫; শামসুদ্দীন আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন নাসিরুদ্দীন আল-আনসারী ইবন যায়্যাত, আল-কাওয়কিবুস সায়্যারা ফি তারতীবিয যিয়ারা(বাগদাদ: মাকতাবাতুল মুছান্না, তাবি), পৃ. ২৯৬-৩০০।

২৬ ড. শাওকী দায়ফ, তারিকুল আদাবিল 'আরাবী, খ.৭, পৃ.৩৫৭-৬১।

২৭ Dr. Che Zarrina, "An Analytical Study of Rise and Development of Sufism: From Islamic Asceticism to Islamic Mysticism", Academy Islamic Studies, University of Malaya, December, 1999 AD, p.182-6.

২৮ আকবার খান শাহ নজীবাবাদী, ইসলামের ইতিহাস(অনুদিত), (ঢাক া: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৩ খ্রি.), খ.২, পৃ.৫৬৬-৮।

২৯ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৫৭২-৫।

৩০ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৫৭৪-৫।

৩১ প্রাগুক্ত, খ.২, ৫৩৯-৪০।

৩২ CI Chacen, "Al-Ayyubiyya", "আয়্যুবিয়্যা", ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ, খ.২, ২য় সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি., পৃ.৬৩৩-৪৭।

৩৩ অধ্যাপক ড. শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (কলিকাতা:), খ.৬, পৃ.২৫-৮।

৩৪ CI Chacen, "Al-Ayyubiyya", "আয়্যুবিয়্যা", ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ, খ.২, ২য় সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি., পৃ.৬৩৩-৪৭।

৩৫ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৬৩৪-৩৫।

৩৬ প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৩৪-৩৫।

৩৭ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৬৪০।

৩৮ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৬৪১।

৩৯ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৬৪২-৩।

৪০ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৬৪৩-৪।

৪১ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৬৪৩-৪।

৪২ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৬৪৫-৬।

৪৩ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৬৪৫-৬।

৪৪ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৬৪৫।

৪৫ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৫৩৯।

৪৬ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৫৪০।

৪৭ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৫৪১।

৪৮ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৫৪২।

৪৯ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৫৪১-৪২।

৫০ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৫৪১-৪২।

৫১ আকবার খান শাহ নজীবাবাদী, ইসলামের ইতিহাস(অনুদিত), (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৩ খ্রি.), খ.২, পৃ.৫৬৬-৮।

৫২ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৫৪৩।

প্রথম অধ্যায়

আবুল ‘আতাহিয়্যা ও ইবনুল ফারিদের সমকালীন আরবী কবিতা

সকল যুগেই কবিতা সংশিষ্ট জাতির জীবন দর্পন হিসাবে ভূমিকা রেখে আসছে। ‘আব্বাসী ও আয়্যুবীযুগেও সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতির রাজনীতির সামগ্রিক চিত্রায়ন আরবী কবিতায় সফলভাবে ফুটে উঠেছে। সে সময় গোত্রীয় অহমিকা ও গোত্র প্রীতি না থাকায়, গোত্রীয় গৌরবগাথাঁ রচিত না হলেও শাসকদের সহযোগিতা ও সক্রিয় পৃষ্টপোষকতার ফলে শাব্দিক ও আলংকারিক রূপে রাসূলুল-াহর (স).-এর প্রশংসা, রাজ বংশের শাসকদের বন্দনায় ও সূফী সাধকদের তত্ত্বজ্ঞানকে কেন্দ্র করে আধ্যাত্মিক, সামাজিক, শোকগাঁথা, প্রেমগাঁথা, বীরগাঁথা প্রভৃতি রীতি-নীতি এবং গঠনপ্রকৃতির রূপেও আকৃতিতে কাব্যচর্চা হয়েছে। এই সময় প্রবাহমান ক্রুসেড যুদ্ধসহ মিসর ও সিরিয়ার বড় বড় ঘটনাবলী আরবী কবিতার উপজিব্য হিসাবে স্থান পেয়েছে। সিরিয়া ও মিসরে আয়্যুবী সুলতানদের মধ্যে রাজনৈতিক অবস্থার চড়াই উতরাই বিরাজ করলেও তাঁদের বিশাল সাম্রাজ্যের কবিগণ তাঁদের বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের বর্ণনা ও প্রশংসা করে কবিগণ কবিতার বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক কাব্য রচনা করেছেন। কবিগণ কখনো পূর্ববর্তী যুগের কবিদের সম্পূর্ণ অনুসরণ করে, আবার কখনো সম্পূর্ণ নতুন রূপালংকার, ভাব, গঠনরীতি ও অকৃতিপ্রকৃতিকে পুঁজি করে, আবার কখনো দুই এর সমন্বয়ে অতি উন্নত মানের ও নিম্নমানের কবিতা রচনা করেছেন। এই যুগের রচিত কবিতাগুলো গঠনপ্রকৃতি, রূপবৈশিষ্ট্য, লক্ষ্যউদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর মানের দিক দিয়ে আব্বাসীয় সোনালী যুগের সমকক্ষ নাহলেও সেইযুগের কবিদের রচিত কবিতার তুলনায় এই যুগের কবিদের রচিত কবিতা কখনো পিছিয়ে ছিলো না। আবুল ‘আতাহিয়্যা সেই শিশুকাল থেকে আমৃত্যু নিরবচ্ছিন্নভাবে কাব্য রচনা করে গিয়েছেন। তিনি অনেক সময় মুখে মুখে কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর এতো কবিতা যে, তা পূর্ণ সংরক্ষণ বা সংকলন সম্ভব হয়নি। আন্দালুসিয়া মুসলিম স্পেনের খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ ও ধর্মতত্ত্ববিদ ইব্ন আবদিল বার (রহ.) আবুল ‘আতাহিয়্যার ধর্ম বিষয়ক (زهديات) কবিতা সমূহের একটি সংকলন তৈরি করেছিলেন। কবির বন্ধু ইব্রাহীম আল মাওসিলী তাঁর বহু কবিতার সুরারোপ করেন। এগুলো বহু শহর ও গ্রামে গাওয়া হয়ে থাকে।[১]

আবুল ‘আতাহিয়্যার কবিতায় যুহদ বেশি পরিমাণে থাকলেও অন্যান্য বিষয়েও তিনি কাব্য রচনা করেছেন। প্রথম জীবনে তিনি বেশ কিছু গযল বা প্রেমের কবিতা রচনা করেছেন। প্রেয়সী উৎবাকে নিয়ে রচিত সেসব কবিতা মানোত্তীর্ণও হয়েছে। শৈশব থেকে কবি দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছেন। তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করেছেন কালের কুটিলতা, দুঃখ-যন্ত্রণা আর মিথ্যার

বাগাড়ম্বর। তাঁর সাথে যুক্ত হয়েছে প্রেয়সীকে হারানোর অসহ্য যন্ত্রণা। জীবন ও জগতে ছড়িয়ে থাকা অসঙ্গতি কবিহৃদয়কে ব্যথিত করেছে। শাসক ও অভিজাত শ্রেণির আস্ফালন ও ভোগবাদী চরিত্র তাঁকে ভোগ-বিলাস থেকে বিমুখ করেছে। চিরন্তন ও অনিবার্য মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরের জীবনের বিভীষিকা কবি হৃদয়কে ভীত সন্ত্রস্ত করেছে। কবির উপলব্ধি মহান স্রষ্টা আল্লাহর নিকটই মানব জাতির শেষ প্রত্যাবর্তন। ফলে মহান আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে নেওয়া বাঞ্চনীয়। উপর্যুক্ত বিষয় সমূহ তাঁর কাব্যে আলোচিত হয়েছে। এসব বিষয়কে মোটা দাগে যুহদিয়াত বলা চলে। অর্থাৎ কবির গযল বিষয়ক কবিতা বাদ দিলে আর যেসব বিষয়ের উপর তিনি কবিতা লিখেছেন সেগুলো অবশ্যই যুহদিয়াত বা মরমী কবিতার আওতাভূক্ত।[২]

আবুল 'আতাহিয়্যার(হি.১৩০-২১৯/খ্রি.৭৪৮-৮২৫) সমকালীন বাগদাদ ছিলো সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল এবং 'আব্বাসীয় খিলাফতের স্বর্ণযুগ। সে সময় খলীফা আল-মাহদী(হি.১৫৮-১৬৯/খ্রি.৭৭৫-৭৮৫), আল-হাদী(হি.১৬৯-১৭০/খ্রি.৭৮৫৭৮৬) ও হারুনুর রশীদ(হি.১৭০-১৯৩/৭৮৬-৮০৯)-এর খিলাফতের যুগ ছিলো। তবে আবুল 'আতাহিয়্যার মৃত্যুর সময় বাগদাদের খলীফা ছিলেন মামূনুর রশীদ(হি.১৯৮-২১৮/খ্রি.৮১৩-৮৩৩। মিসর ও সিরিয়ায় আয়্যূবী সুলতানদের শাসনালে সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরবী সূফী-মরমী কবি ছিলেন ইবনুল ফারিদ(হি.৫৬৭-৬৩২/খ্রি.১১৮১-১২৩৫)। মূলত, আরবী কাব্যসাহিত্য দেড় হাজার বছরেরও অধিক সময়ের আরব সভ্যতার ঐতিহ্য ও জীবনবোধের শিল্পায়িত একটি অভিব্যক্তি। এ সুদীর্ঘ চলার পথে আরবদের জীবন শহস্র ধারা ও উপ-ধারায় প্রবাহিত হয়। ধারা-উপধারা প্রবাহের এ বহুমাত্রিকতা আরবী কাব্যসাহিত্যে যেমন এনে দিয়েছে বৈচিত্র্যময় কাব্যকলার রূপালঙ্কার তেমনি করেছে একে সমৃদ্ধ। এক সময় বেদুঈন বেশে আরব কবিগণ তাদের মনের কথা রসসিক্ত-সরল অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ বর্ণনায় উচ্চারণ করেছেন। বাগদাদ ও মিসরে আব্বাসীয় খলীফাদের শাসনামলের শেষপ্রান্তে বাগদাদের অথবা তারো অব্যবহিত পরে এসে আয়্যূবী সুলতানদের শাসনামলে মিসর ও সিরিয়ায় কাব্যসাহিত্যের মাধ্যমে কবিগণ সুন্দরতম শৈল্পিক রূপকে অনায়াসে বিনির্মাণ করেছেন। আরবী কবিতা আরবী সাহিত্যেরই একটি প্রধান শাখা হিসাবে কবিতার মাধ্যমে আরবী সাহিত্যের বিকাশে এর প্রথম উন্মেষ ঘটে। জাহিলী যুগ ও তার পরবর্তী সময়েও আরবের অধিবাসীরা আরবী ভাষায় কথা বলতো। মিসর ও সিরিয়ার আয়্যূবী সুলতান ও তাঁদের শাসকবৃন্দ তুর্কী-কুর্দী বংশোদ্ভুত হলেও তাঁরা আরবী ভাষায় কথা বলতেন এবং ব্যাপক হারে এই ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতেন। তাঁদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় আরবী কাব্যচর্চা আব্বাসীয় ধারায়-উপধারায় অব্যাহত থাকে। বাগদাদে আব্বাসীয় খিলাফত যুগে(৭৫০-১২৫৮খ্রি.) আরবী কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে যুহ্দকবি আবুল 'আতাহিয়্যা

(জ.১৩০/৭৪৮) এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। তিনি তাঁর অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার মাধ্যমে আরবী মরমী কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিরল স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন। তিনি ইরাকের কূফা নগরীর 'আয়নুত-তামার এলাকায় এক মূল 'আরব পরিবারে জন্ম জন্মগ্রহণ করেন। কূফা ছিল 'আব্বাসীয়দের প্রথম নতুন রাজধানী। আবুল 'আতাহিয়্যার সময় রাজধানী বাগদাদ ছিল সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল এবং 'আব্বাসীয় খিলাফতের স্বর্ণযুগ।[৩]

আবুল 'আতাহিয়্যার সময়কালীন কবিতার মধ্যে ছিলো মদ্যপান ও অশ্লীলতা (الخمريات و المجون) শিরোনামের কবিতার ব্যাপক প্রসার। 'আব্বাসী কবি আবু নুওয়াস(হি.১৩০-১৯৮/খ্রি.৭৪৭-৮১৫)-এর রচিত কবিতা এই বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত হয়েছে। কবি আত-তালা'ফারী(হি.৫৯৩-৬৭৫/খ্রি.১১৯৭-১২৭৭) সিরিয়ায় এর সূচনা করেন। পারস্যের রুবা'য়্যাত কবিতা রচয়িতার কবি 'উমর খৈয়াম(মৃ. ৫২৭/১১৩২) বাগদাদে এবং আয়্যূবী যুগে সিরিয়ার কবি 'আরকালা আদ-দিমাস্কী(হি.৪৮৬-৫৬৭/খ্রি.১০৮৩/১১৭১) ছিলেন এর পথিকৃত। দরিদ্র পরিবারে আবুল 'আতাহিয়্যার জন্ম, বংশীয় কৌলিন্য তারঁ ছিলনা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার্জন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি মদ্যপান ও অশ্লীলতার কবিতা রচনা করেননি। তবে তিনি জীবন ও জগৎ থেকে ব্যাপক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। দারিদ্র্যের কাছে তিনি কখনো হার মানেননি। তাঁর ছিল অনন্য সাধারণ কাব্যপ্রতিভা। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। অফুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্য ও নিরলস সাধনার মাধ্যমে তিনি তাঁর যুহ্দ কবিতা রচনায় অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। বহু ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে স্বীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুহ্দকবি হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। সমকালীন রাজন্যবর্গের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। তখন ছিলো 'আব্বাসীয় খিলাফতের যুগ। খলীফা আল-মাহদী(১৫৮/৭৭৫),আল-হাদী(১৬৯/৭৮৫) ও হারুনুর রশীদ(১৭০/৭৮৬) ছিলেন তাঁর কবিতার গুণমুগ্ধ । এক পর্যায়ে তিনি হয়ে উঠেন দরবারি কবি। খলীফাদের সুদৃষ্টি তাঁকে অর্থনৈতিকভাবে বিশাল সম্পদের অধিকারী করলেও তিনি জাগতিক ভোগ বিলাসে তাঁর গা ভাসিয়ে দেননি। জীবন ও জগতে ছড়িয়ে থাকা অসঙ্গতি ও অভিজাত শ্রেণির ভোগবাদী চরিত্র তাঁকে দুনিয়াবিমুখ করে তুলে। তিনি নির্মাণ করতে থাকেন অসাধারণ এক যুহ্দ বা মরমী কাব্যধারা। এক সময় তিনি আরবী যুহ্দ কবিতার প্রতীকরূপে নিজকে গড়ে তুলেন। আবুল আতাহিয়্যা স্বীয় কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী ও সচেতন ছিলেন। সে সময় বাগদাদ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু। মাওসিলবাসী ইবরাহীমের সাথে তিনি কুফা থেকে বাগদাদ পৌঁছেন। অতঃপর তিনি হীরাতে অবস্থান করতে থাকেন। এখানে তাঁর কাব্য সাধনা চলতে থাকে। চারদিকে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।[৪]

আব্বাসীয়দের শাসনামলে খিলাফতের আসনে সমাসীন ছিলেন খলীফা মাহদী বিন মানসুর। মাহদী যেমন ছিলেন প্রজাবৎসল তেমনি সাহিত্যামোদী। আবুল 'আতাহিয়্যার সুখ্যাতি মাহদীর দরবারে পৌঁছলে তিনি তাঁকে ডেকে পাঠান। কবি বাগদাদ গমন করেন এবং খলীফা মাহদীর স্তুতিমূলক কবিতা পাঠ করে তাকে মুগ্ধ করে দেন। আবুল আতাহিয়্যার কাব্য প্রতিভায় বিমুগ্ধ খলীফা তাকে পুরস্কৃত করেন। অতঃপর কবি বাগদাদেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। খলীফা মাহদী, হাদী, হারুনুর রশীদ, আমীনুর রশীদ ও মামুনুর রশীদ(১৯৮/৮১৩)-এর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁরা সকলেই কবির কাব্য প্রতিভায় বিমুগ্ধ ছিলেন। আবুল 'আতাহিয়্যা খলীফা হাদীর আমলে যুহদ কবিতার সূচনা করেন। পরবর্তীতে হারুনুর রশীদের আমলে কবিতা আবৃত্তি বন্ধ করে দেন। কিন্তু খলীফা তাঁকে বন্দী করে রাখেন এবং কবিতা আবৃত্তি না করার কারণে ষাটটি বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেন। এক পর্যায়ে কবি নতি স্বীকার করেন এবং কবিতা আবৃত্তির অঙ্গীকার করে বন্দীশালা থেকে মুক্তি পান। এরপর তিনি যুহ্দ কবিতা রচনা আর বন্ধ করেননি। আমৃত্যু কবিতাই ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী।[৫]

নাজমুদ্দীন আয়্যুব ইবন শাযী ইবন মারওয়ানের নামানুসারে আয়্যুব বংশের নামকরণ করা হয়। সুলতান সালাহ উদ্দীন ইবন আয়্যুব (হি.৫৩২-৫৮৯/খ্রি.১১৩৭-১১৯৩) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি রাজবংশের নাম। এই বংশীয় লোকেরা ৬ষ্ঠ/ ১২শ শতাব্দীর শেষদিক এবং ৭ম/১৩শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মিসর, সিরিয়া, মুসলিম ফিলিস্তীন, দিজলা ও ফুরাতের মধ্যবর্তী উচ্চ অঞ্চল ও ইয়ামানের শাসক ছিলেন। খ্রিষ্টীয় ১২শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আয়্যুবী সুলতানদের রাজত্বের (১১৮২-১২৫০ খ্রি.) প্রায় নব্বই বছরের মধ্যে মিসর ও সিরিয়ার আরবী কবিতায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকারী এবং সূফী কবিসাহিত্যিক তথা আরব মরমী কবিগণের দল নামে দু'টি কাব্যধারা আত্মপ্রকাশ করে। তাঁরা অব্যাহতভাবে সেখানকার কবিদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। এ উভয় আন্দোলনই সুন্নী মতাবলম্বী সালজূক সুলতানদের(১০৩৭-১৩০০খ্রি.) অধীনে মিসরের ফাতিমী 'আলবী শী'আদের বিপরীতে পরিচালিত এবং আরবী সাহিত্যে পূণর্জাগরণের সঙ্গে সংশিষ্ট ছিল। আরবী কবিতার বিকাশরূপে এই পুর্ণজাগরণ সালজূক সুলতানগণের অধীনে ইরাকে এবং যাঙ্গী আতাবিক ও আয়্যুবী সুলতানদের শাসনামলে সিরিয়া ও মিসরে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের প্রধান বাস্তব বিষয়বাহক ছিল সাহিত্যি। ফলে, শিক্ষাদীক্ষা ও কাব্যচর্চা সে সময় ক্রমাগত হারে প্রাতিষ্ঠানিকরূপ লাভকরলে তা আয়্যুবী সুলতানদের যুগে আরো ব্যাপক প্রসার লাভ করে।[৬]

আয়্যূবী সুলতানদের মিসর ও সিরিয়া কেন্দ্রিক শাসনামলে আব্বাসী খিলাফতের(১১৮২-১২৫০খ্রি.) নামে পরিচালিত শাসনামলের প্রতিষ্ঠাতা শাসক ছিলেন আয়্যূবী সুলতান সালাহুদ্দীন। নাজমুদ্দীন আয়্যূব ইবন শাযী ইবন মারওয়ানের নামানুসারে আয়্যূবী বংশের নামকরণ করা হয়। আয়্যূবী বংশ সুলতান সালাহউদ্দীন ইবন আয়্যূব (হি.৫৩২-৫৮৯/খ্রি.১১৩৭-১১৯৩) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি কুর্দী রাজবংশের নাম। এই বংশের শাসকগণ ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর শেষদিক এবং ৭ম/১৩শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মিসর, সিরিয়া, মুসলিম ফিলিস্তিন, দিজলা ও ফুরাতের মধ্যবর্তী উচ্চ অঞ্চল ও ইয়ামানের আবাস ভূমির শাসক ছিলেন। রাজনৈতিক চড়াই উৎরাই ও যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে সুলতান সালাহুদ্দীন তার সমগ্র শাসনামল সিরিয়া ও দামিশক নগরীর মধ্যে অতিবাহিত করেন। কিন্তু তাঁর বংশের প্রতিনিধিরা মিসরকেই তাঁদের রাজধানী গড়ে তুলেন। ফলে তারা দুর্বল হয়ে পড়লে সিরিয়া সাম্রাজ্য আইয়্যূবীদের অধিকার থেকে মামলূক সুলতানদের অধিকারে চলে যায় এবং আইয়্যূবীরা শুধু মিসরের ওপরই দখলদার থাকে। আইয়্যূবী রাজত্বের শেষ সুলতানগণ এই কূটকৌশল অবলম্বন করেছিলেন যে, তাঁরা তুর্ক, আর্মেনিয়া ও মোঘলদের থেকে অনেক দাস খরিদ করে এনে তাদের দ্বারা একটি বিরাট সেনাবাহিনী গড়ে তুলেন। উদ্দেশ্য ছিল, এদেরই কারণে কোন সেনা অধিনায়ক ভবিষ্যতে যেন বিদ্রোহ করার দু:সাহস না পায়, আর করলেও এই দাসবাহিনী দ্বারা যেন তাদেরকে দমন করা সম্ভব হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে এই দাসরা মামলূক শাসক হিসাবে এতই ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে যে, শেষ পর্যন্ত প্রায় আড়াইশত বছর মিসর সাম্রাজ্য তাদেরই করাগত হয়ে পড়ে।[৭]

কবি ইবনুস সা'আতী (হি.৫৫৩-৬০৬/খ্রি.১১৫৯-১২০৯) ফাখরুদ্দীন রিদওয়ান ইবন মুহাম্মদ ইবন 'আলী ইবন রুস্তম ইবন খারদুয আল-খুরাসানী দামিস্কের অধিবাসী এবং একজন চিকিৎসক ও সুদক্ষ সাহিত্য বিশারদ ছিলেন। যুক্তিবিদ্যা এবং অন্যান্য দার্শনিক বিষয়েও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি মালিকুল 'ফাইয ইবনুল মালিক আল-আদিল মুহাম্মদ ইবন আয়্যূব (সালাহউদ্দীনের ভাগিনা) এর উযীর ছিলেন। অতঃপর তাঁর ভ্রাতা আল- মালিকুল মু'আজজাম ইবনুল মালিক আল-আদিল (মৃ.১২২৭খৃ.)-এর উযীর ও ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। তিনি তাঁর কবিতায় আব্বাসী যুগের মুতানাব্বীর রচিত কবিতার প্রাণ প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি খোরাসানী হওয়ার গৌরব তার কবিতায় লিপিবদ্ধ করেছেন এবং গৌরব, গযল, বর্ণনা এসব তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু ছিলো। তিনি আবু নুওয়াস, বুহতুরী, মুসলিম ইবন ওলীদ, ইবন রূমী রচিত কবিতার গযলের ন্যায় গযল রচনা করেছেন। এপ্রসঙ্গে কবি ইবনুস সা'আতী বলেন:[৮]

وَإنــا لَمِنْ قــومٍ مَـواقعُ جُــوْدهــمْ   مَـواقـعُ جُـودِ الْـغَـيْـث في البَـلَـدِ الـقَـفْـرِ

وَرَثْـتُ الخـرا سانى حلـمًا ونـائـلاً   فلا قَـلِـقَ البـقيـا ولاحَــرِجَ الـصــدرُ

"অতঃপর আমরা এমন গোত্রের লোক, যাদের বদান্যতার অবস্থান অনাবাদী শহরে মেঘের বদান্যতার অবস্থানের ন্যায়; সহিষ্ণুতা ও অনুদান হিসাবে আমি খোরাসানের বংশদ্ভুত, ফলে আমার অন্তরের মাঝে কোন যন্ত্রণা অবশিষ্টনেই এবং কোন সংকীর্ণতাও নেই।"

কবি ইবনুস সা'আতী বায়তুল মুকাদ্দাস মুক্ত করার সময় সুলতান সালাহ্ উদ্দীনের সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁর এই বিজয়ের প্রশংসা করে তিনি কবিতা রচনা করে বলেন:[৯]

جـلـتْ عــزمـاتُك الـفــتـحَ الْمُبِيْنـَـا فقــد قــرَتْ عُــيونُ الْمُؤمِنيْنَـا

رددتَ أخـــيــــذةَ الإسْـــلامِ لَـمــَـا غــدا صــرفَ الـقـضـاء بــهــا ضمـيـنـــا

"আপনার দৃঢ় সংকল্পসমূহ প্রকাশ্য বিজয়ের মাধ্যমে গৌরবান্বীত হয়েছে। অতঃপর মুমীনদের নয়ন প্রশান্তি লাভ করেছে; ইসলামের লুন্ঠিত মাল আপনি ফিরিয়ে এনেছেন, যখন বিগত দিনে তা নিয়তীর ক্ষমতার তত্ত্বাবধানে চলে যায়।"

কবি কামাল উদ্দীন 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবনুন নাবীহ আল-মিসরী (মৃ.৬১৯/১২২২) তিনি কবি ইবনুল ফারিদের সমসাময়িক মিসরের একজন কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি আয়্যূবীদের প্রশংসায় প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর রচিত কবিতা সংকলনের একটি দীওয়ানও রয়েছে। তিনি সাধারণভাবে জীবন যপন করতেন ও শান্তস্বভাবের ছিলেন। তিনি তদানিন্তন রাজনৈতিক যুদ্ধের মঞ্চে নিজেকে অর্ন্তভূক্ত করেননি। যতদিন পর্যন্ত মিসরে ছিলেন ততদিন তিনি আয়্যূবী বংশের প্রশংসার মধ্যে তাঁর কাব্য রচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। জাজিরা ও খালাত অঞ্চলের গর্ভণর তথা শাসক আল-মালিকুল আশরাফ মূসার দরবারে পৌঁছে তাঁর নিজস্ব মুন্সী তথা লেখক পদে যোগদান করেন এবং তাঁর অধীনে চাকুরী করা অবস্থায় নাসিবায়ন এলাকায় বসবাস করতে থাকেন এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর কবিতা ছিলো মান সম্পন্ন এবং কব্যের বাক্যগুলো হৃদয়গ্রাহী ছিলো। তিনি লেখার স্টাইল-এর প্রবর্তন করেন এবং স্বভাবত অলংকারজনিত লিখা লিখতেন এবং শাব্দিক সৌন্দর্য্য ও প্রভাবকে অম্বেষণ করে কাব্যে স্থান দিতেন। তিনি কবিতাকে শিল্প এবং সঠিক জায়গায় পরিপূর্ণভাবে নিয়ে এসেছেন। আয়্যূবী যুগে তাঁর মত আলংকারিক ভাষায় কাব্য রচনায় পারদর্শী কোন কবি ছিলোনা। তাঁর কাব্য শিল্প শক্তিশালী, প্রাণবন্ধ এবং বিভিন্ন রঙ্গে ও আঙ্গিকে পরিপূর্ণ ছিলো। তিনি আয়্যূবী শাসকদের প্রশংসায় নিম্নের কবিতাটি রচনা করেন:[১০]

فَحَرِيق جمرة سَيْفِـهَ لـلمُعتَدِى ورحفَقُ خَمْرَةِ سَيْبِهِ للمحتَفِى

يـاَ بــدرُ! تَـزَعَمُ أن تُقَـاسَ بـوَجْـهِـهِ وعلى جَبِينِك كَلْفَةُ المُتَكَّلفِ؟

يـــاغَيْمُ! تَطْمَعُ أن تلوَن ككفه كَــلاَّ وَأنت من الجَـهَامِ المُحَلَّـفِ

“প্রশংসিত ব্যক্তির তরবারী বিদ্রুহীদের জন্য আগুন এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্বরূপ। তাঁর বদান্যতা ও অনুদান প্রার্থনাকারীদের জন্য বিশুদ্ধ মদ বা পানীয় বস্তুসদৃশ ; হে পরিপূর্ণ (১৪ তারিখের) পূর্ণিমার চাঁদ! তুমি কি এই ধারণায় লিপ্ত আছ যে, আমার প্রশংসিত ব্যক্তির সামনা সামনি মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে, অথচ তোমার ললাটে কৃত্তিমতা প্রদর্শনকারীদের চিহ্ন রয়েছে; হে আকাশের মেঘরাশি! তুমি কি এই আশা করছো যে, আমার প্রশংসিত ব্যক্তির হাতের বদান্যতার ন্যায় বদান্যতা করতে পারবে, তা মোটেই নয়। তুমিতো মাঝে মাঝে বৃষ্টির আশা দিয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করো না।”

‘আব্বাসী খলীফা নাসির বিল্লাহর ছেলের মৃত্যুতে কবি ইবনুন নাবীহ আল-মিসরী একটি শোকগাঁথা রচনা করেন, যার প্রথম দুটি লাইন হলো:[১১]

الناسُ للموتِ كخيلِ الطراد ِ فالسابقُ السابقُ منها الجوادُ
والله لايدعو إلى دارِه إلا مَنْ استصلح من ذى العِبادِ

“মানুষের মৃত্যুর অবস্থা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াদের ন্যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম এবং বিজয়ী সেই ঘোড়াটি যে সবার আগে অগ্রগামী হতে পারে; মহান আলাহ তাঁর নিকট সেই বান্দাকে ডেকে নেন, যাকে তিনি তাঁর কাছের যোগ্য ও উপযোগী মনে করেন।”

কবিতাটি দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি তাঁর কবিতা রচনা তিনটি বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন যেমন: ক. প্রশংসা: তাঁর প্রশংসাজনিত কবিতাগুলো দু‘একটি কাসীদা আব্বাসীয় খলিফা নাসির-এর জন্য রচনা করে বাকী সব কাসীদা আয়্যুবী পরিবারের লোকদের প্রশংসায় রচনা করেছেন। খ. প্রণয় কবিতা। গ. বর্ণনামূলক কবিতা। তিনি এ দুটুকে প্রশংসামূলক কবিতার ভূমিকায় আনয়ন করে থাকেন। যাতে প্রশংসীত ব্যক্তির প্রভাব, প্রতিপত্তি, বিজয়, দান ইত্যাদির উল্লেখ থাকে। কবি কাজী সায়্যিদ হিবাতুল্লাহ ইবনু সানা’ আল-মুল্ক(মৃ.৬০৮/১২১১) মিসরের নেতৃস্থানীয় কবিদের একজন ছিলেন। তিনি শী‘আ সম্প্রদায়ের বলে অপবাদ রয়েছে, তবে তিনি সুন্নী মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁর কবিতার লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো বর্ণনা ও পুরুষ জাতীয় গযল (الغزل المذكر) রচনা। তাঁর কবিতায় সুক্ষতার সাথে শিল্পরূপও বিরাজ করছে যা পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হয়। তবে তাঁর স্তুতি কবিতা ইরাক ও সিরিয়ার অন্যান্য কবিদের তুলনায় তত শক্তিশালী ছিলো না। সালাহউদ্দীন আয়্যুবীর প্রধানমন্ত্রী আল-কাযী আল-ফাদিল ও লিপিশৈলিকার ‘ইমাদ আল-কাতিব-এর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিলো। তারই ফলশ্রুতিতে তিনি সাম্রাজ্যের অধিক মর্যাদার আসনে সমাহীত হয়েছেন। কবি ইবনুল ফারিদের সমকালীন মিসরের কবিদের একটি দল যাদেরকে সাহিত্যরুচির ক্ষেত্রে একই সুতায় গাঁথা যায় তাঁদের মধ্যে ইবন সানা’ আল-মুল্ক ছিলেন একজন অন্যতম কবি। কাব্যের ক্ষেত্রে এবং গল্পকাহিনী বলার আসরে তিনি একটি রড় আসন অলংকৃত করেছেন। তিনি মৌলিকত্ব ছাড়াই গতানুগতিক পদ্ধতিতে

কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর একটি দীওয়ান হায়দরাবাদ থেকে (দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, নূতন সিরিজ, নং১২) ১৯৫৮খৃ. মুহাম্মদ 'আব্দুল-হাক্ক কর্তৃক বিস্তারিত জীবনীসহ প্রকাশিত এবং ফুসূসুল ফুসুল ওয়া 'উকূদুল-'উকুল' (فصوص الفصول وعقود العقول) নামক নিজস্ব গদ্য ও পদ্য রচনা সংকলনের প্রণেতা।[১২]

তবে কবি ইব্ন সানা' আল-মুলকের গুরুত্বের প্রধান কারণ এই যে, প্রাচ্যে তিনিই প্রথম মুওয়াশশাহাত (কখনও কখনও ফারসী শব্দসম্বলিত 'খারজা সহকারে) রচয়িতা এবং তাঁর নিকট লভ্য আন্দালুসী ও মাগরিবী নমুনা সমূহের রীতি থেকে সিদ্ধান্তে আসার পদ্ধতি তাঁর আয়ত্বে ছিলো। দারুত তিরায ফী 'আমালিল-মুওয়াশশাহাত (دارالطراز فى عمل الموشحات) জাওদাত রিকাবী কর্তৃক ১৩৬৮/১৯৪৯সালে দামিশক থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটির জন্য তিনি আয়্যুবী সুলতানদের যুগে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। গ্রন্থটি মুওয়াশ শাহাত রীতিতে রচিত। যার ফলে মুওয়াশ্শাহাত-এর গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব। গ্রন্থটিতে ৩৪টি নির্বাচিত আন্দালুসী ও মাগরিবী মুওয়াশশাহাত এবং লেখকের নিজস্ব রচনার ৩৫টি নমুনা রয়েছে। এগুলির শুরুতে একটি দীর্ঘ ভূমিকা স্থান পেয়েছে, যেখানে ইবন সানা' আল-মুল্ক এই কাব্য পদ্ধতির গঠন ও ছন্দ প্রকরণ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব আলোচনা করেছেন। প্রাচ্যের কবিদের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম মুওয়াশশাহাত কবিতা রচনার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন এবং তাতে তিনি পরিপূর্ণতা সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া সুলতান আল-মালিকুন নাসির সালাহ উদ্দীনের প্রশংসায় তিনি কবিতা রচনা করে বলেন:[১৩]

أمجلس لَهْوى ليس لى عنك مجلسُ لأوحشتَ لمَاغابَ لى عنك مُؤنِسُ
وإنى لِىْ البُشرى وإن فراستى تَصِح لأنى مُوْمِنٌ أتفرسُ

"আমার বিনোদনের কোন আসর, আপনার পক্ষ থেকে আমার জন্য কোন আসর নয় কী? আপনার পক্ষ্য থেকে আমার জন্য কোন বন্ধু আসরে অনুপস্থিত থাকলে, আমি শূণ্যতা অনুভব করি; আমার জন্য সুসংবাদ কোথায়? অথচ আমার বিচক্ষণা যথার্থ কারণ, আমি একজন অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন মুমিন ব্যক্তি।"

কবি আস'আদ ইবনুল খাতীব ইবনুল মাম্মাতী (মৃ.৬০৬/১২০৯) মিসরের কিবতী পরিবারের বিখ্যাত কবি ছিলেন। বংশের সর্বাপেক্ষা খ্যতিমান ব্যক্তি যে দীওয়ানুল-জায়শের প্রধানরূপে তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং পরবর্তীকালে সুলতান সালাহউদ্দীন(হি.৫৬৪-৬৮৯/খ্রি.১১৬৯-১২৯৩) ও তাঁর পুত্র 'আযীয 'উসমান ইবন সালাহ উদ্দীন(হি.৫৯৫-৫৯৮/খ্রি.১১৯৩-১১৯৮) উভয়ের শাসনামলে সকল দপ্তরে সচিব পদে উন্নীত হন। লেখক ও কবি হিসাবে তাঁর সাহিত্যিক সৃজনশীলতা প্রশংসীত ছিলো। তিনি

প্রথমে ফাতিমীদের এবং পরে আয়্যূবীদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তাতারী, বারবার ও ক্রুসেডের যুদ্ধে সালাহুদ্দীনের সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন। তাঁর পিতা শেরকূহের হাতে এবং তিনি সালাহ উদ্দীন আয়্যূবীর হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

করেন এবং তাঁর প্রশংসায় অনেক কবিতা রচনা করেন। তিনি সালাহ উদ্দীনের দাপ্তরিক কাজ করতেন। তিনি কালীলা ও দীমনাকে কাব্যে রূপান্তরিত করেছেন এবং সালাহউদ্দীন আয়্যূবী জীবন-চরিত কাব্য রচনা করেছেন।[১৪]

ইবনুল মাম্মাতীর সর্বাপেক্ষা স্থায়ী অবদান 'কিতাবু কাওয়ানীনিদ-দাওয়াবীন' শীর্ষক গ্রন্থখানি। যা আল-মাকরীযীর মতে সুলতান আল-আযীয উসমান ইবন সালাহ উদ্দীনের (মৃ.৫৯৮/১১৯৩) জন্য চার খন্ডে রচিত হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে। তাঁর কবিতা সংকলনের একটি দীওয়ানও রয়েছে। আয়ূবী সুলতান আল-মালিকুল আযীয 'উছমান এর কাছে তাঁর উযীর নাজমুদ্দীন ইবন ইব্রাহীম এর উদ্দেশ্যে একজন দাসীর সম্পর্কে শৈল্পিক রূপ দিয়ে প্রণয় কবিতা বা গযল রচনার জন্য বলা হয়েছিল, যা তার মুখমন্ডলকে সর্প এবং বিচ্ছুরূপে মিসকাম্বর (কস্তুরী) দিয়ে বর্ণিত হবে। তারপর নাজমুদ্দীন অনেকগুলো খন্ড কবিতা রচনা করেন। তারপর অনুরূপ কবিতা রচনা করার জন্য জনগণকে নির্দেশ দেন। তারা সবাই কবিতা রচনা করলেও ইবছুল মাম্মাতী এ সম্পর্কে অতি উৎকৃষ্ট মানের ২০টিরও অধিক কবিতা রচনা করেন। তিনি বলেন:[১৫]

نَقَشْتُ حَيّةً على   وَرَدِ خَدٍّ مُزَخَّرَفٍ
فَبَدَتْ آيَةُ الكَليـ   ـم على وَجْهِ يُوسُفَ

"আমি একটি সাজানো গোলাপের মুখমন্ডলে একটি সর্প চিত্রিত করেছি; অতঃপর ইউসূফের চেহারায় মুসা কালীমূলাহর নিদর্শন প্রতিবর্ণিত হয়েছে।"

কবি ইবনুল মাম্মাতী শৈল্পিক রূপে আরেকটি প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করে বলেন:[১৬]

قُلتُ للَّيلِ عِندَ ما زارَني البَدْ   رُ، وأو جَسَتُ خِيفَةً للرَّواحِ
أنتَ يا لَيلُ بِرَدٍّ دَارِ حَبِيبِي   فَتَأَهَّبْ لِدَفِعِ صَدْرِ الصَّبَاحِ

"যখন পূর্ণিমার চাঁদ আমার সাথে সাক্ষাত করতে আগমন করল এবং আমি তাঁর প্রস্তানের ভয়ে শংকিত হলাম; তখন আমি বললাম, হে রজনী হে রাত আমার প্রেয়সীর ঘর ফিরিয়ে দাও এবং সকাল বেলার আবির্ভাব প্রতিহত করার প্রস্তুতি নাও।"

ইবনুল ফারিদের সমকালীন কবি বাহা উদ্দীন যুহায়র (হি.৫৮১-৬৫৬/খ্রি.১১৬৯-১২৫৮) 'আরবের সুবিখ্যাত একজন কবি ছিলেন। আয়্যূবী যুগের নামকরা কবিদের মধ্যে একজন। তিনি আয়্যূবী পরিবারের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন। তিনি আল-মালিক আল-সালিহ আয়্যূবের নেতৃত্বে

মিশরে ফরাসীদের বিরূদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধের এবং তাঁর ছেলে মাহদী ইবন আল-কামিলের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন। ১২২৭খ্রি. সালে তিনি কায়রোতে বসবাস করতে থাকেন। কর্ম জীবনে তিনি সুলতান আল-কামিলের পুত্র শাহজাদা সালিহ সিংহাসনে আরোহন করে কবিকে উযির পদে নিযুক্ত করেন এবং বহুবিধ সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করেন। ১২৫৮খ্রি. সালে ক্রুসেড অভিযানকালে মানসূরাতে তাঁর পৃষ্ঠপোষক সুলতানের সঙ্গেই ছিলেন। ১২৩২খ্রি. সালে সিরিয়া ও উত্তর ইরাকে অভিযানকালে কবি সুলতানের সাথে ছিলেন, রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করে শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি এভাবেই কাটান। অতঃপর সুলতানের মৃত্যু হলে কবি সিরিয়াতে গমন করেন। শেষ বয়সে অর্থভাবে কষ্ট পেয়ে ৬৫৬/১২৫৮ সালে ইনতিকাল করেন। তিনি তাঁর সর্বত্তোম কবিতা নিবেদিত করেন দামিস্কের অধিপতি আল-নাসির ইউসূফের প্রশংসায়।[১৭]

কবি বাহা যুহায়রের কবিতা সংকলন দীওয়ান থেকে প্রতিভাত হয় যে, তিনি অকপট এবং তাঁর কবিতা যথার্থ সংগীতময়, তাঁর শব্দ নির্বাচন, আঙ্গিক বিচার, রুচিবোধ, ছন্দ ও ধ্বনি মাধূর্যের প্রভাব এবং সুরলালিত্য সকল কিছুই তাঁর পরিণত রুচিবোধের পরিচয়। কবি তাঁর সমকালীন কাব্যনীতি অনুসরণ করলেও তাঁর কাব্যের মধ্যে কদাচিৎ কৃত্রিমতাপূর্ণ ভাব ও ভাষা দেখা যায়। তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তিনি সহজ সরল শব্দ সংযোজনে কবিতা রচনা করতেন। ভাবের অতিরঞ্জন, কল্পনা ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তিনি কখনোও কবিতা রচনা করেন নি। তার কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল প্রণয়, তিরস্কার, বর্ণনা, রসিকতা, কৌতুক ইত্যাদি। তাঁর রচিত কবিতা সহজবোধ্য ও সাজানো ছন্দে আবৃত্তিকৃত। ঘটমান অবস্থার প্রতি বিরক্ত হয়ে যুগকে যারা অপবাদ দেয় তাদের প্রতি উপদেশ প্রদান করে তিনি রচনা করে বলেন:[১৮]

لاتعتب الدهر في خطب رماك به ان إسترد فقداً طالما وهجا
حاسب زمانك في حالىْ تصرفه تجده أعطاك اضعاف الذى سلبا

"যুগের আবর্তনে যখন তোমার উপর কোন বিপদাপদ আপতিত হয় তখন তুমি যুগের প্রতি অভিযোগ প্রকাশকরো না। কেননা যদিও সে তোমার কোন ক্ষতি সাধন করেছে তথাপিও সে তোমাকে অনেক প্রদান করেছে। যুগের ভালো-মন্দ উভয়দিককে তুমি বিচার কর। তুমি দেখবে সে তোমার থেকে যা কিছু ছিনিয়েনিয়েছে তার অনেক বেশী তোমাকে প্রদানও করেছে।"

মঙ্গোলীয় হালাকু খান(১২১৭-১২৬৫খ্রি.) কর্তৃক ৬৫৬/১২৫৮সালে বাগদাদে আব্বাসীয় এবং সালাহুদ্দীন আয়্যুবী কর্তৃক ৫৬৭/ ১১৭১ সালে মিসরে ফাতিমী খিলাফতের পতন ঘটে। এ সময় সিরিয়া ও মিসরে নামে মাত্র আব্বাসীয় খিলাফতের অনুকরণে আয়্যুবী সুলতানদের(১১৭১-১২৬০খ্রি.)

প্রায় ৯০ বছরের সুন্নী শাসন সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যুবী কর্তৃক (১১৭১-১১৯৩ খ্রি.) প্রতিষ্ঠিত হয়। মিসরে চারজন আয়্যুবীসুলতান, যথা সালাহুদ্দীন আয়্যুবী(খ্রি.১১৭৪), আল-মালিক 'আযীয(খ্রি.১১৯৩),আল-মালিক 'আদিল(খ্রি.১১৯৯) ও আল-মালিক কামিল(১২১৮খ্রি.)-এর শাসনের সময়কালে সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরবী সূফীকবি ও মরমীকবি ইবনুল ফারিদ(৫৬৭/১১৮১) সালে মিসরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং (৬৩২/১২৩৫) সালে মিসরেই মুত্যুবরণ করেন। যৌবন ও পরিণত বয়সপ্রাপ্ত হয়ে তিনি তাঁর অমর যুহ্দ তথা সূফীকাব্য রচনা করে আরব মরমী কবিসম্রাটের আসন সুলতানুল আশিকীনকে অলংকৃত করেছেন। আয়্যুবী সুলতানদের সময় মিসর ও সিরিয়ায় যুহ্দ ও সূফী কাব্যের ব্যাপক চর্চা ও অনুশীলন হয়। সুলতান সালাহুদ্দীন মিসরে খানকাহ্ সা'ঈদুস-সু'আদা'(خَانقاهْ سَعِيدُ السُعَدَاء) নামের 'দুওয়ায়রাতুস-সূফীয়্যাহ' (دُوَيْرَةُ الصُوْفِيَة) খানকাহটি প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনুল ফারিদের১৬৪৪ চরণের একমাত্র ক্লাসিক ও সূফী কবিতাসংকলন 'দীওয়ান ইবনুল ফারিদ' বিশ্বজোড়ে স্থায়ী সুখ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হয়। তাঁর রচিত দীওয়ান একটি ব্যতিক্রমধর্মী আরবী সূফীকাব্য ও শিল্পসাহিত্য।[১৯]

আরবী কবিতায় অপরিচিত শব্দের ব্যবহার পরিহার, বাক্যগঠনে কোমলতা ও সুক্ষতার আশ্রয়, ভাষায় নতুন কলাকৌশল, ভাবধারা, সাংকেতিক, প্রতীকী ও রূপালংকার ব্যবহার, প্রিয়সির বাস্তভিটার স্মরণে কবিতার সূচনা পরিহার, সুরম্যঅট্রালিকা, রাজকীয়প্রাসাদ ও মদেরবর্ণনা, উপমা-উদাহরণ, কাসীদার বিভিন্নঅংশের সাথে পরস্পর সুসম্পর্ক এবং ছন্দের অন্ত্যমিল স্থাপনে গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদি বিষয়গুলো আয়্যূবীসুলতানদের শাসনামলে রচিত আরবী কবিতার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ইবনুল ফারিদের কবিতায় এ সববৈশিষ্ট্য ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হয়। আয়্যুবী সুলতানদের শাসনামলে রচিত আরবী কাব্যসাহিত্যের বিষয় ও উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে রয়েছে, চতুষ্পপদী বা চৌপদী(رباعيات), লোকগিতী (مواليات), দু'পদীপালাক্রমী(دوبيتات), রহস্যাবৃতধাঁধাঁ (ألغاز), অন্তমিল (سجع), শ্লেষালংকার (جناس), বিরোধালংকার (طباق), দ্ব্যর্থরোধকউক্তি (تورية), সাংকেতিক বা প্রতীকী (رمزية), সূফীস্তবক (موشحات صوفية) বা সূফীস্তবক কবিতা ইত্যাদির বিকাশ। সমকালীন কাব্যসাহিত্যের এসব বিষয়ের আদলেই ইবনুল ফারিদ তাঁর আরবী সূফীকাব্য রচনা করেন।[২০]

মিসরে আয়্যূবী শাসনের সময় আরবী কাব্যসাহিত্যের নববিষয় ও বৈশিষ্ট্যাকাশে ইবনুল ফারিদ ছিলেন এক উজ্জ্বলনক্ষত্র। তিনি তাঁর অমর কাব্যগ্রন্থ দীওয়ান রচনার মাধ্যমে একটি নতুন আরবী সূফীকাব্যের অমর ধারার প্রবর্তন করেন। অদ্যাবধি পাঠক ও গবেষকদের কাছ থেকে তাঁর কাব্যস্মৃতি কখনো বিলীন হয়নি। তাঁর শৈল্পিকসূফীকাব্য বিনির্মাণের পেছনে সে সময়ের বেশ কয়েকজন কবি ও

সাহিত্যিকের অনুপ্রেরণা দিশারী হিসাবে কাজকরছিল। তাঁদের মধ্যে খামরিয়্যাহ কবিতা রচনায় পারদর্শী কবি আবূনুওয়াস(মৃ.১৯৯/৮১৪), হিজাযী কবিতা রচনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি শরীফ আর-রাযী (মৃ.৪০৫/১০১৬) এবং আরবী গযল বা প্রেমকাব্য রচনায় বিশিষ্টকবি 'আব্বাস বিন আহনাফের(মৃ.১৯২/৮০৭) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সূফী কাব্যতত্ত্ব, আক্ষরিকঅর্থের পরিবর্তে সাংকেতিক ও প্রতীকীঅর্থ ব্যবহারের কারণে ইবনুল ফারিদের কবিতা সূধীজনের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। একদা ইবনুল ফারিদ মিসরের জামি মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করতে প্রবেশ করে দেখেন যে, খতীব খুতবা দিচ্ছেন, আর নাম অজানা একজন ব্যক্তি মসজিদের ভেতর গান গাচ্ছেন। তিনি লোকটিকে অতি সংগোপনে আদবের সাথে দূরে সরিয়ে দিলেন।[২১]

নামাজ শেষে সকল মুসল্লী মসজিদ থেকে প্রস্থান করলে ইবনুল ফারিদ বের হয়ে দেখেন যে, গায়ক লোকটি তাঁর সামনে এসে নিম্নের কবিতাটি রচনা করেন:[২২]

قَسَمَ الإِلَهُ الأَمْرَ بَيْنَ عِبَادِهِ فَالصَبُ يُنْشِدُ وَالْخَلِيُ يُسْبِحُ

وَلَعَمْرِيْ التَسْبِيْحُ خَيْرُ عِبادَةٍ لِلنَاسِكِيْنَ وَذا لِقَوْمٍ يَصْلِحُ

"আল্লাহ বান্দাদের মাঝে তাঁর নির্দেশ(হুকুম) ভাগাভাগি করে দিয়েছেন। অতএব, তাঁর অনুরক্ত বান্দা কবিতা রচনা করেন; আর, তাঁর রিক্তহস্ত বান্দা তাসবীহ জপন করেন। আমার জীবনের শপথ! অনুসরণকারী (নাসিক, যাহিদ) ও জাতীর সংস্কারকদের(মুসলিহ) জন্য তাসবীহজপন উৎকৃষ্ট ইবাদত"। কবিতাটি শুনে ইবনুল ফারিদ যুহ্দের প্রতি যাবপরনাই খুবই অনুপ্রাণিত হলেন।

আয়্যুবী যুগে মিসর ও সিরিয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে বলা যায় যে, কবিগণ সেই পরিবেশ ও অবস্থাকে উপজীব্য করে এবং আরবী কবিতার বিভিন্ন লক্ষ্যউদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর আলোকে কবিতার গঠনপ্রকৃতি ও স্বাভাবিকরূপের মধ্যে কিছুটা বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন এনে তাঁরা কবিতা রচনা করেছেন। সিরিয়া ও ইরাকের আতাবেকদের কুর্দিস্থানের অধিবাসী শাসক ইমামুদ্দীন যঙ্গীর মনোনীত জনৈক কুর্দী সর্দার সালাহ উদ্দীনের পিতা আয়্যূব ইবন শাযীকে তাঁর পক্ষ থেকে সিরিয়া অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করে পাঠান। কালক্রমে আয়্যূব একজন বড় নেতা ও দক্ষ প্রশাসক হিসাবে পরিগণিত হন। তাঁর ছেলে সালাহউদ্দীন আয়্যূবী এবং ভাই আসাদউদ্দিন শেরকূহও যঙ্গী সুলতানদের দক্ষ প্রশাসক হিসেবে আস্থাভাজন হন। ইমামুদ্দীন যঙ্গীর (মৃ.৫৪১/১১৪৬) মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নুরুদ্দীন মাহমূদ(মৃ.৫৬৯/১১৭৩) সিরিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শেরকূহকে সিরিয়ার হিমস্ ও রাহবা অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করেন। শেরকূহের যোগ্যতা ও কৃতিত্ব দেখে নুরুদ্দীন তাঁকে নিজের প্রধান সেনাপতি করেন। নূরুদ্দীন যঙ্গী শিরকূহকে মিসর অভিযানে পাঠানোর সময় শেরকোহের ভ্রাতুস্পুত্র সালাহউদ্দীন ইবন আয়্যূবকেও মিসরে প্রেরণ

করেন। ফাতিমী খলীফা 'অযিদ উবায়দীর মৃত্যুর পর সালাহউদ্দীন আয়্যূবী ৫৬৪/১১৬৮ সালে মিসরের সিংহাসন দখল কওে সেখানে নামেমাত্র 'আব্বাসী খলীফার অধীনে স্বাধীন আয়্যূবী রাজত্বের গোড়াপত্তন করেন। তারপর অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর রাজত্ব মিসর, সিরিয়া, দিয়ারে বাকর, ইয়ামান ও হিজায অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। অতপর মিসর ও সিরিয়ায় ৬৪৮/১২৫০ সাল পর্যন্ত তাঁর বংশের রাজত্ব স্থায়ী হয়। সালাহউদ্দীন আয়্যূবীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বিশ্বকে খৃষ্টানদের হামলা ও আধিপত্য থেকে মুক্ত করা। এই মর্মে তিনি সকল ইসলামী শক্তিকে একত্রিত করেন এবং মিসর ও সিরিয়ার সামরিক স্থাপনা ও দুর্গগুলোর ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। সেখানকার অর্থনীতির ভিত মজবুত করেন এবং ফাতিমী শী'আ সম্প্রদায়ের বিপরীতে সুন্নী সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করেন। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন এবং মিসর ও সিরিয়ায় সর্বত্র মসজিদ, মাদ্রাসা, কারিগরী কলেজ ও উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। ফলে, সমকালীন আরব কবিগণ সামাজিক, রাজনৈতীক ও সামরিক কর্মকান্ডে আয়্যূবীদের বীরত্ব ও কৃতিত্বের বর্ণনা দিয়ে প্রশংসামূলক ব্যাপক কবিতা রচনা করেন যা পরবর্তী যুগেও অব্যাহত থাকে।[২৩]

রাজনৈতিক চড়াই উৎরাই ও যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে সুলতান সালাহউদ্দীন তাঁর সমগ্র শাসনামল মিসর, সিরিয়া ও দামিশক নগরীর মধ্যে অতিবাহিত করেন। কিন্তু তাঁর বংশের প্রতিনিধিরা পরবর্তী সময় শুধু মিসরকেই তাঁদের রাজধানী গড়ে তুলেন। ফলে তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়লে সিরিয়া সাম্রাজ্য আইয়্যূবীদের অধিকার থেকে মামলূকীদের অধিকারে চলে যায় এবং আইয়্যূবীরা শুধু মিসরের ওপরই তাঁদের দখলদারিত্ব বহাল রাখেন। রাজনৈতিক জটিলতা ও সমস্যা কাটিয়ে উঠার পর সালাহ উদ্দীন নিজের জীবদ্দশায় সাংস্কৃতিক বিষয়ের সমন্বয় সাধনের আপ্রাণ চেষ্টা করেন। নতুন শাসকদের জন্য ইবনুত-তুওয়ায়র ফাতিমী শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। খারাজ সম্পর্কে কাদী আবুল-হাসান প্রবন্ধ লিখেন। কবি ইবনুল-মাম্মাতী(মৃ.৬০৬/১২১১)-এর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কাওয়ানীনুদ-দাওয়াবীনে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আয়্যূবী শাসনামলের শেষদিকে আরো অনেক প্রবন্ধ ও পুস্তক রচিত হয়েছে, যা 'উছমান ইবন ইবরাহীম আন-নাবুলুসীর বিভিন্ন উদ্বৃতিতে সংরক্ষিত আছে এবং রচয়িতাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। আয়্যূবী সুলতান আল-মালিক আন-নাসির দাউদ(হি.৬২৭-৬৪৬/খ্রি.১২২৯-১২৪৮) -এর জীবদ্দশায়ই তাঁর মামলূক আমীরগণ জানতে পারে যে, খৃস্টান রাজার সাথে একটি ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তির ফলে বায়তুল মুকাদ্দাস খৃষ্টানদের অধিনে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। উমায়্যাদের প্রধান ইজ্জুদ্দীন আয়বেক এমন এক সুযোগে সুলতান দাউদের নিকট গমন করেন। সুলতান দাউদ এই সময় সুলতান আল-মালিক আল-আশরাফ(৬৪৮/১২৫০)-এর সাথে একটি তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। ইজ্জুদ্দীন আয়বেক জানতে

পারেন যে, দাউদ তার সাথে প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র করে দামিস্ক অধিকার করতে চায়। তিনি সুলতান দাউদকে তাঁবু থেকে বের করে নিয়ে আসেন। আল-মালিক আল-আশরাফের সাহায্যের জন্য মিসর থেকে আল-মালিক আল-কামিলের সেনা বাহিনী ইতোমধ্যে সিরিয়া পৌঁছে যায় এবং পরে সুলতান নিজেই সেখানে পৌঁছে যান। উভয় বাহিনী দামিস্কে অবতরণ করে। চার মাস পর্যন্ত আল-মালিক আল-আশরাফকে অবরোধ করে রাখা হয়। পরে দাউদের বাহিনী আত্মসমর্পণ করলে তারা তাঁকে পদচ্যুত করেন এবং ৬২৬/১২২৮ সালে মালিক আল-আশরাফকে দামিশকের সিংহাসনে বসানো হয়। সুলতান দাউদ কার্‌ক অঞ্চলে অবস্থান করতে থাকেন। তাঁর দুই চাচার সাথে চুক্তির ফলে তিনি খৃষ্টানদের কাছে বায়তুল মুকাদ্দাসের দখলদারিত্ব প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাস্থ করেন। মূলত, আয়্যুবী সুলতানদের শেষ শাসনকাল ছিল সুলতান ও আমীর উমারাদের পরস্পরের সাথে ঝগড়া, বিবাদ, মারামারি, হানাহানী, বিদ্রোহ ও গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এরই ফলশ্রুতিতে মামলূকরা সিরিয়া, মিসর ও আয়্যুবীদের অন্যান্য শাসিত অঞ্চল পর্যায়ক্রমে দখল করে ৬৫১/১২৫৩ সালে মামলূকী সালতানাতের গোড়াপত্তন করে। পরস্পরের মধ্যে বিরোধ থাকার পরও আয়্যূবী সালতানাতের পরিধি তাঁদের রাজত্বকালে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। সে সময়ের আরব কবিগণ তাঁদের এই বিজয়ের অনেক প্রশংসা করে প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন।[২৪]

আয়্যুবী সুলতানদের নব্বই বছরের শাসনামলে মিসর ও সিরিয়ায় সূফীকাব্যসহ যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ক আরবী কবিতার একটি উলেখযোগ্য শাখা নতুন ধারা ও প্রকৃতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদলে কিছু সময়ের জন্য হলেও বিকাশ লাভ করে। বিভিন্ন রাজবংশের সাথে সংগঠিত যুদ্ধে বিশেষ করে ক্রুসেড যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলিম যোদ্ধাদেরকে এই সব কবিতার মাধ্যমে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার যোগান দেয়া হয়। পরবর্তী দুই কি তিন শতাব্দী ধরে সামরিক কৌশল, আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র পরিচালনা ও সাধারণভাবে ধর্মযুদ্ধ বিষয়ক স্তুতি কবিতা, রাসূলপ্রশস্তি, প্রশংসামূলক সূফী মুওয়াশশাহাত ও শোকগাঁথার বেশ কিছু কবিতা রচিত হয়। প্রচলিত ক্লাসিকধর্মী কাব্যসাহিত্যশিল্পের নিশ্চলতা এই সময়কার ধর্মনিরপেক্ষ লোকায়ত কবিতার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এ সময় দীওয়ান আকারে আরবী কবিতা সংকলন যথেষ্ট রচিত হয়, কিন্তু খুব অল্প সংখ্যাক ক্লাসিকধর্মী কবি স্থায়ী সুখ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হন। তবে ব্যতিক্রমী ভাগ্যবান কবিদের মধ্যে এমন কয়েকজন সিরিয়-মিসরিয় কবিও ছিলেন যাঁদের আলংকারিক ও ছান্দিক ভাষায় রচিত ক্লাসিকধর্মী নতুন জাগরণী কবিতা ও রাসূল প্রশস্তির মর্যাদা অদ্যবধি অক্ষুণ্ন রয়েছে। আয়্যুবী শাসিত রাজ্যগুলোতে ব্যাপক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের বিস্তৃতির একটি প্রধান কারণ ছিলো সেখানকার রাজনৈতিক অবস্থার স্বাভাবিকতা, নির্মল পরিবেশ ও মনোরম আবহাওয়া। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সিরিয়া মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু

ছিলো, যার বাহন ছিল আরবী ভাষা ও সাহিত্য। কিছু কাল পর মিসরও এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত সেখানকার প্রাচীন উপাদান ও আয়্যুবীদের পছন্দনীয় নতুন উপাদানের মধ্যে কোন সমন্বয় হয়নি। ইসলামী সাংস্কৃতির ব্যাপারে সকল কৃতিত আয়্যুবীগণ প্রাপ্য নন। শাহাজাদাদের ানদঅব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করাও যাবেনা। মুসলিম খলীফা উপাধি ধারণের ঘোষণা দেয়ার বিস্ময়কর প্রচেষ্টা তাঁরা কেউ কখনো চালাননি।[২৫]

আয়্যুবী বংশের শাসক আল-মালিকুল আফজাল 'আলী ইবন সালাহউদ্দীন আয়্যুবী (মৃ.৬২১/১২২৪) আরবী কাব্যচর্চায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। সিরিয়ার যঙ্গী বংশের শাসনামলের (হি.৪৮৯-৫৭৭/খ্রি.১০৯৫-১১৮১) অধিনায়ক নূরুদ্দীন যাঙ্গীর পিতা ইমামুদ্দীন যাঙ্গীর মৃত্যুর পর পুত্র নূরদ্দীন যাঙ্গী নাজমুদ্দীন আইয়্যুবকে রাজধানী দামিস্কের দূর্গাধিপতি নিযুক্ত করেন এবং তাঁর পুত্র সুলতান সালাহ উদ্দীনকে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। ৫৬৭/১১৭১ সালে ফাতিমী 'আযিদ 'উবায়দীর মৃত্যুরপর সালাহউদ্দীন আইয়্যুবী মিসরের সুলতান রূপে অধিষ্ঠিত হন। ৫৬৯/১১৭৩ সালে যখন সুলতান নূরুদ্দীন যঙ্গীর মৃত্যু হয় তখন কাকে দামিস্কের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবেন এই নিয়ে সেখানকার রাজকীয় কর্মকর্তা ও সভাসদদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। সুলতান সালাহ উদ্দীন তখন মিসর থেকে দামিস্কে এসে সুলতান নূরুদ্দীনের পুত্র মালিক আল-সালিহকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন এবং সেই দিন থেকে সিরিয়াও সুলতান সালাহ উদ্দীনের অধিকারে চলে আসে। এর ফলে ইয়ামান এবং হিজাযেও সুলতান সালাহ উদ্দীনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপের খৃষ্টানরা তখন সম্মিলিতভাবে সিরিয়া ও মিসরের উপর হামলা চালায়। এটা ছিল ইসলামী বিশ্বের জন্য একটি দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্ত। এই সময় সুলতান সালাহ উদ্দীন পাহাড়ের মত অটল থেকে এই হামলা প্রতিরোধ করেছেন। এক পর্যায়ে সকল মুসলিম নেতৃবর্গ সর্বসম্মতিক্রমে সালাহ উদ্দীনকে সিরিয়ার সুলতান বলে স্বীকার করে নেয়। সুলতান সালাহউদ্দীনের নের্তৃত্বে ৫৮৩/১১৮৭ সালে অনুষ্ঠিত ধর্মযুদ্ধ তথা ক্রুসেড যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসকে খৃষ্টানদের কবল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা হয়। পরবর্তী সময়ে মামলূক সুলতানদের শাসনামলে ১৩শ শতকের শেষার্ধে ফিলিস্তিনসহ সমস্ত আরব ভূখন্ড থেকে খৃষ্টানদেরকে যুদ্ধে পরাজিত ও বিতাড়িত করা হয়।[২৬]

আয়্যুবী সুলতানদের শাসনামলে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের একটি বড় ধরনের প্রভাব লেখক শিল্পীদের চাইতে আরব কবিদের স্বভাব চরিত্রের উপর ব্যাপক বিস্তার লাভকরে। ফলে কবিগণ খীলফা, সুলতান, আমীর, উযীর ও শাসক শ্রেণীর অতি কাছে অবস্থান করতে সমর্থ হন। মন মানসিকতার পরিবর্তনের সাথে সাথে তাঁরা নতুন সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করার প্রতি অধিক মনোযোগী হয়ে পড়েন। তাঁরা শাসকশ্রেণীর সভায়, দপ্তর ও বিভিন্ন আসরে তাঁদের সঙ্গী হয়ে ও

তাঁদের সাথে মেলামেশা করে খোশ-গল্পে নিমজ্জিত হতেন এবং কবিতা রচনা করতেন। কিন্তু সূফী কবি ইবনুল ফারিদ এর ব্যতিক্রম ছিলেন। সুলতান ও শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে তাঁর সমকালীন কবিগণ কবিতা রচনার উদ্দেশ্যে মিসর ও সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে থাকেন। এই সুযোগ তাঁদের পূর্বসূরী কবিগণ কখনো পাননি বলে প্রতিয়মান হয়। এরই ফলশ্রুতিতে প্রকৃতিগত ও স্টাইলগত আরবী কাব্যরচনায় তাঁদের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিদেশী ফার্সী ভাষারশব্দ ক্ষেত্র বিশেষে আরবী কবিতায় অনুপ্রবেশ ঘটে। যেমন- ইবন সানা' আল-মালিক-এর মুওয়াশশাহাত কাব্যে এর ব্যাপক অনুপবেশ ঘটে। তবে অপরিচিত শব্দের ব্যবহার পরিহার, বাক্য গঠনে কোমলতা ও সুক্ষতার আশ্রয়, নতুন কলা, শিল্প, ভাবধারা ও ভাষার অলংকারের অধিক ব্যবহার, বাস্তুভিটার স্মরণে কবিতার সূচনা পরিহার, অট্রালিকা, মহল ও মদের বর্ণনা, উপমা, রূপালংকরের অধিক ব্যবহার, কাসীদার বিভিন্ন অংশের সাথে পরস্পর সম্পর্ক বজায় রাখা এবং কাব্যে ছন্দগত মিল স্থাপনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদি বিষয়গুলো আয়্যূবী যুগের আরবী কবিতায় ব্যাপক বিস্তার লাভ করে।[২৭]

ইবনুল ফারিদের সময় মিসর ও সিরিয়ায়আরবী পদ্য সাহিত্যের বিবর্তনের ধারায় আকৃতি-প্রকৃতির বিচারে প্রথমত 'আরবী কবিতা (الشعر) কে নিম্নলিখিতভাবে দুই প্রকারে ভাগ করা যায়:[২৮]

ক. খন্ড কবিতা, যাকে আরবীতে قطعة বলা হয় এবং খ. দীর্ঘ কবিতা যাকে আরবীতে قصيدة বলা হয়। তবে, পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে কবিতাকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যেমন: ক. কাহিনীকাব্য বা মহাকাব্য (الشعر القصصى, ঊঢ়রপ চড়বঃৎু); খ. গীতি কবিতা (الشعر الغنائى); গ. নাট্য কাব্য (الشعر التمثيلى, উৎধসধঃরপ চড়বঃৎু)। আবার গীতি কবিতা (الشعر الغنائى) কে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে:[২৯]

১. গৌরবগাথা (الفخر)। নিজের, পরিবারের এবং স্ববংশের গর্ব-অহংকার বর্ণনা করে রচিত হয়েছে যে সব কবিতা তা-ই গৌরবগাঁথা হিসাবে খ্যাত।

২. বীরত্বগাঁথা (الحماسة) । যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতা প্রদর্শনে অথবা আরবদের মানবীয় গুণাবলী বিকাশের ক্ষেত্রে নিজের এবং স্বীয় বংশের যে বীরত্ব প্রকাশিত হতো তারই বর্ণনায় রচিত কবিতা বীরত্বগাথা বা حماسة নামে খ্যাত। এর সার্বিক অর্থ হলো, যুদ্ধ ক্ষেত্রে সাহসিকতা প্রদর্শন, দুর্যোগে সহিষ্ণুতা অবলম্বন, প্রতিশোধ গ্রহণে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালানো, দুর্বলদের রক্ষা এবং সবলদের প্রতিরোধ করা। হামাসার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:[৩০]

"Hamasa denotes, the virtues most highly prized by the Arabs: bravery in battle, patience in misfortune, persistence in revenge, protection of the weak and defiance of the strong".

৩. প্রশংসামূলক কবিতা (المدح), এটা হলো কোন মর্যাদাবান ব্যক্তির উত্তম গুণ উলেখ করে কবিতা রচনা করা। যেমন, বুদ্ধি, পবিত্রতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং বীরত্বের উল্লেখ করা কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে গঠন প্রকৃতির প্রশংসা করা। জাহিলী যুগে নাবিগা, আ'শা ও যুহায়র এ ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেন।[৩১]

৪. ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কুৎসামূলক কবিতা (الهجاء): এটা হলো কবিতার মাধ্যমে কোন লোকের বা কোন বংশের দোষ বর্ণনা করা এবং তাদের সৎ ও উত্তম গুণাবলী অস্বীকার করা।[৩২]

৫. ভৎসনামূলক কবিতা (العتاب): এটি ব্যঙ্গ জাতীয় কবিতা-ই তবে আরও একটু কঠোর প্রকৃতির, অর্থাৎ কবিগণ তাদর বিপক্ষীয় লোকজন ও গোত্রের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে ভৎসনা করত এ জাতীয় কবিতায়।[৩৩]

৬. শোকগাথা (الرثاء): যে কবিতায় গুণাগুণ, তার ঘটনাবহুল জীবনের অংশ বিশেষ নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে رثاء বা শোকগাথা বলা হয়।[৩৪]

৭. প্রেমের কবিতা (التشبيب) যথা-গীতিকবিতা (الغزل) এবং প্রেমোদ্দীপক কবিতা (النسيب)। এই কবিতার মাধ্যমে কবির প্রেয়সীর স্মৃতিচারণ করা হয় বলে তাকে প্রেমের কবিতা বা التشبيب বলে।[৩৫]

৮. বর্ণনামলূক (الوصف): বিভিন্ন জিনিসের ব্যাখ্যা বিশেষণমূলক কবিতাই হল বর্ণনামূলক কবিতার অর্ন্তগত। এ বিশেষণ বাস্তবভিত্তিকও হতে পারে, আবার রূপকও হতে পারে। কবি যেন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ্য করেছেন বা অনূভব করেছেন। যেমন, নৈসর্গিক বর্ণনা, প্রকৃতির বিশেষ মুহূর্ত বা দৃশ্যের বর্ণনা, প্রেয়সীর কাছে পৌছবার বাহনের বর্ণনা ইত্যাদি।[৩৬]

৯. জ্ঞানগর্ভ বা নীতিবাক্যমূলক (الحكم): যে সকল কবিতায় কবিতা নিজেদের অভিজ্ঞতালব্দ জ্ঞান থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রজ্ঞাময় কবিতা রচনা করেন তাকেই حكم বা জ্ঞানগর্ভ বা নীতিবাক্যমূলক কবিতা বলে।[৩৭]

১০. মদ্যপান সম্পর্কীয় (الخمريات): বিভিন্ন সময় ও যুগে মদের ও মদের আসরের বর্ণনা দিয়ে কবিগণ কবিতা রচনা করতেন।[৩৮]

১১. ধর্মীয় আধ্যাত্মিক (الزهد): ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে কবিগণ কবিতা রচনা করতেন যা পরবর্তী পর্যায়ে সূফী কবিতার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।[৩৯]

১২. রাজনৈতিক কবিতা (السياسة): কবিগণ রাজা, বাদশা, খলীফা , সুলতান ও আমীরদের রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন।[৪০]

১৩. হাসি ঠাট্টার কবিতা (الهزل): সকল ধরনের শাসক গোষ্ঠীর আসরে কবিগণ কখনো কখনো হাসি ঠাট্টা করে কবিতা রচনা করতেন।[৪১]

১৪. শিক্ষা ও নীতি বিষয়ক কবিতা (الشعر العلمى): এই কবিতায় জ্ঞান, নৈতিক আদর্শ, তত্ত্বকথা ইত্যাদি আলোচিত হয়।[৪২]

১৫. মানবতাবাদী কবিতা (شعر الإنسانية): যে কবিতা মানুষের কাজকর্ম মানবীয় বিষয় ইত্যাদি নিয়ে রচিত হয় তাকে الشعر الإنسانية বলা হয়। আবার যে কবিতায় কোন বিশেষ সম্প্রদায় ও তাদের কর্মকান্ড আলোচিত হয় তাকে الشعر الإنتخابى বলা হয়। অতীত কালের সকল কবিতা এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। [৪৩]

১৬. বৈশ্বিক কবিতা (الشعر العالمى): যে কবিতায় প্রত্যেক সময় ও প্রত্যেক স্থানের সকল মানুষের স্বভাব চিত্রায়িত হয় তাকে বৈশ্বিক কবিতা বলা হয়।[৪৪]

অন্য একটি ধারায় এই যুগের কবিগণ ভাষা, স্বরচিহ্ন, পরিমাপ, ছন্দ, কবিতার অবকাঠামো ইত্যাদির মধ্যে নতুন নতুন পরিবর্তন এনেছেন। ফলে এই যুগে কাব্যশিল্পের শাখা হিসাবে ৭ টি নতুন শাখার আবির্ভাব ঘটে, আর তা হলো:[৪৫]

ক. الشعر القريص খ. الموشح গ. الدوبيت ঘ. الزجل ঙ. الموالیا চ. الكان كان ছ. الحماق। তবে ইরাক ও আশপাশের লোকদের নিকট তা হলো পাঁচটি, ফলে উপরের الحماق ও হিযাজীদের উদ্ভবিত الزجل কে قوما হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই الزجل ও قوما আবিষ্কার করেছে রমযান মাসে রোযাদাদেরকে রাতে ঘুম থেকে উঠে সেহরী খাওয়ার জন্য তারা এটি আঞ্চলিক ভাষায় গাইত। বাগদাদের অধিবাসীরা এই সাতটির প্রথম তিনটি বিশুদ্ধ আরবীকৃত বা المعربة , পরবর্তী তিনটিকে অশুদ্ধ আরবীকৃত বা الملحونة হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আর বাকী একটি হলো এই দুইটির মাঝামাঝি, যাকে বলা হয় الموالیا। শুদ্ধ ও অশুদ্ধ আরবীকৃত এর মধ্যে الموشح ও الزجل টি স্পেনীয় ও পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে গ্রহণ করা হয়। আর বাগদাদ ও পারস্য সাহিত্যের সংমিশ্রণে গ্রহণ করা হয় الدوبيت ও الموالیا । الكان كان এক প্রকার আরবী কবিতা যা, বাগদাদের আঞ্চলিক ভাষা ও পারস্যের ছন্দমাত্রা দ্বারা প্রভাবিত যার মধ্যে ছন্দপতন ঘটেছে এবং কবিতার প্রত্যেক অংশে বর্ণনাকারী অন্তর্ভূক্তি রয়েছে। মিসর সিরিয়ায় আয়্যুব সুলতানদের যুগে রচিত আরবী কবিতার বিষয়বস্তুর আলোকে সে যুগের কবিদেরকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:[৪৬]

ক. অনুসরণকারী (التقليديون): আব্বাসী, উমায়্যাহ এমনকি স্পেনীয় উমায়্যাহ ও মিসরীয় ফাতিমী যুগের কবিতার ছন্দমাত্রা, অলংকার, রূপ, কাঠামো, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর অনুসরণকারী এই যুগের কবিদেরকে বলা হয় অনুসরণকারী কবিগণ (التقليديون)।

খ. নতুন উদ্ভাবিত কাব্যকলার রূপে রচিত কবিতার কবিগণ (البديعون): এই যুগে যারা নতুন আঙ্গিক, রূপালংকার ও ছন্দমাত্রার অনুসরণ করে কবিতা রচনা করেন তাদেরকে বলা হয় নতুন উদ্ভাবিত কাব্যকলার কবিগণ।(البديعون) ।

গ. উপরের এই দুই ধারার সমন্বয়কারী কবিগণ (المحدثون): যারা এই দুই ধারার কবিতার মাঝামাঝি অবস্থান করে প্রাচীনদের থেকে ভাব ও অর্থ এবং নতুনদের থেকে রীতি নীতি বা ধরণ প্রকৃতি, রূপ-রস ইত্যাদি গ্রহণ করেছেন তাদেরকে বলা হয় নতুন-পুরাতন সমন্বকারী কবিগণ (المحدثون)। এই যুগে কয়েকজন কবি এমনও ছিলেন যাঁরা নিজেদের জীবিকা উপার্জনের জন্য রাজা-বাদশা, সুলতান, আমীর, উজির, শাসক ও নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রশংসা করে কবিতা রচনা করতেন। আবার কোন কোন কবি এমনও ছিলেন যাঁরা শুধু স্তুতি কবিতার মাধ্যমে ধর্মীয় অনুভূতি ও রাসূলুলাহ (স.)-এর প্রশংসায় নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তাঁদেরকে বলা হতো প্রশংসায় নিবেদিতপ্রাণ কবিগণ (المديحيون) যাঁদের রচিত কবিতার অন্তর্নিহিত ক্রিয়াশীল সাধারণ মৌলিক অর্থই কবিতার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে চিহ্নিত।

‘আব্বাসী যুগের শেষের দিকে এসে আরব কবিদের কবিতার লক্ষ্যউদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বিশেষ একটি পরিবর্তন সাধিত হয়। কবিতা চর্চার এমন কোনো বিষয়বস্তু ছিলনা যা নিয়ে তাঁরা কবিতা রচনা করেননি। এরই ধারাবাহিকতায় কবিতার বিষয়বস্তু নির্ণয় করতে গিয়ে মিসর ও সিরিয়া ভিত্তিক আয়্যূবী শাসনামলের আব্বাসী খিলাফত যুগে কবিতার লক্ষ্যউদ্দেশ্যে ও বিষয়বস্তুর দিকে তাকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিশেষভাবে দেখা যাবে:[৪৭]

১. ব্যক্তি প্রশংসামূলক (المِدَح السخصية): আরবী সাহিত্যের প্রথম যুগ থেকে আয়্যূবী যুগ পর্যন্ত এই ধারা চলে এসেছে। ব্যক্তিগত প্রশংসার মধ্যে যেমন-বদান্যতা, দান, খলীফা ও সুলতানদের প্রশংসা। কবিগণ জীবিকা অর্জনের স্বার্থে রাজা, বাদশা, আমীর, উযীর ও শাসকদের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁদের প্রশংসা করে কবিতা রচনা করতেন। বন্ধু উযীর সাফী উদ্দীন ইবনুল কাবিদ(মৃ.৫৮২/১১৮৬)-এর প্রশংসা করে কবি ইবনুস সা‘আতী(হি.৫৫৩-৬০৪/খ্রি.১১৫৯-১২০৯) কবিতা রচনা করে বলেন:[৪৮]

مــا جلــقُ الــفـيـحـــاءُ إلا جـنـــةٌ   فضلـهــا وحْيُ الــغـمــام المُـنـــزلُ
كـمْ نِـعَـمٍ لـلـعيـش فـى أرجـاءهــا   يُـفْصَـحُ عـنْهــا سهْـلُهــا والـجـبـلُ

"সৌরভময় জাল্লাক জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়, যাকে বর্ষণকারী মেঘরাশীর বার্তা গৌরবান্বিত করেছে; যার চার পাশে রয়েছে জীবনধারণের অগণিত প্রাচুর্য এবং যার কারণে তার পার্শ্ববর্তি সমতলভূমি ও উঁচু পাহাড় সুভাষীত হয়েছে"।

২. রাসূল-প্রশস্তি (المِدَح النبويات) ও পূর্বাঞ্চলীয় আলংঙ্কারিক রাসূল প্রশস্তি (البديعات المديحية النبوية الشرقية)। আয়্যূবীযুগে রচিত রাসূল-প্রশস্তি একটি উলেখযোগ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, যা প্রাচীন ও আধুনিক কবিতায় ব্যাপকহাবে পাওয়া যায়। তবে আয়্যূবী যুগের শেষ দিক থেকে মামলূকী যুগের প্রথমাংশে এই ধরনের কবিতা রচনা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। রাজনৈতিক ও যুদ্ধ বিগ্রহের দামাডোলের কারণে কবিগণ নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য অর্থাৎ নিরপেক্ষ থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ(স.)-এর প্রশংসা করে ব্যাপক কবিতা রচনা করেছেন। পরবর্তীতে সূফীতত্ত্বের দিকে এই কবিতার ধারা সম্প্রসারিত হয়। কবি ইব্নুস সা'আতী(হি.৫৫৩-৬৩০/খ্রি. ১১৫৯-১২০৯) রাসূল-প্রশস্তিতে দীর্ঘ কাসীদা রচনা করেন, যা তিনি কা'ব বিন যুহায়র(রা.) রচিত বানাত সু'আদ (কাসীদাতুল বুরদা) কবিতার সাথে তুলনা করেছেন, তা থেকে দুটো লাইন নিম্নে উল্লেখ করা হলো:[৪৯]

كيف أخملُ في د نيا وآخرة ومنطقي ورسول الله مأمول

هوالبشيرُ النذيرُ العدلُ وشاهدُه وللشهادة تجريحُ وتعديلُ

"আমি দুনিয়া ও আখিরাতে কিভাবে অখ্যাত থাকবো, অথচ আমার বাকশক্তি ও রাসূলুলাহ্(স.) আমার প্রত্যাশা; তিনি (রাসূলুলাহ্ স.) জান্নাতের সুসংবাদ দাতা, জাহান্নামের সতর্ককারী, ন্যায়বিচারের প্রত্যয়নকারী সাক্ষী, আর প্রত্যয়নের রয়েছে খন্ডন ও সংশোধন"।

৩. কবিতার আর্থিক ও শাব্দিক রূপকে কৃত্তিম অলংকার ও অভিনব সাজে সাজানো (المحسنات اللفظية و المعنوية و الزخارف البديعية): এই বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে, পূর্বাঞ্চলীয় আলংঙ্কারিক রাসূল-প্রশস্তিসহ অলংকার শাস্ত্র ও ছন্দমিলের অন্যান্য বিষয়গুলো এই যুগের কবিতায় উপস্থাপন করা হয়েছে, যেমন: উপমা (التشبيه), রূপালংকার (الاستعارة), অন্তমিলযুক্ত কবিতা (السجع), শ্লেষালংকার(الجناس) বাক্যের দুই অংশের মধ্যে মিলযুক্ত শ্লেষাংকার, বিরোধালংকার (الطباق), নতুন ধারায় রচিত শোকগাঁথা (المراثي), প্রাচ্যের লোকগীতি (الموشحات في بلاد الشام) তথা সিরিয়ার সূফী লোকগীতি যা স্তবকে স্তবকে বিন্যস্ত একাধিক অন্তমিল বিশিষ্ট কবিতায় স্থান পায়, আয়্যূবী যুগে শাব্দিক অলংকারজনিত সৌন্দর্য উপস্থাপনের মাধ্যমে কবিতা রচনা করতেন। এই অলংকারের মধ্যে আরো রয়েছে যেমন: কবিতায় প্রেমোদ্দীপক ভূমিকা (حسن التخلص) সুন্দরভাবে কবিতার প্রারম্ভে উপস্থাপনের রীতিনীতি আরবদের মধ্যে প্রাথমিক যুগ থেকে আয়্যূবী যুগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিলো। তবে আয়্যূবী যুগের আধুনিক কবিগণ এর গতিপথ আরো সামনের দিকে উন্মুক্ত করে

দেন এবং التخلص কবিতার প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হয়। কবি আশ-শারফুল আনসারী (হি.৫৮৬-৬৬২/খ্রি. ১১৯০-১২৬৩) তাঁর কবিতায় এটি ব্যবহার করেছেন। বাক্যের শুরুতে এমন কিছু শব্দ আনয়ন করা(الابتداء) যা পরবর্তীতে কবিতার বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত বহন করে। এটি প্রথম থেকে আয়্যুবী যুগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিলো। তবে আয়্যুবী যুগে তা অনেক বিস্তৃতি লাভ করে। এটাকে براعة الاستهلال বলা হয়। কবি আশ-শাব আজ-জারীফ(হি.৬৬১-৬৮৮/খ্রি.১২৬৩-১২৮৯) এ জাতীয় কবিতা রচনা করেছেন।[৫০]

৪. আরবী কাসীদার অবকাঠামো (هيكل القصيدة العربية): ইবন রাশীক আল-আন্দালুসী(মৃ.৪৪২/১০৫০) আরবী কাসীদার কাঠামোর একক্যত্বের মত পোষণ করেন। এটা স্পেনে মুওয়াশশাহাত ও যাজাল-এর ক্ষেত্রে অনুসরনীয় কাঠোমোর সাথে প্রতিযোগীতা করে থাকে। আয়্যুবী যুগের কবি ইবন 'উনায়ন(হি.৫৪৯-৬৩০/খ্রি.১১৫৪-১৩৩২) তাঁর দীওয়ান গ্রন্থে সিরিয়ার আঞ্চলিক ভাষার অনেকগুলো শব্দ তাতে সংযোজন করেছেন যেমন- (العواني) (العلق) (النصب) (دق حنك) (ماقصر) (ذقن) ইত্যাদি।[৫১]

৫. আধ্যাত্মিকতা বা পরকাল সম্পর্কীত সূফী কবিতা (الشعر الصوفي): এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে তপশ্চর্যা, তপস্যা, আর পারিভাষিক অর্থে যুহ্দ হলো পার্থিব সম্পদের মায়া ত্যাগ করে শুধু পরকালের উদ্দেশ্যে নিজের জীবন-সম্পদ উৎসর্গ করে ঐকান্তিকভাবে মহান আল্লাহর দরবারে নিজকে সোপর্দ করা। 'আব্বাসী যুগে আবুল 'আতাহিয়্যা, আবু নুওয়াস, আল-মুতানাব্বী(মৃ.৩৫৫/৯৬৫), আল-মা'আররী(মৃ.৪৪৯/১০৫৭) সহ আরো অনেকেই এই صوفي বা আধ্যাত্মিক কবিতা রচনা করেছেন। আয়্যুবী শাসনামলেও صوفي বিষয় নিয়ে অনেক কবি কবিতা রচনা করেছেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন সূফীতাত্ত্বিক ইবনুল ফারিদ বিখ্যাত মরমীকবি।[৫২]

৬. ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও বীরত্বমূলক মহাকাব্য (الملاحم والأحداث): আয়্যুবী যুগে ঘটিত প্রধান প্রধান ঘটনাবলী ও ক্রুসেড যুদ্ধগুলোর বর্ণনাকে উপজীব্য করে প্রচুর কবিতা রচনা করা হয়েছে। এই যুগে এই ধরনের কবিতার ব্যাপক বিকাশ ঘটে।[৫৩]

ইবনুল ফারিদের সময় এশিয়ার অজ্ঞাত অঞ্চল ও তেপান্তর থেকে আগত মিসর ও সিরিয়ায় তাতারী ও মোঘলদের যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘঠিত হয় তাকে উপজীব্য করে আয়্যুবী যুগের মিসর ও সিরিয়ার কবিগণ যে কবিতা রচনা করেছেন, সেগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করা যেতে পারে:[৫৪]

ক. যঙ্গী ও আয়্যুবীদের সাথে ক্রুসেডদের সংঘটিত যুদ্ধ (ملاحم الزنكيين والأيوبيين): সিরিয়া অঞ্চল ও বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে খৃষ্টানদেরকে বিতাড়িত করার জন্য তাদের সাথে যঙ্গী ও আয়্যুবীদের সাথে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তার বর্ণনা দিয়ে এই যুগের কবিগণ প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন।

খ. ধর্মীয় যুদ্ধ সংক্রান্ত কবিতা (الصراح الديني): ক্রুসেডের যুদ্ধে সালাহউদ্দীন আয়্যুবী বিজয়ী বেশে যখন বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেন তখন ইবনুস সা'আতী(হি.৫৫৩-৬০৪/খ্রি.১১৫৯-১২০৯) তাঁর ধর্মীয় এই যুদ্ধবিজয়ের কবিতা রচনা করেছেন।

গ. যুদ্ধক্ষেত্রে উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদান (استثارة وتحريض): ক্রুসেড যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়ে এবং জঙ্গী ও আয়্যুবী পরিবারের শাসকদের স্বপক্ষে যুদ্ধ পরিচালনার প্রতি অনুপ্রাণীত করে এবং সালাহ উদ্দীন আয়্যুবীর প্রশংসা করে কয়েকজন কবি কবিতা রচনা করেছেন। সুরক্ষিত ইনতাকিয়া দুর্গ ও বুর্জিয়া দুর্গ মুক্ত করার পরিপ্রেক্ষিতে সালাহউদ্দীনের প্রশংসায় কবি শিহাব আশ-শাগুরী(হি.৫৩৩-৬১৫/খ্রি.১১৩৯-১২১৮) ও ইবন আল-কায়সারানী(হি.৪৭৮-৫৪৮/খ্রি.১০৮৫-১১৫৪) অনেক কবিতা রচনা করেছেন।

ঘ. সুসংবাদ, অভিনন্দন ও বিজয়বার্তা (تباشير و تهان وفتوح) । এই সময় কবিগণ আয়্যুবী শাসকদের যুদ্ধ বিজয়ের সুসংবাদ, অভিনন্দন ও বিজয়বার্তা দিয়ে অনেক কবিতা রচনা করেছেন।

ঙ. হিত্তীনের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ (ملحمة حطين); সিরিয়ার নাবলূসের অর্ন্তগত হিত্তীন নামক স্থানে অনুষ্ঠিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সালাহউদ্দীন আয়্যুব এর বীরত্বের প্রশংসা করে অনেক কবি কবিতা রচনা করেছেন। তাবারিয়া শহরে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে সালাহউদ্দীন এর বিজয় সম্পর্কে কবি ইবনুস সা'আতী (হি.৫৫৩-৬০৪/খ্রি.১১৫৯-১২০৯) কবিতা রচনা করেছেন।

চ. বায়তুল মুকাদ্দাস মুক্তকরণ প্রসঙ্গে (تحرير بيت المقدس): হিত্তীনের যুদ্ধের পর প্রায় ৯০ বছর খৃষ্টানদের কবলে বায়তুল মুকাদ্দাস থাকার পর সালাহ উদ্দীন আয়্যুবী ৫৮৩/১১৮৭ সালে খৃষ্টানদের হাত থেকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বায়তুল মুকাদ্দাস মুক্ত করেন। তাঁর এই অসীম সাহসের প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন কবি ইমাদুদ্দীনআল-কাতিবআল-ইস্পাহানী(মৃ.৫১৯-৫৯৮/খ্রি.১১২৫-১২০১)। যিনি একই সময় সিরিয়ায় সালাহ উদ্দীন আয়্যুবীর উযীরও ছিলেন।

ছ. বিজয়ের বীরনায়কদের প্রশংসা (مدح أبطال الفتوح) : সিরিয়া, ইরাক ও অন্যান্য অঞ্চল খৃষ্টানদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য আয়্যুবী শাসনামলে বীরযোদ্ধাদের প্রশংসা করে কবিতার মাধ্যমে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ইবন মানীর আত-তারাবুলুসী(হি.৪৩৭-৫৫৮/খ্রি.১০৮০-১১৫৩) এ সম্পর্কে প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন।

জ. ফরাসী খৃষ্টানদের প্রতারণার বর্ণনা (وصف الفرنجة) : ফিরিঙ্গি খৃষ্টানদের প্রতারণার বর্ণনা দিয়ে এবং সালাহউদ্দীন আয়্যূবীর শাসনের প্রশংসায় কবিগণ কবিতা রচনা করেছেন। দিমিয়াত ও আলেকজান্দ্রিয়ার সামুদ্রীক দুর্গের যুদ্ধজাহাজগুলো ফিরিঙ্গিদের কবল থেকে মুক্ত কারর পর তাঁর প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেছেন।

৭. প্রণয়কাব্য ও গীতিকবিতা (النسيب والغزل) প্রণয়কাব্যের বিবর্তন (تطور النسيب): জাহিলী যুগের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রণয়কাব্য। এ যুগের কবিরা কাসীদার প্রথমাংশেই প্রিয়ার প্রেমাভিসারের বর্ণনা ও প্রেমিকার পরিধেয় বস্ত্র, অলংকার, ব্যবহৃত সুগন্ধিবস্তু, শালীনতা ইত্যাদির বর্ণনা দিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। ইবনুল ফারিদের যুগেও সিরিয়া ও মিসরের কাব্য চর্চার এই বিষয়টির পদচারণা ছিল। কেননা কবিতা রচনা করতে গেলেই ব্যক্তির মধ্যে প্রয়োজন ছিল আবেগ, কল্পনা, চিন্তা-চেতনা, রস-রূপ। এ চারটি মৌলিক উপাদান সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে বিশেষ প্রয়োজনীয়। মিসর ও সিরিয়া ভিত্তিক 'আব্বাসী তথা আয়্যূবী সুলতানদের যুগে এ জাতীয় কবিতার পরিধি ব্যাপৃত হলেও টিলা, পরিত্যক্ত বাড়ি ঘরের বর্ণনা দিয়ে কবিতা উদ্বোধন করার পরিবর্তে প্রাসাদ, প্রেমালাপ, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদি বিষয়গুলো বেশী স্থান পেয়েছে।[৫৫]

৮. গীবত ও বিদ্বেষপোষণকারীর বর্ণনা (الواشي والكاشح) : গীবত ও বিদ্বেষপোষণকারী এই যুগের কবিতার দুটি চরিত্র যা আরবী কাব্য নাটকে স্থান পেয়েছে। এই দুই জাতীয় চরিত্রের সমালোচনা করে ইব্ন আল-কায়সারানী(হি.৪৭৮-৫৪৮/খ্রি.১০৮৫-১১৫৪) কবিতা রচনা করেছেন।[৫৬]

৯. পুরুষ জাতীয় গীতিকবিতা (الغزل المذكر): এতে আয়্যূবী যুগের কবিরা তুর্কী বালকদের নিয়ে গীতি কবিতা রচনা করেছেন। আব্বাসী যুগে আবু-নুওয়াসের ধারায় এই যুগের কবিরা ও কবিতা রচনা করেছেন। ইবন মানীর আত-তারাবুলুসী(হি.৪৩৭-৫৫৮/খি.১০৮০-১১৫২), আরকালা আদ-দীমাস্কী(হি.৪৮৬-৫৬৭/ খ্রি.১০৮৩-১১৭১), ইবন দপ্তর খাওয়ান। বালকদের মুখমন্ডলের প্রশংসা, সৌন্দর্য, কোমলতা, সাহসিকতা ইত্যাদির বর্ণনা দিয়ে প্রশংসা করেছেন। যেমন-ইবন কাসীম আল-হামাবী(হি.৫০০-৫৪২/খ্রি.১১০৫-১১৪৬), ইবনুস সা'আতী (হি.৫৫৩-৬০৪/খ্রি.১১৫৯-১২০৯), ইবন 'উনায়ন(হি.৫৪৯-৬৩০/খ্রি.১১৫৪-১৩৩২), ইবনুল কায়সারানী (হি.৪৭৮-৫৪৮/খ্রি.১০৮৫-১১৫৪), শরফুদ্দীন আল-আনসারী(হি.৫৮৬-৬৬২/খ্রি.১১৯০-১২৬৩) প্রমূখ।[৫৭]

১০. মদ্যপান ও অশীলতার কবিতা (الخمريات و المجون): আব্বাসী কবি আবু নুওয়াস-এর ন্যায় আয়্যূবী যুগেও এই বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা রচিত হয়েছে। যেমন আত-তালাফারী(হি.৫৯৩-৬৭৫/খ্রি.১১৯৭-১২৭), সিরিয়ায় এর সূচনা করেন। পারস্যের 'উমর খৈয়াম(মৃ.৫২৭/১১৩২)

বাগদাদে এবং আয়্যুবী যুগে সিরিয়ায় 'আরকালা আদ-দিমাস্কী(হি.৪৮৬-৫৬৭/খ্রি.১০৮৩-১১৭১) এর পথিকৃত ছিলেন।[৫৮]

১১.শীতকালীন সময়ে পারিবারিক পরিবেশে ভাব বিনিময়মূলক কবিতা প্রতিযোগীতা (المطارحات والشتويات) : আয়্যুবী যুগে কবি উসামা ইবন মুনকিয ও তাঁর ছেলের মধ্যে, ইবন কাসীম আল-হামাভী(হি.৫০০-৫৪২/খ্রি.১১০৫-১১৪৬) ও ইবন মানীর আত-তারাবুলুসী(হি.৪৩৭-৪৫৮/খ্রি.১০৮০-১১৫৩)-এর মধ্যে এবং শরফুদ্দিন আল-আনসারী(হি.৫৮৬-৬৬২/খ্রি.১১৯০-১২৬৩) ও তাঁর পিতার মধ্যে শীতকালীন সময়ে এই ধরনের কবিতা প্রতিযোগীতার আসর বসতো।[৫৯]

১২. অন্যান্য বিষয়বস্তু (أغراض مختلفة): আলোচ্য আয়্যুবী যুগে কবিতার বিবিধ অনেক লক্ষ্য উদ্দেশ্য ব্যাপকহারে বিকাশ লাভ করেছে, তার মধ্যে উলেখযোগ্য হলো:[৬০]

ক. বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও ধাঁধাঁ জাতীয় কবিতা (الألغاز الأحاجي): কবিদের মধ্যে আশ-শারফুল আনসারী (হি.৫৮৬-৬৬২/খ্রি. ১১৯০-১২৬৩) তাঁর পিতার সাথে এই বিষয়ের কবিতায় প্রতিযোগিতা করেছেন। ইবন 'উনায়ন এবং ইবন আস-সা'আতী এ ধরনের কবিতা রচনা করেছেন।

খ.কুৎসামূলক ব্যঙ্গ কবিতা (الهجاء): আয়্যুবী যুগের কবি ইবন মানীর আত-তারাবুলুসী(হি.৪৩৭-৫৫৮/খি.১০৮০-১১৫২) ও ইবনুল কায়সারানী(হি.৪৭৮-৫৫৮/খ্রি.১০৮০-১১৫৩) কে উমায়্যাহ যুগের জারীর ও ফারাযদাকের কুৎসামূলক ব্যঙ্গ কতিার সাথে তুলনা করা হয় । ইবন 'উনায়ন (হি.৫৪৯-৬৩০/খ্রি.১১৫৪-১৩৩২) দামিশক্-এর সর্বস্তরের জনগণের কুৎসা রটনা করে দীর্ঘ ৫০০শত শ্লোকের একটি কাসীদা রচনা করেন, যার শিরোনাম হলো 'মিকরাদুল আ'রাদ' (مقراض الأعراض) । এই কবিতায় তিনি তদানিন্তন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

গ. শোকগাঁথা (الرثا): শোকগাঁথা কবিতা রচনা আয়্যুবী যুগের রচিত কবিতার অনুসরনীয় একটি উদ্দেশ্য। তবে এই যুগের কবি উসামা ইবন মুনকিয(হি.৪৮৮-৫৮৪/খ্রি.১০৯৫-১১৮৮) তাঁর পরিবারের উপর বিপদ আপদ আপতিত হওয়ার কারণে এবং খৃষ্টানদের হাতে ক্রুসেড যুদ্ধে আয়্যুবীদের সিরিয়া, হিমস ও হামাত শহরের পতন ঘটার শোক করে কবিতা রচনা করেছেন।

১৩. আয়্যুবী যুগে নতুন কাব্য কলার উদ্ভাবন (الفنون الشعرية المستحدثة) : আয়্যুবী যুগে সাহিত্যিক জীবনের গতিধারায় বড় ধরনের উন্নতি সাধিত হয়। বিশুদ্ধ আরবী কাব্য রচনার মূল ধারায় এই যুগের কবিগণ কাব্যের ক্ষেত্রে প্রচীনদের অনুসরনের ধারা অব্যাহত রাখেন। পাশাপাশি মুসলিম সম্রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমে এই ধারাটির বিকাশ সমভাবে বিরাজ করে। এতদসত্ত্বেও এই যুগের কবিগণ বেশ কিছু নতুন কাব্যকলা কবিতার ক্ষেত্রে সংজোযন করেন। এই নতুন উদ্ভাবিত কাব্য কলাগুলোর মধ্যে মুওয়াশশাহাত ও যাজাল বিশেষ করে স্পেনের আবিষ্কার হলেও তা মিসর ও সিরিয়াতে বিকশিত

হয়। আর আল-মুওয়ালিয়াত ও দুবায়তাত বাগদাদের আবিষ্কার হলেও সিরিয়া ও মিসরে তা বিকশিত হয়। মুসামমাতাত ও মুখাম্মাসাত ৪র্থ হিজরীর শেষের দিকে এবং ৫ম হিজরীর প্রথম দিকে আব্বসী যুগে বাগদাদে আত্মপ্রকাশ করলেও সিরিয়া ও মিসর অঞ্চলে আয়্যূবী যুগে এসে তা বিকশিত হয়। এদের শ্রেণীবিন্যাস নিম্নলিখিতভাবে করা যেতে পারে:[৬১]

ক. প্রাচ্য দেশীয় মুওয়াশশাহাত (الموشحات المشرقية), যেমন-সূফী মুওয়াশ্শাহাত (الموشحات الصوفية) এর আত্মপ্রকাশ; ইবনুল 'আরাবীর মুওয়াশ্শাহাত (موشحات ابن عربي); সিরিয়া অঞ্চলের মুওয়াশ্শাহাত (الموشحات في بلاد الشام); আস-সাররাজ আল-মাহ্হার এর মুওয়া্শাহাত (موشحات السراج المحار); গীতিকাব্যের মুওয়াশশাহাত (الموشحات الغزلية); স্তুতি মুওয়াশ্শাহাত (الموشحات المدحية)।

খ. পালানুক্রমিক দুপদী ও চৌপদী(الرباعيات أو الدوبيتات) কবিতা যার প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে ছন্দ বা অন্তমিল একই থাকবে। এটি একটি নতুন কাব্যকলা যা প্রাচ্যের আরবরা অবগত ছিল এবং আয়্যূবী যুগে মিসর ও সিরিয়া অঞ্চলে এর প্রসার ঘটে। এটি পূর্বে পারস্য দেশে পালানুক্রমিক দুপদী বা الدوبيتات নামে পরিচিত ছিল। এর প্রসিদ্ধ ওজনগুলো হলো - فعولن فعلن متفاعلن متفاعلن

আয়্যূবী যুগের কবি আশ-শিহাব আশ-শাগুরী(হি.৫৩৩-৬১৫/খ্রি.১১৩৯-১২১৮)-এর কবিতা:[৬২]

الـوردُ بـوجـنـتـيـك زاهٍ زاهـرْ   والـسحـرُ بـمقـلـتـيـكَ وافٍ وافـرْ
والـعــاشقُ في هـواكَ سـاهٍ سـاهـرْ   يـرجـو ويـخـافُ، فـهـو شاكٍ شـاكـرْ

"তোমার দু'গণ্ডদেশের মাঝে গোলাপ উজ্জ্বল আলোকময় এবং তোমার দু'চোখের মাঝে ঊষালোক যথেষ্টপরিপূর্ণ; তোমার প্রেমের প্রেমিক আশায় ও ভয়ে অসতর্ক বিনীদ্র এবং অভিযোগকারী ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী"।

গ. প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষায় জনপ্রিয় লোককবিতা (المواليات الشعبية), আয়্যূবী যুগে বিশুদ্ধ আরবী কবিতার পাশাপাশি জনপ্রিয় লোক কবিতা আত্মপ্রকাশ করে। এই কবিতায় কাব্যরীতি, বিশুদ্ধ ভাষা, ছন্দরীতি ও মাত্রার প্রয়োজনীয়তা থাকেনা। পক্ষান্তরে এর জন্য একটি বিশেষ ছন্দমাত্রা ব্যবহার করা হয়। এই লোকগীতি হি.৬ষ্ঠ /খ্রি.১২ শতকে বাগদাদে প্রচলিত ছিল। পরে স্পেনসহ মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন রূপে ও আঙ্গিকে রচিত হতো, যেমন্ الزجل، الكان كان، المواليات، القوما. । এতে সবসময় পূর্ণ হরকত প্রদানের কোন বালাই থাকেনা। বরং শেষ অক্ষরে ছাকিন দেয়া হয়ে থাকে। এই কবিতার শেষে অন্তমিল থাকার প্রয়োজন নেই। এর বিষয়বস্তু হলো সাধারণত-প্রণয়, প্রশংসা, শোকগাথা, বিলাপ ইত্যাদি। গায়ক কবি এ কবিতার প্রতি পালার পরে ইয়া

মাওয়ালিয়া (يا موالیا) বলেন বিধায় একে الموالیات বলে। এর চারটি বা ততোধিক অন্তমিলযুক্ত প্রান্ত থাকবে। এই কবিতার মাত্রা ফারসী ভাষা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এর রয়েছে দুই লাইন আরবী কবিতা। এই দুই লাইনের قصيدة ধর্মী কবিতাটির القافية ও وزن এক হবে। দুটি বায়ত মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা হবে।[৬৩]

ঘ. পঞ্চপদী কবিতা ও গোত্রীয় লোকগীতি (المسمطات و المخمسات), চতুর্থ হিজরী এবং পঞ্চম হিজরীর মধ্যে-এর বিকাশ ঘটে। আয়্যূবী সুলতান আল-মালিক আল-'আযীয 'উছমানের প্রশংসায় কবি ইবনুস সা'আতী(হি.৫৫৩-৬০৪/খ্রি.১১৫৯-১২০৯) পঞ্চপদীকবিতা রচনা করেন, আর, উসামা ইবন মুনকিয (হি.৪৮৮-৫৮৪/খ্রি.১০৯৫-১১৮৮) গোত্রীয় লোকগীতি রচনা করেন।[৬৪]

মিসর ও সিরিয়ায় আয়্যূবী রাজবংশের সুলতানদের শাসনামলে রচিত আরবী কবিতার বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, গঠনপ্রকৃতির স্বরূপ বা বাস্তবরূপ এবং উলেখযোগ্য কয়েকজন কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁদের কবিতার গঠনপ্রকৃতি ও বিষয়বস্তুর স্বরূপ নিম্নে তুলে ধরা হলো:[৬৫]

বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে কবি আবুল 'আতাহিয়্যা যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আবহমান কাল ধরে বয়ে আসা প্রাচীন সাহিত্যের বিষয় সমূহ বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে নতুন বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। এক পর্যায়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে কম রস পূর্ণ যুহদ কবিতা দিয়েই তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর বিরল প্রতিভা, নিরলস সাধনা ও অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি প্রধান নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। ধর্মতাত্ত্বিক এসব কবিতার মাধ্যমে তিনি জাতিকে বার্তা পাঠিয়েছেন – শুদ্ধতা, সততা, তাকওয়াহ, সৎকর্মই গৌরবের বিষয়; বংশ গরিমা, আভিজাত্য, উচ্চ পদস্থ কর্মজীবন শ্রেষ্ঠত্বের কোন বিষয় নয়। দুনিয়াই শেষ ঠিকানা নয়; অনিবার্য মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আখিরাতে পদার্পন করতে হবে। আর জবাবদিহিতার কঠিনতম স্থান এই আখিরাত। সেখানে যে ব্যক্তি মুক্তি অর্জন করবে সেই সফল। এই সফলতার স্বাদ সে অনিঃশেষ কাল ধরে ভোগ করতে থাকবে। আর এ জন্য প্রয়োজন অল্পে তুষ্টি, সৎ জীবন-যাপন. ধৈর্য ও সহনশীলতা, তাওবা ও ইস্তিগফার সর্বোপরি মহান স্রষ্টার নির্দেশ ও মহানবী (স.)-এর পদাংক অনুসরণ। এ ভাবেই তাঁর কবিতা মরমীবাদের পথিকৃৎ হয়ে উঠে। তাঁর কবিতায় যে সব বিষয় উঠে এসেছে তা নিম্নরূপ:[৬৬]

আরবী পদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে আবুল 'আতাহিয়্যা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি তাঁর অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার মাধ্যমে আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। বংশীয় কৌলিন্যও তারঁ ছিলনা। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার্জন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে তিনি জীবন ও জগৎ থেকে ব্যাপক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। দারিদ্রের কাছে তিনি হার মানেননি। তাঁর ছিল অনন্য সাধারণ কাব্যপ্রতিভা। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। অফুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্য ও

নিরলস সাধনার মাধ্যমে তিনি তাঁর কাব্যপ্রতিভার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হন। বহু ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে স্বীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। সমকালীন রাজন্যবর্গের সাথে তার সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। তখন ছিল আব্বাসী খিলাফতের যুগ। খলীফা মাহদী ও হারুনুর রশীদ তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি হয়ে উঠেন দরবারী কবি। খলীফাদের সুদৃষ্টি তাঁকে বিশাল সম্পদের অধিকারী করলেও তিনি জাগতিক ভোগ বিলাসে গা ভাসিয়ে দেননি। জীবন ও জগতে ছড়িয়ে থাকা অসঙ্গতি ও অভিজাত শ্রেণির ভোগবাদী চরিত্র তাঁকে দুনিয়া বিমুখ করে তুলে। তিনি নির্মাণ করতে থাকেন অসাধারণ সব যুহদ বা তাপস কবিতা। এক সময় তিনি হয়ে উঠেন যুহদ কবিতার প্রতীক। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে কবি আবুল আতাহিয়্যার সংক্ষিপ্ত জীবন ও তাঁর যুহদ কবিতার একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।[৬৭]

কবি আবুল 'আতাহিয়্যার প্রকৃত নাম ইসমা'ঈল, উপনাম বা কুনিয়াত আবু ইসহাক। আবুল আতাহিয়্যা তাঁর উপাধী। এ নামেই তিনি কাব্য জগতে অমর হয়ে আছেন। কবির পিতার নাম কাসিম। তাঁর উর্ধ্বক্রম বংশধারা হলো, আবু ইসহাক ইসমাঈল ইব্নুল কাসিম ইব্ন সুয়াইদ ইব্ন কায়সান আল আনাযী। কবির মাতার নাম উম্মু যায়িদ বিনতু যিয়াদ আল-মুহারিবী। কবির পরিবার 'আনাযা'গোত্রের মিত্র বা মাওয়ালী ছিল। ফলে তাকে আনাযী বলা হতো। উল্লেখ্য, তাঁর মাতার বংশ ছিল বনু যুহরের মিত্র বা মাওয়ালী। কবির বংশীয় পেশা ছিল নিম্ন মানের। তাঁর পিতা হাজ্জাম (রক্তমোক্ষক) ছিলেন অর্থাৎ তিনি শিঙ্গা লাগাতেন। বংশীয় পেশা নিম্ন শ্রেণির হওয়ায় তিনি সামাজিকভাবে উপেক্ষার পাত্র হয়েছিলেন যা তাঁর জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এক পর্যায়ে তিনি দুনিয়া ত্যাগি হয়ে মরমী কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। কবি আবুল আতাহিয়্যা ১৩০/৭৪৮ সালে কুফার 'আয়নুত তামার' নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন এবং এখানেই তিনি বেড়ে উঠেন। কবি নিচু বংশে জন্মে ছিলেন –এজন্য তাঁকে বহু মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল। একবার কেউ তাঁকে নিম্ন বংশের খোঁটা দিলে কবি এর জবাব দিয়েছিলেন নিম্নোক্ত পঙক্তির মাধ্যমে:[৬৮]

الا أنما التقوي هو العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والعدم
وليس علي عبد تقي نقيصة اذا صحح التقوي، وان حاك او حجم

"সাধুতাই প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মান, সংসারের প্রতি তোমার লোভ-লালসা কেবল দারিদ্র্য ও অভাব সৃষ্টি করে থাকে; প্রকৃত ধার্মিক ও সাধু ব্যক্তি জোলা বা রক্তমোক্ষক হলেও কোন দোষ তাকে স্পর্শ করতে পারে না।"

কবি অন্যত্র বলেছেন: [৬৯]

واذا تناسبتِ الرجالُ، فما اري نسباً يُقاس بصالحِ الأعمالِ

وإذا بحثتُ عن التقي وجدتُهُ رجلاً، يُصدقُ قولـه بفعالِ

"মানুষ বংশ মর্যাদার গৌরব করে; কিন্তু আমি দেখি, বংশ মর্যাদার গৌরব কখনো সৎকর্মের সাথে তুলনীয় হতে পারে না; আর, যখন আমি আল্লাহভিরু লোকের অনুসন্ধান চালাই তখন আমি এমন একজন লোকের সন্ধান পাই যার কথা ও কাজের মধ্যে মিল রয়েছে।"

বাগদাদের যুহ্দ কবি আবুল 'আতাহিয়্যা সাধারণ একজন কুম্বকার থেকে ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠেন। এজন্য তাঁকে দীর্ঘ বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। কবিত্ব শক্তির নিয়মিত পরিচর্যা ও কঠোর সাধনা তাঁকে সমকালীন সাহিত্যাঙ্গনে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে তিনি কঠিন বাস্তবতার মখোমুখি হয়েছেন। তিনি খুব কাছ থেকে ক্ষমতাসীন মানুষের ভোগ বিলাস ও অনাচার অবলোকন করে বিস্মিত ও হতভম্ব হয়েছেন সেই সাথে দুনিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এর আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন। ফলে প্রাসাদের কবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি কালক্রমে হয়ে উঠেন দুনিয়াবিমুখ কবি। তাঁর কবিতার পঙক্তিতে ঝরে পরেছে চিরস্থায়ী আখিরাতের পুঁজি গ্রহণের আকুলতা সেই সাথে দুনিয়ার প্রতি অবজ্ঞা। আব্বাসী যুগে যুহদ কবিতায় তিনি ছিলেন অন্যতম পতাকাবাহী। তবে, প্রাচীনকাল থেকে মহান আল্লাহ বা প্রভুকে জানা ও বুঝার জন্য প্রেম বা ভালবাসাকে বাহন হিসাবে বিবেচনা করা হতো।[৭০]

অপর দিকে সিরিয়া ও মিসরের আরব কবি ইবনুল ফারিদ ছিলেন একজন আল্লাহপ্রেমিক সূফীকবি বা মরমিকবি। হুব্বুল ইলাহী বা আল্লাহপ্রেমই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান অনুসঙ্গ। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এ প্রেমই তাঁকে তাঁর লক্ষ্যপথে তাড়িত করেছে। তাঁকে বলা হয় সুলতানুল আশিকীন বা প্রেমিকদের কবিসম্রাট। তিনি একাধারে আলিম, ধর্মতত্ত্ববিদ, ফিকহশাস্ত্রবিদ, ফকীহ, সূফীসাধক, সূফীকবি, সূফীতাত্ত্বিক, আরব মরমিকবি ও আশিকে ইলাহী। যুহুদ বা দুনিয়াবিমুখতা ছিল তাঁর কাব্যের প্রধান উপজিব্য এবং চিরন্তনবাস্তবতা। দিনে সিয়ামসাধনা এবং রাতজেগে সালাত আদায় করা ছিল তাঁর নিত্য নৈমত্তিক ইবাদত। তিনি দিনের পর দিন পাহাড়-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে, উষ্ণ মরুপ্রান্তরে দীনহীন ফকীরের ন্যায় মহান আল্লাহর অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আল্লাহপ্রেম তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও একই স্থানে স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। তিনি তাঁর প্রভুর ভালোবাসায় ঘর ছেড়েছেন, আবার তাঁরই ভালোবাসায় ঘরে ফিরেছেন। তাঁর যুগে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ যুহুদকবি, সূফীসাধক ও সূফীকবি। ইবনুল ফারিদ সর্বেশ্বরবাদী(وحدة الوجود) তথা 'আল্লাহ সব কিছুতেই আছেন এবং সব কিছুই আল্লাহ' এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেননা; বরং তাঁর মতের একান্তঝুঁক ছিল

ঐক্যসংযুক্তির ইত্তিহাদ(وحدة الشهود) তত্ত্বের প্রতি যা তাঁর সূফীকাব্যদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে পরিগণিত। কবি ইনুল ফারিদ তাঁর শিক্ষক মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ সূফীতত্ত্ব দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হননি। তিনি কখনো তাঁর সাক্ষাৎ লাভেও ধন্য হননি। থোমাস এমিল হোমারিনের মতে, তখন মিসরে শুধু ইবনুল ফারিদই(১১৮১-১২৩৫খৃ.) সাড়ে সাতশত বছরের সূফী কবির ভাগ্যাকাশ অলংকৃত করতে পেরেছেন। নোবেল বিজয়ী নাজীব মাহফুজসহ সমকালীন মিসরের অনেক কবি-সাহিত্যিক তাঁদের রচনায় এই সূফীকবির কবিতা তাঁদের লেখনির যথাযথাস্থানে উদ্ধৃত করেছেন।[৭১]

পাদটীকা ও তথ্য-নির্দেশিকা

১ ড. মুহাম্মদ যাগলুল সাল্লাম, আল-আদব ফিল 'আসরিল আয়্যুবী(কারো:মানশা'আত আলমা'অরিফ, ১৯৬৭খ্রি.), ১৫-৩৫; ড.হাসান ইব্রাহীম হাসান, তারিখুল ইসলাম(বৈরূত: দারুল জীল, ১৪১১/১৯৯১), খ.৪, পৃ. ১০১-১০; মাওলানা আকবর শাহ খান নজীবাবাদী, ইসলামের ইতিহাস(অনুদিত), (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ২০০৩খ্রি.), খ.২, পৃ. ৫৭২-৫; ড. শুকরী ফায়সাল, আবুল 'আতাহিয়্যা আশ'আরুহু ওয়া আখবারুহু (দামিশক : মাতবা'আ জামি'আ, ১৩৮৪/১৯৬৫), পৃ.২৩-৩১।

২ ড. মুজতাবা রহমান দে;াস্ত, "আবুল 'আতাহিয়্যা, হায়াতুহু ওয়া শি'রুহু", মাজাল্লাতুল লুগাতিল 'আরাবিয়্যা ওয় আদাবিহা, তিহরান, ১৪২৬/২০০৫, ১ম. বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ.৪৯-৬৪।

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৬৪।

৪ ড. 'উমার মূসা পাশা, আল-আদব ফী বিলাদিশ শাম (দামিশক: আল-মাকতাতুল 'আব্বাসিয়্যা, ১৩৯১/১৯৭২), পৃ.৩৫৬-৭১।

৫ আবুল ফরাজ আল-ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী (কায়রো :মাতবা'আতু দারিল কুতুবিল মিসরিয়্যা, ১৩৬৯/১৯৫০), খ.৪, পৃ. ১-১১২।

৬ CI. Cahen, "আয়্যুবিয়্যা", ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০৫ খ্রি., খ. ২, পৃ. ৬৩৩-৪৭।

৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৩-৪৭।

৮ ড. মুহাম্মদ 'উমার মূসা পাশা, আল-আদব ফী বিলাদিশ শাম (দামিশক: আল-মাকতাতুল 'আব্বাসিয়্যা, ১৩৯১/১৯৭২),২৬৪-৯০; ইবনুস সা'আতী, দীওয়ান (বৈরূত : আল-মাতবা"আতুল আমীরকানিয়্যা, ১৯৩৮ খ্রি.), খ.১, পৃ.২৯২-৪।

৯ ইবনুস সা'আতী, দীওয়ান (বৈরূত : আল-মাতবা"আতুল আমীরকানিয়্যা, ১৯৩৮ খ্রি.), খ.২, পৃ.৪০৬-৮।

১০ ড. মুহাম্মদ জগলুল সাল্লাম, আল-আদব ফীল 'আসরিল আয়্যূবী, পৃ.৪২৩-৪৭।

১১ ড. আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারিখুল আদাবিল 'আরাবী (কায়রো: দারু নাহদা মিসর, তা বি), পৃ. ৩৫১-৫২

১২ ড. মুহাম্মদ জগলুল সাল্লাম, আল-আদব ফীল 'অসরিল আয়্যূবী, পৃ.৪০৪-৭।

১৩ ইবন সানা' আল-মুলক, দীওয়ান (কায়রো :আল-মাকতাবাতুল 'আরাবিয়্যা, ১৩৮৭/১৯৬৭), খ.২, পৃ. ১৭২-৫।

১৪ ড. মুহাম্মদ জগলুল সাল্লাম, আল-আদব ফীল 'অসরিল আয়্যূবী, পৃ.৪১৫--২২।

১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২২।

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২০।

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৭-২৮; 'আবদুল ফাত্তাহ শালবী, আল-বাহা যুহায়র (কায়রো : দারুল মা"আরিফ, ১৯৮০ খ্রি.), নাওয়াবিগুল 'আরাবী সিরিজ, ২৮, পৃ. ৫-১২৪; আহমাদ হাসান অয-যায়্যাত, তারিখুল আদাবিল 'আরাবী, পৃ.৩৫৬-৭।

১৮ ড. মুহাম্মদ জগলুল সাল্লাম, আল-আদব ফীল 'অসরিল আয়্যূবী, পৃ.৫১৭-১৮।

১৯ CI. Cahen, "আয়্যূবিয়্যা", ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, পৃ. ৬৩৩-৪৭; ড. আবদুল লতীফ হামযা, আল-আদবুল মিসরী (কায়রো :আল-হায়্যাতুল মিসরিয়্যা,২০০০খ্রি.), পৃ. ৪৮-৫১; ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী (কায়রো :দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৫খ্রি.), পৃ.৩৭-৪০।

২০ ড. মুহাম্মদ 'উমার মূসা পাশা, আল-আদব ফী বিলাদিশ শাম, পৃ.৪৮৩-৬২০।

২১ ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ. ৩৭-৪০।

২২ প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩-৫।

২৩ CI. Cahen, "আয়্যূবিয়্যা", ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.২, পৃ. ৬৩৩-৪৭; ড. মুহাম্মদ জগলুল সাল্লাম, আল-আদব ফীল 'অসরিল আয়্যূবী, পৃ.৪১৫-২২; ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ. ৩৭-৪৮।

২৪ CI. Cahen, "আয়্যূবিয়্যা", ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.২, পৃ. ৬৩৩-৪৭; ড. আবদুল লতীফ হামযা, আল-আদবুল মিসরী মিন কিয়ামিদ দাওলাতিল আয়্যূবীয়্যা ইলা মজিয়িল হামলাতিল ফ্রান্সিয়া, পৃ. ৪৮-৫১।

২৫ প্রাগুক্ত, খ. পৃ, ৬৩৩-৪৭।

২৬ প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৩৩-৪৭।

২৭ ড. মুহাম্মদ 'উমার মূসা পাশা, আল-আদব ফী বিলাদিশ শাম, পৃ.৪৮৩-৬২০।

২৮ ড. এ এম 'অবদুছ ছালাম, আরবী সাহিত্য প্রতিভা (রাজশাহী: ছালেহা প্রকাশনী, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ২০০-১২; জুরজী যায়দান, তারিখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যা (বৈরূত :দারুল জীল, ১৪০২/১৯৮২), খ.১, পৃ. ৭৬-৮০।

২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০-১২; খ.১, পৃ.৭৬-৮১।

৩০ R. A. Nicholson, A Literary History of the Arabs (Cambridge: University Press, ১৯৫৬ অ উ), ঢ়.৭৯.

৩১ ড. মুহাম্মদ 'উমার মূসা পাশা, আল-আদব ফী বিলাদিশ শাম, পৃ.৪০৮-১০; ড. এস এম আবদুছ ছালাম, পৃ.২০০-১২।

৩২ ড. এস এম আবদুছ ছালাম, পৃ. ২০০-১২।

৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০-১২।

৩৪ জুরজী যায়দান, তারিখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যা, খ.১, পৃ. ৭৬-৮০।

৩৫ প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৭৬-৮০।

৩৬ ড. এস এম আবদুছ ছালাম, পৃ. ২০০-১২।

৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০-১২।

৩৮ ড. মুহাম্মদ 'উমার মূসা পাশা, আল-আদব ফী বিলাদিশ শাম, পৃ.৪০৮-১০।

৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭-৫০।

৪০ ড. এস এম আবদুছ ছালাম, পৃ. ২০০-১২।

৪১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০-১২।

৪২ জুরজী যায়দান, তারিখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যা, খ.১, পৃ. ৭৬-৮০।

৪৩ প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৭৬-৮০।

৪৪ প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৭৬-৮০।

৪৫ মুস্তফা সাদিক আর-রাফি'ঈ, তারিখু আদাবিল 'আরাব (বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৩৯৪/১৯৭৪), খ. ৩, ৭৯-১৫৬।

৪৬ প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৭৯-১৫৭।

৪৭ প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৭৯-১৫৭।

৪৮ ইবনুস সা'আতী, দীওয়ান, খ.২, পৃ. ২৮৯-৯০; ড. মুহাম্মদ 'উমার মূসা পাশা, আল-আদব ফী বিলাদিশ শাম, পৃ.৪৭১-৭৪।

৪৯ ইবনুস সা'আতী, দীওয়ান, খ.১, পৃ. ৪৮০; ড. মুহাম্মদ 'উমার মূসা পাশা, আল-আদব ফী বিলাদিশ শাম, পৃ. ৪৬৬।

৫০ ড. উমর মূসা পাশা, আল-আদব ফী বিলাদিশ শাম, পৃ. ৬৫৮-৭০৭।

৫১ ইবন 'উনায়ন, দীওয়ান, সম্পাদনায় খলীল মুরদামবেক (দামিশক : মাজমা'অ 'ইলমী 'আরাবী, ১৩৬৫/১৯৪৬), পৃ. ৮৫-২৩৮।

৫২ ড. মুহাম্মদ যগলুল সাল্লাম, আল-অদাব ফীল 'আসরিল আয়্যুবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৪-১৫।

৫৩ ড. উমর মূসা পাশা, আল-আদব ফী বিলাদিশ শাম, পৃ. ৪৭৪-৭৫।

৫৪ প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭৬-৮০।

৫৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮০-৮৮।

৫৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৮-৯২।

৫৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯২-৯৫।

৫৮ প্রাগুক্ত, ৪৯৫-৫২২।

৫৯ প্রাগুক্ত, পৃ.৫২২-৩১।

৬০ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪৭-৭৬।

৬১ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭৬-৭৯।

৬২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৯-৮৩।

৬৩ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭৯-৮৩।

৬৪ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮৩-৯২।

৬৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৩-৯৮।

৬৬ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৭-৯৮।

৬৭ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৯।

৬৮ আবুল 'আতাহিয়্যা, দীওয়ান, পৃ. ৩৯৪।

৬৯ আবুল 'আতাহিয়্যা, দীওয়ান, পৃ. ৩২৫-৬।

৭০ আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী, পৃ. ১-১১২।

৭১ ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ.১৩৯-২১৬।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আরবী যুহ্‌দ ও সূফী কবিতার উৎপত্তি ও বিকাশ

যুহ্‌দ কবিতার উৎপত্তি ও বিকাশ

'আরবী আয-যুহ্‌দ الزهد শব্দটি এক বচন। বহুবচনে আয-যুহ্‌দিয়াত الزهديات আর মূল অক্ষর বা মাদ্দা হলো-ز+ه+د। এর جنس হচ্ছে صحيح। الزهد শব্দটি زاء বর্ণে ضمة বা পেশ আর هاء বর্ণে سكون বা জযম দ্বারা পঠিত। এটি زهد ক্রিয়ার مصدر বা ক্রিয়ামূল। শব্দটির باب হচ্ছে -فتح يفتح। এর আভিধানিক অর্থ হলো, কোন আকর্ষণীয় বস্তু হতে লোভজনিত মুখন্ডল ফিরানো; ধর্মের পথে উৎসর্গকৃত। যেমন বলা হয়ে থাকে, زهد في الشيئ وعنه সে বস্তুটি থেকে নিরাসক্ত হলো, ত্যাগ করলো, ছেড়ে দিল। আর যখন বলা হয় زهد في الدنيا - সে ইবাদতের জন্য দুনিয়ার ঝামেলা থেকে মুক্ত হলো। শব্দটি বাবে كرم থেকে আসলে এর অর্থ হয়, অস্বীকার করেছে, স্বত্ব ত্যাগ করেছে, বর্জন করেছে। কারো কারো মতে, زهد শব্দটি فتح এবং كرم বাব থেকে আসতে পারে। অর্থ হচ্ছে, তপশ্চর্যা, তপস্যা, সন্ন্যাস, সংসার ত্যাগ। الزهد মাসদারটি তিনটি باب যথাক্রমে -سمع فتح- كرم থেকে আসে। الزهد এবং الزهادة উভয়টিই মাসদার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। الزهادة এর অর্থ হলো الاعراض عن الشسئ احتقارا له কোন বস্তুকে তুচ্ছজ্ঞান করে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা। যেমন বলা হয় زهد في الدنيا "তিনি দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজেকে মহান আল্লাহর 'ইবাদাতে লিপ্ত রেখেছে"। الزهد এর কর্তৃবাচ্য হলো زاهد। এটি একবচন, বহুবচন হলো, زهاد, زاهدون এর অর্থ হলো, পরকালের মহব্বতে দুনিয়া বিমুখ ও সংকীর্ণ জীবন যাপনকারী। কর্তৃবাচ্য হিসেবে الزهيد ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তখন এর অর্থ হবে, কর্ম, নিকৃষ্ট। زاهد -এর স্ত্রীলিঙ্গ হচ্ছে زاهدة আর زهيد এর স্ত্রীলিঙ্গ হচ্ছে زهيدة। زهيدة এর বহু বচন زهدان। বলা হয়, هو زهيد الخلق– সে নিকৃষ্ট স্বভাবের। আরো বলা হয়ে থাকে هو زهيد العين" সে স্বল্পে তুষ্ট"। [১]

দার্শনিক ও গবেষকগণ যুহ্‌দ زهد শব্দটির পারিভাষিক পরিচয় তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে ভাষার ভিন্নতা থাকলেও ভাবার্থ একই। খ্যাতিমান দার্শনিক ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন:[২]

إنما الزهد أن تترك الدنيا لعلمك بحقارتها بالإضافة إلى نفاسة الآخرة

"যুহদ হলো আখিরাতের উৎকৃষ্টতার তুলনায় দুনিয়াকে নিকৃষ্ট জেনে তা বর্জন করা।"

মুফতি ‘আমীমুল ইহসান যুহ্দ সম্পর্কে বলেন:[৩]

الزهد الإصلاح في أهل الحقيقة هو الإعراض عن الدنيا

“সুফীদের পরিভাষায় যুহ্দ হচ্ছে দুনিয়া থেকে বিমুখ থাকা।”

জামাল উদ্দিন মুহাম্মদ বলখী বলেন:[৪]

الفقر فقد ما يحتاج إليه فإن فرح و كره الزائد علي الضرورة فهو زاهد

“দারিদ্র্য হলো প্রয়োজনীয় বস্তু না পাওয়া (হারানো), যদি প্রয়োজনীয় বস্তু না পেয়েও খুশি থাকে এবং বেশি বা প্রয়োজনাতিরিক্ত পাওয়াকে অপছন্দ করে তাহলে সে হলো যাহিদ।”

দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্যের প্রতি বিরাগভাব এবং তার প্রতি অনাসক্তিমূলক কবিতাই زهديات বা দুনিয়া বিমুখতার কবিতা। আর, যুহ্দ হচ্ছে পার্থিব দুনিয়ার আকর্ষণ ত্যাগ করে পরকালীন কল্যাণ ও মুক্তির আশায় জীবন ও সম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ঐকান্তিকভাবে মহান স্রষ্টা আল্লাহর নিকট নিজেকে সমর্পণ করা, জীবন ও জগতের যাবতীয় মোহ থেকে নিজেকে গুটিয়ে একমাত্র মহান স্রষ্টার উপাসনায় লিপ্ত থাকা।[৫]

যুহ্দের অনেকগুলো ধাপের একটি পরিপূর্ণ ধাপ হলো তাসাওফ বা ইসলামী আধ্যাত্মিকতা(Islamic Mysticism) নামে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। আর, তাসাওফ শব্দটি সাধারণত যুহ্দের তুলনায় একটি বিশেষ স্তর। এবিশেষ স্তরের ব্যাখ্যা দিয়ে Dr.Che Zarrina Sa'ari তাঁর লিখিত, “An Analytical Study of Rise and Development of Sufism: From Islamic Asceticism to Islamic Mysticism” শিরোনামের প্রবন্ধে বলেন:[৬]

"Commonly, "asceticism" is used to translate 'zuhd" and "Islamic mysticism" or "sufism" to translate "tasawwuf. Although "asceticism" is commonly used to denote a program of self-discipline and austerity, and is always regarded as one of the practice of Sufism".

আলোচ্য প্রতিবেদনটিতে উল্লেখিত যুহ্দের ব্যাখ্যায় লেখক আরো বলেন:[৭]

The writer would like to make used this word "Zuhd" in contrast to the word Islamic "mysticism" or "sufism" in order to show the differences between the classical sufism in the middle ninth century a.d. and before and and contemporary sufism in the late ninth century a.d.. And the writer uses "asceticism" rather than "zuhd" for the sake of precision.

ইসলামের আগমনের পর আল-কুর'আনের অনুপম ভাষাশৈলী–এর শব্দ চয়ন, অলঙ্কার, উপমা, উৎপ্রেক্ষা সাহিত্য সমঝদার আরব জাতিকে বিস্মিত ও হতবাক করে দেয়। গোটা আরব জাতির মধ্যে ইনকিলাব সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি হয় নয়া সমাজ ব্যবস্থা– কুরআনের সমাজ ব্যবস্থা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর হিসেবে আল-কুর'আনের উজ্জ্বল আলোকরশ্মি আরব জাতিকে নতুন রঙে রাঙিয়ে দেয়। প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা পর্যন্ত পবিত্র কুরআন এক আকর গ্রন্থ হিসেবে পরিণত হয়। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়। নতুন কিছু বিষয়ে কবিতা রচনা হতে থাকে। এসব বিষয়কে মোটা দাগে 'ইসলামী ভাব ধারার' কবিতা বললে অত্যুক্তি হবে না। ইসলামী ভাবধারার কবিতার মধ্যে অন্যতম সংযোজন হচ্ছে যুহ্দ কবিতা। যুহ্দ কবিতার ভাব ও ভাষা ইসলামী ভাবধারায় পুষ্ট। এ জাতীয় কবিতা 'আব্বাসী যুগে চরম উৎকর্ষতা লাভ করে।[৮]

উমাইয়া যুগে খুব সামান্য পরিমাণে এর চর্চা লক্ষ্য করা যায়। তবে এর উৎপত্তি বিষয়ে তেমন কোন তথ্য জানা যায় না। জাহিলী যুগে প্রত্যক্ষরূপে যুহদিয়াত কবিতা রচিত না হলেও এর আভাষ পাওয়া যায়। জাহিলী কবিগণ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস নিয়ে মত্ত থাকলেও এদের কেউ কেউ আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন। আখিরাতের ভয়-ভীতি তাদের কবিতায় ফুটে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে ইয়াহুদী কবি আস সাজওয়াল ইবন আদিয়ার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। জাহিলী যুগের খ্যাতিমান কবি যুহায়র বিন আবী সুলমার কবিতায় যুহদিয়াত-এর আভাষ পাওয়া যায়। জাহিলী কবিগণ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস নিয়ে মত্ত থাকলেও তাঁদের কারো কারো মনের প্রবণতা আখিরাতের বিশ্বাসের প্রতি তথা দীনে হানীফের প্রতি একান্ত ঝুঁক ছিলো। আখিরাতের ভয়-ভীতি তাঁদের কবিতায় ফুটে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে ইয়াহুদী কবি আস-সামওয়াল ইবন 'আদিয়ার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে, জাহিলী যুগের খ্যাতিমান মু'আল্লাকার কবি যুহায়র ইবন আবী সুলমার কবিতায় যুহদিয়াত-এর আভাষ পাওয়া যায়। তিনি মুআল্লাকার কবিদের প্রথম তিন জনের একজন। তাঁর কবিতায় মানবীয় গুণাবলী ও গভীর দার্শনিক চিন্তাধারা লক্ষ্যণীয়। তাঁর কাব্যে সুনির্মল একত্ববাদ, ঈমান, পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি ধর্মীয় বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। আর এজন্য কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাঁকে খ্রিস্টান বলে ধারণা করেছেন।[৯]

কবি যুহায়র বিন আবী সুলমা বলেন:[১০]

يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم

وماالحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم

" তোমাদের অন্তরে যা আছে তা গোপন থাকবে ভেবে তোমরা আল্লাহর নিকট হতে কোন কিছু লুকিয়ে রেখোনা; কারণ যখন আল্লাহর নিকট থেকে কোন কিছু গোপন রাখা হয় তিনি তা অবগত

হন। (তোমরা যা কিছু কর) তা বিলম্বিত হয়ে একটি খাতায় লিপিবদ্ধ অবস্থায় বিচারের দিনের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত থাকে; অথবা অবিলম্বেই(তোমাদের) কোন কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করা হয়।"

আল-কুর'অন নিয়ে ইসলামের আবির্ভাবের পর আরব জাতির সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। কাব্য সাহিত্যেও এই নতুন আন্দোলনের ঢেউ লাগে। সাহিত্যের বিষয়বস্তুতেও নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায়। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা হতে থাকে। একটু দেরীতে হলেও যুহ্দ কবিতাও এ যুগে সংযোজিত হয়। এ যুগকে যুহদিয়াত কবিতার প্রস্তুতির যুগ বলা যায়। এ সময় সীমিত আকারে বিভিন্ন কবির কবিতায় যুহদিয়াত লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠে। খোলাফায়ে রাশেদীনের কারো কারো কবিতায় যুহদিয়াত প্রকাশ পেয়েছে। 'উসমান (রা.) তৃতীয় খলীফা। দানশীল ব্যক্তি হিসেবে তিনি ইসলামের ইতিহাসে কিংবদন্তী হয়ে আছেন। তিনি ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু দুনিয়া ত্যাগী মানুষের মতোই জীবন-যাপন করেছেন। তাঁর সহায়-সম্পদ মুসলিম জাহানের বিভিন্ন কাজে তিনি ব্যয় করেছেন। মুক্ত হস্তে তিনি দান-সাদাকা করেছেন। তাঁর রচিত নিম্নোক্ত পঙক্তিদ্বয় যুহদিয়াত কবিতার অন্তর্গত:[১১]

غني النفس يغني النفس حتى يكفها و إن عضها حتي يضربها الفقر
وما عسرة فاصبر لها إن لقيتها بكائنة إلا سيتبعها يسر

"আত্মার ধনাঢ্যতা আত্মাকে মুখাপেক্ষীহীন করে দেয়, এমনকি সে যদি দরিদ্রও হয়ে যায় তবুও তার এই আত্মার ধনাঢ্যতা তাকে সর্ব প্রকারের ক্ষতি থেকে ফিরিয়ে রাখে; দুঃখ-কষ্ট কিছুই না; যদি তা তোমার উপর আপতিত হয় তাহলে ধৈর্য ধারন কর। কেননা, এই দুঃখ-কষ্টের পর পরই সুখ ও শান্তি রয়েছে।"

'আলী (রা.) ছিলেন চতুর্থ খলীফা। প্রথম তিন খলীফার শাসনামলে তিনি মজলিসে শুরার সদস্য ছিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় তারা কোন সমস্যায় পড়লে তাঁর শরণাপন্ন হতেন। তিনি ছিলেন প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের এক প্রত্যুজ্জল মশাল। আরবী কবিতার ক্ষেত্রে তিনি অপরিসীম অবদান রেখেছেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি যে সকল কবিতা আবৃত্তি করেছেন তা দিওয়ান আকারে সংরক্ষিত আছে। আর বহু কবিতা সংরক্ষণের অভাবে চিরতরে হারিয়ে গেছে। 'আলী (রা.) বিভিন্ন ধরনের কবিতা রচনা করেছেন। এর মধ্যে বীরত্ব, যুদ্ধ ও জ্ঞান গর্ভ বিষয়েই তার কবিতা বেশি। তাঁর রচিত কিছু কবিতায় যহুদিয়াতের কথা উঠে এসেছে। 'আলী(রা) পৃথিবীর নশ্বরতা ও নিত্যতাকে মাকড়সার জালের সাথে তুলনা করে বলেছেন:[১২]

إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت
ولقد يكفيك أيها الطالب قوت ولعمري عن قليل كل من فيها يموت

"নিশ্চয় দুনিয়া নশ্বর, এর কোন স্থায়ীত্ব নেই, এই দুনিয়ার উপমা হলো মাকড়সার তৈরি করা ঘর; ওহে দুনিয়ার অন্বেষণকারী! দিনের খোরাকই তোমার জন্য যথেষ্ট, আর আমার জীবনের শপথ! খুব শিগগীর এ দুনিয়ার বুকে যারা আছে, সবাই মারা যাবে।"

সাহাবী লাবীদ ইবন রাবী'আ(রা.) ছিলেন একজন মুখাদরাম কবি। প্রাক ইসলামী ও ইসলামী উভয় যুগেই তিনি কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কবিতায় যুহদিয়াত লক্ষ্যণীয়। তিনি বলেন:[১৩]

ألا كل شيئ ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل

وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية يصفر منها الأنامل

"ওহে জেনে রাখো! এক আল্লাহ ছাড়া সবই নশ্বর –মিথ্যা, আর নিশ্চয় সকল সুখ-সম্পদ অস্থায়ী ও বিলীয়মান; সকল মানুষ–অতি শ্রীঘ্র তাদের মধ্যে মৃত্যুর প্রবেশ ঘটবে, আর তাতে আঙ্গুলের আগা সমূহ হলুদ বর্ণ ধারণ করবে।"

সিরিয়ার অধিবাসী কবি সাহম ইব্ন হানজালাও ছিলেন একজন মুখাদরাম কবি। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এবং পরে তিনি প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কবিতায় দুনিয়া বিমুখতা লক্ষ্যণীয়। তিনি বলেন:[১৪]

ولايحملنك اقتار على زهد ولا تزل فى عطاء الله مرتغبا

الله يخلف ما انفقت محتسبا إذا شكرت و يؤتيك الذى كتبا

"দুনিয়া ত্যাগের উপর কৃপণতা যেন তোমাকে প্ররোচিত না করে, সর্বদাই তুমি আল্লাহর দাস সম্পর্কে খুশী ও আগ্রহী থাক; তুমি যা খরচ কর আল্লাহ তা হিসাব করে তোমাকে দিয়ে দেবেন, যখন তুমি শোকর করবে আর তোমাকে তিনি তাই দিবেন যা যা তিনি লিখে রেখেছেন।"

আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালী (রহ.) বানু কিনানা গোত্রের দুওয়াইল শাখায় হিজরতের কয়েক বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৬৯/৬৮৮ সালে বসরায় মৃত্যুবরণ করেন। দ্বিতীয় খলীফা 'উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে তিনি বসরায় বসবাস করতে থাকেন। তিনি চতুর্থ খলীফা 'আলী (রা.)-এর শিষ্য ছিলেন। তাঁর কবিতায় যুহদিয়াত পরিলক্ষিত হয়। এর নমুনা তাঁর রচিত নিম্নরূপ কবিতা:[১৫]

وإذا طلبت من الحوائجِ حاجة فادعُ الإلهَ وأحسنِ الأعمالا

إن العبادَ وشأنَهم وأمو رَهم بيد الإلهِ يقلبُ الأحوالا

"তুমি যখন তোমার কোন প্রয়োজন চাইবে তখন আল্লাহকে ডাকবে এবং ভালো কাজ করবে; বান্দা ও তাদের অবস্থার বিষয়াবলী আল্লাহর হাতেই; তিনি অবস্থাকে পরিবর্তন করে দেন।"

কবি মিসকীন আদ-দারিমী(মৃ.৯০/৭০৮) বেশ কিছু যুহ্দ কবিতা রচনা করেছেন। নিম্নে তাঁর রচিত কিছু কবিতা-পঙক্তি পেশ করা হলো:[১৬]

وسُميتُ مسكينًا و كانت لجاجةً و إنيْ لمسكين إلى اللهِ راغبُ

مـــا أنزل اللهُ من أمرٍ فاكرهه إلا سيجعلُ لي من بعده فرجَـــا

"আমি মিসকীন নামে পরিচিত হয়েছি, আর এটা ছিল দ্বন্দের ব্যাপার; আর নিশ্চয় আমি আল্লাহর নিকট মিসকীন, তাঁরই প্রতি আসক্ত, আল্লাহ এমন কোন বিষয় অবতীর্ণ করেননি যা আমি অপছন্দ করি; এটা ব্যতীত যে, আমার জন্য এরপর প্রাচুর্য আসবে।"

উমাইয়্যা যুগের(হি.৪১-১৩৩/খ্রি.৬৬১-৭৫০) অন্যতম দুনিয়া বিমুখ কবি ও খতীব ছিলেন সাবিক আল-বারবারী। তাঁর উপনাম ছিল আবূ 'আবদুল্লাহ, মতান্তরে আবূ উমায়্যাহ। কারো কারো মতে তাঁর উপনাম ছিল আবুল মুহাজির, মতান্তরে আবূ সা'ঈদ। তিনি মরক্কো থেকে সিরিয়া হিজরত করে আসেন। 'আলিম হিসেবে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর জন্ম-মৃত্যুসন জানা না গেলেও তিনি উমায়্যাহ খলীফা 'উমর বিন 'আবদুল 'আযীযের খিলাফত কালে(হি.৯৯-১০২/খ্রি.৭১৭-৭২০) আল-মাওসিলের অন্তর্গত রিক্কার কাযী ও সেখানকার মসজিদের ইমাম ছিলেন। খতীব ও ওয়ায়েজ হিসেবে তিনি দক্ষতার পরিচয়ও দিয়েছিলেন। খলীফার অনুরোধে তিনি তাক্ওয়া ও দুনিয়া বিরাগমূলক প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন। দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ ক্ষণস্থায়ী, একদিন এসব ধ্বংস হয়ে যাবে, মানুষ জমাকৃত সম্পদ রেখে যায়, কিন্তু তা তাঁর অধিকারে থাকে না, এগুলো তাঁর ওয়ারিশদের মালিকানায় চলে যায়, এসব বিষয় নিয়ে তিনি যুহ্দ কবিতা রচনা করেছেন। এ সম্পর্কে কবি সাবিক আল-বারবারী বলেন:[১৭]

أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورُنا لخراب الدهر نبنيها

والنفس تكلف بالدنيا و قد علمت أن السلامة منها ترك مافيها

"আমাদের যে সম্পদ আমরা জমা করি তাতো মীরাসের অধিকারীদের (ওয়ারিসদের), আর যে সব ঘর-বাড়ি আমরা তৈরি করি তাতো সময়ের আবর্তনে একদিন ধ্বংস হবেই; নফস দুনিয়ার প্রতি আসক্ত, অথচ সে জানেযে, তা থেকে নিরাপদ থাকার উপায় হলো তার মধ্যে যা কিছু আছে তা ত্যাগ করা।"

বাগদাদ, মিসর ও সিরিয়ার 'আব্বাসী খিলাফতের যুগে(হি.১৩৩-৬৫৭/খ্রি.৭৫০-১২৫৮) জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। আরবী ভাষা ও সাহিত্য এ যুগে চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। আরবী কবিতার বিষয়বস্তুও প্রসারিত হয়। বিশেষ করে যুহ্দ ও সূফী কবিতা এ সময় পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে। সমকালীন বহু কবি যুহ্দ সূফী বিষয়ে কবিতা

রচনা করেছেন। 'আব্বাসী যুগেই দুনিয়া বিমুখ সুফী শ্রেণি কবির আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা ব্যাক্তি জীবনে ছিলেন দুনিয়া বিমূখ। কম বেশি যুহদিয়াত কবিতা তাঁরা রচনা করেছেন। এ যুগের যুহ্দ কবিতা রচনাকারীদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা, ইবরাহীম ইব্ন আদহাম, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মোবারক, বাহলুল 'উমর ইব্ন সায়রাফী, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আর-রূ'আসী, কবি আবু নুওয়াস ও কবি আবুল 'আতাহিয়্যার নাম বিষেশভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৮]

আবুল 'আতাহিয়্যার যুহ্দ কবিতা রচনার অনুপ্রেরণা

আবুল 'আতাহিয়্যা এমন এক পরিবারে জন্মেছিলেন, যার সামাজিক মর্যাদা ছিল না। এতে করে কবি শিশু বয়সেই নানাবিধ সমাজিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হন। শ্রেণি বৈষম্যের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে, নানাবিধ লাঞ্ছনা আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর শিশু হৃদয়ে ঝড় বয়ে যায়। এ ঝড়ই তাকে ভাব জগতের রাজপুত্র হিসেবে তৈরি করে। তিনি নির্মাণ করতে থাকেন অজস্র পঙক্তিমালা। এতে তাঁর হৃদয় নিকুঞ্জে লুকিয়ে থাকা যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব হয়। এভাবেই এক সময় তিনি হয়ে উঠেন উদীয়মান কবি। অতঃপর তিনি যখন বাগদদে আসেন, খলীফা মাহদীর বাদী উতবার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। উদ্ভীন্ন যৌবনা-সুন্দরী এ রমনীর অপরূপ সৌন্দর্যে তিনি বিমোহিত হয়ে পড়েন। তাকে নিয়ে তিনি নির্মাণ করতে থাকেন অসাধারণ গযল কবিতা। কিন্তু অনন্য সাধারণ সৌন্দর্যের আঁধার উতবা কবির প্রণয়ে সাড়া দেননি। কবি বেচইন হয়ে পড়েন। প্রিয়ার প্রত্যাখ্যান তাঁর হৃদয়ের বহ্নিশিখা আরো বাড়িয়ে দেয়। ব্যর্থ প্রেমের এ যন্ত্রণা তাঁকে দুনিয়া বিমুখ করে তুলে। তিনি হয়ে উঠেন 'যুহদ' কবিতার খ্যাতিমান কবি।[১৯]

কবি আবুল 'আতাহিয়্যার সে সময়ের সাথে যুক্ত হয় তদানীন্তন দরবারি ও অভিজাত শ্রেণির ভোগ বিলাস, দুর্নীতি ও ধর্মের প্রতি উদাসীনতা। শাসক শ্রেণির এহেন অনৈতিক কার্যকলাপ আবুল 'আতাহিয়্যা খুব কাছ থেকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করে ব্যাথিত ও মর্মাহত হয়েছেন। বিদগ্ধ কবি তখন থেকে রচনা করতে থাকেন– ধর্ম নিষ্টা, পার্থিব জীবনের অসারতা, মৃত্যুর চিরন্তন সত্যতা, কালের কুটিলতা, পরকালের পূণ্য সঞ্চয়, মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের ভয়াবহতা প্রভৃতি বিষয়ক কবিতা। তাঁর এসব কবিতা সমকালের মানব সমাজে এতো জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, তিনি একাগ্রচিত্তে এ জাতীয় কবিতা রচনায় ব্যাপৃত থাকেন এবং সুখ্যাতি অর্জন করেন। যুহ্দ কবিতায় তাঁর সফলতা প্রত্যক্ষ করে আরো অনেকে যুহ্দ বিষয়ক কবিতা রচনায় এগিয়ে আসেন। এ ক্ষেত্রে কবি আবু নুওয়াসের নাম প্রণিধানযোগ্য।[২০]

আবুল 'আতাহিয়্যা প্রথম জীবনে জন্মভূমিতে অবস্থান করলেও যুবক বয়স থেকে আমৃত্যু বাগদাদেই কাটান। তিনি দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন এবং দীর্ঘ সময় কবিতাই রচনা করে গিয়েছেন। শুধু রচনার আধিক্যে নয় –অনুপম রচনাশৈলী ও মানের কারণেই তিনি বিখ্যাত কবি হিসেবে পরিগণিত। আবুল আতাহিয়্যার আবির্ভাব খলীফা মাহদীর শাসনামলে–এসময় তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। অতঃপর খলীফা হাদী, হারুনুর রশীদ, আমীনুর রশীদ ও মামুনুর রশীদের শাসনকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। সুদীর্ঘ জীবনে তিনি শুধু কাব্যই রচনা করেছেন। এতে করে তিনি অর্জন করেছেন সুনাম, সুখ্যাতি ও খলীফাগণ কর্তৃক অঢেল সম্পদ। প্রথম জীবনে গযলসহ বিভিন্ন ধরণের কবিতা লিখলেও পরিণত বয়সে বিশেষ করে শেষ বয়সে মরমী কবিতাই শুধু রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন খুবই ধার্মিক মানুষ। যদিও কেউ কেউ তাকে যিন্দিকের অপবাদ দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর জীবন ধারা ও বিশাল সাহিত্য সম্ভারে এ অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি। বরং আল্লাহর উপর অবিচল বিশ্বাস ও আস্থা, একত্ববাদ, স্রষ্টার প্রশংসা, তাওবা, অনুতাপ, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি ভালোবাসা, সম্মান, প্রশংসা এবং দুনিয়াবিমুখ কবিতা রচনার মাধ্যমে ধর্মভীরু একজন মুত্তাকী যাহিদ মানুষ হিসেবেই আমরা তাঁকে পাই।[২১]

কবি আবুল 'আতাহিয়্যা ছিলেন সাদা মনের অধিকারী এক দিব্য পুরুষ। তিনি তাঁর দোষ-ত্রুটি অপকটে স্বীকার করে নিতেন। শেষ জীবনে তিনি নির্জনতাকে বেশি করে আঁকড়ে ধরেছেন। তাওবা ইস্তিগফার আর ইবাদাতের মধ্যেই তিনি সময় অতিবাহিত করেছেন। সংসারের সবকিছু ছেড়ে দিলেও কবিতা তিনি ছাড়েননি। তবে শেষ জীবনের কবিতাগুলি ছিল পরকালের মুক্তি ও নাজাতের উসিলা স্বরূপ। সে সময়কার যুহদ কবিতাগুলোতে কবির গভীর ধর্মীয় মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। শেষ বয়সে কবি সংসারের যাবতীয় ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হয়ে যান। কবি এ ব্যাপারে বলেন:[২২]

ألا كل مولودٍ، فللموت يولد، ولستُ أرى حياً لشيء يخلدُ
تجرد من الدنيا، فإنك أنما سقطت إلى الدنيا، و أنت مجردُ

"জেনে রেখো! প্রত্যেক নবজাতক মৃত্যুর জন্য জন্মগ্রহণ করে থাকে, আর আমিতো কোনো জীবিত বস্তুকে চির জীবি হতে দেখিনা; দুনিয়ার ঝামেলা থেকে মুক্ত হও, তুমি একাকীই এদুনিয়ায় আগমন করেছ।"

আমরা কবির ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি তাঁর কাব্যে লক্ষ্য করেছি। এর পরিমাণ এতো বেশি যে তাঁকে কোনভাবেই ধর্ম বিষয়ে উন্নাসিক ভাবতে পারি না। আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, কবি আবুল 'আতাহিয়্যা ছিলেন ইসলামী ভাবধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।

মুসলিম অতীন্দ্রিয়বাদ বা সূফীবাদে যুহ্দ একটি প্রায়োগিক পরিভাষা। আল-কুর'আনে নবী ইউসুফ(আ.) নিখোঁজ ছিলেন অর্থে যুহ্দ শব্দটি নির্লোভ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে:[২৩]

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزَاهِدِيْنَ

"এবং তারা (ইউসুফ ভ্রাতৃগণ অথবা যাত্রীদ;ল) তাঁকে(ইউসুফ) স্বল্প মূল্যে মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করলো, তারা ছিলো তাঁর ব্যাপারে নির্লোভ"।

পাপ কাজ হতে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজ হতে অথবা মহান আল্লাহর স্মরণ থেকে যা দূরে সরিয়ে দেয় বা বিচ্ছিন্ন করে দেয় তা হতে সংযম অবলম্বন বা আত্মসম্বরণ করাই হলো যুহ্দ। অতঃপর মনের নিরাসক্তি ও নির্লিপ্ততা সহকারে সকল নস্বর দ্রব্যাদি হতে সংযম ও মিতাচার অবলম্বন, কঠোর সংযম বা তপস্যা এবং সকল সৃষ্ট জিনিসকে বর্জন করাই হলো যুহ্দ। এ পর্যায়ে 'নিসক', পরিভাষাটি প্রাচীনতর ধর্মীয় রচনাবলীতে যুহ্দের প্রতিশব্দরূপে স্থলাভিষিক্ত ও লিপিবদ্ধ আছে। এটা কানা'আ(মধ্রম ও অনূগ্র মাত্রার মিতাচার ও প্রবৃত্তি সংযতকরণ) এবং ওয়ার'(বিধি অনুসাওে সন্দেহজনক প্রতিটি জিনিসকে সযত্নে পরিহার করা)-এর অতিরিক্ত হিসাবে বিবেচিত। এধাপটিও মানুষকে যুহ্দের পর্যায়ে নিয়ে যায়। সাধক যুন-নুন মিসরীর মতে নৈতিক গুণাবলীকে ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করার ব্যাপারে ওয়ার' -এর ধাপটি মানুষকে যুহ্দের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। ইমাম গাযালীর মতে যুহ্দেও স্থান ফাক.র পরিভাষার পরে ও তাওয়াক্কুল পরিভাষার আগে স্থান দেয়া যেতে পারে।[২৪]

হিজরী দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীতে যুহ্দের ধারণাটি ক্রমশ স্থিতিশীল ও নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। এরূপটি হলো শুধু পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান ও সুস্বাদু খাদ্যই নয়, বরং নারীও বর্জন করতে হবে। অন্তর্দশন ও আত্মনিরীক্ষামূলক বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়ে অখ্যন্তরীণ ও অন্তর্মুখী তপস্যা এবং ইচ্ছা ও কামনা-বাসনাকে বিসর্জন দেয়ার উপর জোর দেয়া হয়। এটা ক্রমশ তাওয়াক্কুলের ধারণার দিকে নিয়ে যায়। খৃষ্টবাদ বা সন্ন্যাসবাদের সঙ্গে সূফীদের যুহ্দ বা তাপসসুলভ সাধনা ও আচার-অনুষ্ঠানের কিছুটা মিল দেখা গেলেও এগুলো ধারকৃত মত বা পথ বলা সমীচীন হবেনা। আল-কুর'আনে রুহবানিয়াত সম্পর্কে উল্লেখ আছে:[২৫]

وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الذِيْنَ أتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها.

"এবং তার অনুসারীদেও অন্তওে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া। আর সন্যাসবাদ-এটাতো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিলো"।

আর, রুহবানিয়্যাত বা সন্ন্যাসবাদকে আল-কুর'আনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পরিত্যাজ্য ঘোষণা করা হয়েছে। ভোগবিলাসকে নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি হালাল ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ এবং সৌন্দর্য চর্চাকে নিষিদ্ধ করে এর বিরুদ্ধেকড়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করে মধ্যম ধরনের তথা তাকওয়া সহকারে দুনিয়ার সম্পদ ভোগ করতে আল-কুর'আনে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা হলো যুহ্দ। তাই, যুহ্দ হচ্ছে পার্থিব দুনিয়ার আকর্ষণ ত্যাগ কওে পরকালীন কল্যাণ ও মুক্তির আশায় জীবন ও সম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ঐকান্তিকভাবে মহান স্রষ্টার নিকট নিজেকে সমর্পণ করা, জীবন ও জগতের যাবতীয় মোহ থেকে নিজেকে গুটিয়ে একমাত্র মহান স্রষ্টার উপাসনায় লিপ্ত থাকা। আল-কুর'আন ভোগবিলাসকে নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি হালাল ও পবিত্র খাদ্য খাওয়া এবং সৌন্দর্য চর্চাকে নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে কড়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করে মধ্যম ধরনের ও তাকওয়া সহকাওে দুনিয়ার সম্পদ ভোগ করতে আল-কুর'আনে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা-ই হলো যুহ্দ। তবে, আল-হাদীসে আরো প্রত্যক্ষ্য ও স্পস্টভাবে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।[২৬]

যুহ্দ কবিতার বৈশিষ্ট্য ও বিকাশ

যুহ্দ কবিতায় সহজ-সরল শব্দ ও বাক্যের অবস্থান রয়েছে। যুহ্দ কবিতার শব্দ ও বাক্য সম্পূর্ণ জটিলতামুক্ত। কবিতায় অনুসরনিয় ছন্দ ও মাত্রার অনুপস্থিতি রয়েছে। উপদেশপূর্ণ সম্মোধনীয় রচনাশৈলীর পুনরাবৃত্তি রয়েছে। এরূপ কবিতায় সৃজনশীল রচনাশেলীর আধিক্য পাওয়া যায়। প্রজ্ঞা, দার্শনিক ও পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার ছাপ তাতে বিদ্যমান আছে । প্রথমে আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন যুগে তাসাউফ ও সূফী কবিতার ধারণা ও বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। তাসাওফ শব্দ থেকে সূফী শব্দের আগমন। তাসাওফ একটি শব্দপ্রকরণ। শব্দটির অর্থ- পশম, উল। অভ্যন্তরূপে তাসাউফ শব্দটি পশমী পোশাক পরিধান করার অর্থ প্রকাশ করে থাকে। সূফী হয়ে সূফী দরবেশের ন্যায় মোটাসোটা পশমী পোশাক পরিধান এবং নিজেকে কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ সূফীবাদী জীবনযাপনের জন্য নিবেদিত করাকে ইসলামী পরিভাষায় তাসাউফ নামে অভিহিত করা হয়। ভাষাতত্ত্বের বিচারে সূফী শব্দটি সূফ-এর সম্মন্ধবাচক শব্দ। বেশ কিছু হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ(স.) পশমী বস্ত্র পরিধান করেছেন। তিনি পশমীবস্ত্র পরিহিত অবস্থায় ইনতিকাল করেছেন। মহান আল্লাহ যখন মূসা(আ.)-এর সাথে কথোপকথন করেছেন তখন মূসা(আ.) আপাদমস্তক পশমীবস্ত্র পরিহিত ছিলেন। তবে সূফীসুলভ জীবনযাপন ও বিশেষ ধরনের বস্ত্র পরিধানের পারস্পরিক সম্মন্ধ সুস্পষ্টভাবে খুঁজে পাওয়া যায়না। হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর সূচনা হতে তাসাউফ পরিভাষাটি ব্যাপহারে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে তাসাউফ শব্দটি সমগ্র ইরাকের আধ্যাত্মবাদীদেও জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে এবং দুই শতাব্দীর মধ্যেই সূফীয়্যা পরিভাষাটি সকল মুসলিম সূফী দরবেশ ও আধ্যাত্মবাদীর জন্য তেমনই ব্যবহার হতে থাকে।[২৭]

খ্রিষ্টান পাদরীদের উৎপত্তির স্থল মিসর ছিল বিধায় ২০০/৮০০ সালের কাছাকাছি কোন একসময় এই মিসরেই তাসাওফের জন্ম হয়েছে। মিসরে এক দল সূফী সবসময় বসবাস করতেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন:[২৮]

১. সায়্যেদা নাফীসা(মৃ.২০৮/৮২৩) বিন্ত আমীর হাসান ইবন যায়দ ইবন আল-হাসান ইবন 'আলী ইবন আবী তালিব(রা.)। তাঁর পিতা আল-মানসূর শহরের আমীর ছিলেন। তাঁর স্বামী ইসহাক ইবন জা'ফার আল-সাদিক কে সঙ্গে নিয়ে তিনি মিসরে আগমন করেন এবং সে খানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি একজন 'আবিদ, যাহিদ এবং কল্যাণময়ী মহিয়ষী নারী ছিলেন। তিনি অনেক সম্পদশালী ছিলেন। সেগুলো তিনি পার্থিব ও জন কল্যাণমূলক কাজে এবং রোগীদের সেবায় ব্যয় করতেন। ইমাম শাফি'ঈ(রহ.) মিসরে আগমন করলে তিনি তাঁর কল্যাণ সাধিত করতেন এবং মাহে রমযানে কোনো কোনো সময় তাঁর সাথে সালাত আদায় করতেন। যখন সায়্যিদা নাফীসা ইনতিকাল করেন তাঁর স্বমীর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিলো তাঁকে মদীনা মুনাওয়্যারায় দাফন করবেন। মিসরবাসীর অনুরোধে তঁকে মিসর ও কায়রোর মধ্যবর্তী মহল্লায় তাঁর বসত ভিটা দারবুস-সিবা'য় দাফন করা হয়।[২৯]

২. যুন-নূন আল-মিসরী, ছাওবান ইব্ন ইব্রাহীম আবুল-ফায়দ(মৃ.২৪৫/৮৫৯)। তাঁর জন্মস্থান মিসরের সা'ঈদ শহরের বাখিম অঞ্চলে অবস্থিত। তিনি মিসরের উল্লেখযো সূফী ছিলেন। মিসরবাসী তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে যে, তিনি এমন বিদ্যার উদ্ভাবন করেছেন যা সাহাবীগণ বলেননি এবং আব্বাসী খলীফা মুতাওয়াক্কিলেন নিকট তাঁর বিরুদ্ধে যান্দীক হওয়ার অভিযোগটি পেশ করা হলে খলীফা তাঁকে মিসর থেকে আল-বারীদে উপস্থিত হওয়ার আদেশ প্রদান করেন। যখন তিনি "সুর্‌রা মান রা'আ" শহরে খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়ে খলীফাকে উপদেশমূলক এক ভাষণ দিলেন, খলীফা কেঁদে ফেললেন এবং তাঁকে স্বসন্মানে মিসরে ফিরে নেয়ার আদেশ দিলেন। তিনি ইমাম মালিক, লায়ছ ও ইবন লাহি'আ থেকে হাদীস র্ভুনা করেছেন। আর তাঁর থেকে যুনায়দ ও অন্যান্নরা হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সে সময়ের মিসরের অধিক জ্ঞানী-গুণী, সূফী সাধক, আলিম ও সাহিত্যিক ছিলেন।[৩০]

৩. আবুল হাসান ইবন বানান ইবন মুহাম্মদ ইবন হামদান আল-হাম্মাল আল-ওয়াসিতী(মৃ.৩১৬/৯২৮) মিসরের একজন শায়ক এবং শিক্ষা-দীক্ষায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রণী ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি নির্জন একটি প্রান্তরে মারা গেছেন। কোনো অজানা এক আগন্তক তাঁর মুখমণ্ডলে অঘাত বরলে তিনি তাতে মারা যান। মিসরবাসীর অন্তরে তিনি এক মর্যাদাপূর্ণ আসনে উন্নীত ছিলেন। তাঁর অনেকগুলো কারামত আছে।

৪. মিসরে ফাতিমী খিলাফতের যুগের সূফী কবি ইবনুল কীযানী (মৃ.৫৬০/১১৬৪)। তিনি ইসলামী বক্তা ছিলেন এবং একজন 'আবিদও ছিলেন। তিনি ভ্রান্ত 'অকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি দাবী করেন যে, বান্দার ক্রিয়া-কর্ম পুরাতন এবং মিসরের কীযানপন্থীদের এই উদ্ভাবনী স্থায়ী। তাঁর একটি কবিতা সংকলন দীওয়ান রয়েছে।[৩১]

সূফী কবিতার বিকাশ

তাসাওউফ শব্দ থেকে সূফী শাব্দর বিকাশ ঘটেছে। শব্দটির ধাতুমূল صوف (ص و ف), অর্থ - পশম, উল। তাসাওউফ অর্থ পশমী পোষাক পরিধান করা। সুতরাং 'সূফী' হয়ে সূফী দরবেশের ন্যায় মোটাসোটা পশমী পোশাক পরিধান এবং নিজেকে কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ সূফীবাদী জীবন যাপনের জন্য নিবেদিত করাকে ইসলামী পরিভাষায় তাসাওউফ নামে অভিহিত করা হয়। ভাষা-তত্ত্বের বিচারে সূফী শব্দটি সূফ-এর সম্বন্ধবাচক শব্দ। চার খলীফার যুগ পর্যন্ত তাসাওউফ শব্দটি মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের তীব্র বাসনা অর্থে গোটা উম্মাতের অভ্যন্তরে প্রভাব বিস্তার করে ছিলো। আয়্যুবী-মামলূকী যুগে মিসরে অনেক সূফীর আবিভাব ঘটে। তাঁদেও মধ্যে রয়েছেন, 'আবদুর রহীম আল-কাত্তানী, ইবনুল ফারিদ, আবুল-হাজাহ আল-আকসারী, আবুল-হাসান আশ-শাযিলী, সৈয়দ আহমাদ আল-বাদাভী, ইব্রাহীম আদ-দাসূকী, শরফুদ্দীন আল-ইখমীমী, আবুল 'আব্বাস আল-মারমী আল-আনসারী, আল-মুরশিদী, আল-আনয়াবী ও আদ-দামামীনী ইত্যাদি। মিসরীয় সমাজে সূফীদের বড়ধরণের প্রভাব রয়েছে। আয়্যুবী সুলতানদের যুগে মিসরের অধ্যাত্মিক ও সমাজ জীবনে সূফী কবি ইবনুল ফারিদ(মৃ.৬৩২/১২৩৫)-এর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।[৩২]

চার খলীফার যুগ পর্যন্ত তাসাওউফ শব্দটি মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের তীব্র বাসনা অর্থে গোটা উম্মাতের অভ্যন্তরে প্রভাব বিস্তার করে ছিলো। আয়্যুবী-মামলূকী যুগে মিসরে অনেক সূফীর আবিভাব ঘটে। তাঁদেও মধ্যে রয়েছেন, 'আবদুর রহীম আল-কাত্তানী, ইবনুল ফারিদ, আবুল-হাজাহ আল-আকসারী, আবুল-হাসান আশ-শাযিলী, সৈয়দ আহমাদ আল-বাদাভী, ইব্রাহীম আদ-দাসূকী, শরফুদ্দীন আল-ইখমীমী, আবুল 'আব্বাস আল-মারমী আল-আনসারী, আল-মুরশিদী, আল-আনয়াবী

ও আদ-দামামীনী ইত্যাদি। মিসরীয় সমাজে সূফীদের বড়ধরণের প্রভাব রয়েছে। আয়্যুবী সুলতানদের যুগে মিসরের অধ্যাত্মিক ও সমাজ জীবনে সূফী কবি ইবনুল ফারিদ(মৃ.৬৩২/১২৩৫)-এর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।[৩৩]

যুগের খ্যাতিমান অনেক সূফীদের সাথে ইবনুল ফারিদের সুসম্পর্ক ছিলো। বিশেষ করে বাগদাদের বিখ্যাত নিহত শিহাবুদ্দীন আস-সুহরাওয়ার্দী (মৃ.৬৩২/১২৩৪) ও স্পেনের মুহীউদ্দীন ইবনুল 'আরাবী (মৃ.৬৩৮/১২৪০)-এর সাথে তাঁর আত্মার সম্পর্ক ছিলো। এদু'জন ব্যাক্তি তাসাওফের ভূবনে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে উদাহরণ হয়ে আছেন। আস-সুহরাওয়ার্দী তাসাওফের ক্ষেত্রে আহলুস-সুন্নত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাসের কাছাকাছি ছিলেন। আর, মুহী উদ্দীন ইবনুল 'আরাবী দর্শনশাস্ত্র মতাবদর্শের কাছাকাছি ছিলেন। তবে ইবনুল ফারিদ উক্ত দুই মতাদর্শের কোনো একটির সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কিত ছিলেননা। তিনি তৃতীয় একটি মতাদর্শের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি 'ইত্তিহাদী' বা মহান আল্লাহর একত্বে বিশ্বসী ছিলেন। তিনি ইবনুল 'আরাবীর ওয়াদাতুল ওয়াজূদে বিশ্বাসী ছিলেননা এবং মানসূর হাল্লাজের আল-হুলূলেরও বিশ্বসী ছিলেননা, বরং তিনি ওয়াহদাতুশ-শুহূদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি প্লেটোর নব্য দর্শনের উৎস আল-ইশরাক বা উজ্জ্বলতার ভিত্তি আল-ফায়দুল ইলাহী বা ইলাহী আলো প্রবাহ আহরণের প্রবক্তা এবং সূফী পথ অনুসরণে আহলুল কিতাব ওয়াস সুন্নাত-এর সাথে ঐকমত্য পোষণ করতেন। উক্ত তিন মতাদর্শের আংশিক আংশিক গ্রহণ করে ইনুল ফারিদ তিনি তাঁর সূফী তত্ত্বের তৃতীয় অবস্থানে আসিন হয়েছেন। তিনি সাধারণ সুন্দরকে ভালবাসতেন যা সকল সৃষ্টিজগতে বিরাজ করছে। তিনি মানুষের মধ্যকার সৌন্দর্য ভালবাসতেন আবার কখনো প্রণী জগতের সৌন্দর্য ভালবাসতেন, কখনো কখনো প্রবাহমান নীল নদের সৌন্দর্যকেও ভালবাসতেন।[৩৪]

ইবনুল ফারিদ বলেন:[৩৫]

جَلَتْ، في تجليها، الوجودَ لنا ظري، ففي كل مَرْئيٍ أراها برؤيةِ
وأشهدتُ غيبي، إذ بدتْ، فوجدتُني، هُنالك، إياها، بجلوة خلوتي

"তাঁর নিজস্ব পর্দা উম্মোক্ত করে তিনি আমার চোখের দৃষ্টি উম্মোক্ত করছেন, এবং আমি তাঁকে আমার দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যেক দৃশ্যমান বস্তুতে অবলোকন করেছি; এবং তিনি যখন আমার দৃশ্যপটে আসেন আমি তঁকে অদৃশ্যের সাক্ষাত লাভে সন্তুষ প্রকাশ করেছি, এবং আমার গোপন আস্তানায় প্রদর্শনরে মাধ্যমে আমি তাঁকে সেখানে আমাকেই দেখেছি"। এপর্যায়ে ইবনুল ফারিদ আরো বলেন:[৩৬]

وصَرحْ بإطلاقِ الجمالِ ولا تقُلْ بتقييده، ميلاً لزُخْرُفِ زينةِ
فَكل مليحٍ، حسنهُ، من جمالها، مُعَارٌ له، بل حُسْنُ كل مليحةِ

"And declare the absoluteness of beauty and be not moved to deem it finite by your longing for a tinseled gaud; For the charm of every fair youth or lovely woman is lent to them from Her beauty".

মিসরে যুহ্দ ও সূফী কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য আয়্যূবী সুলতান সালাহ উদ্দীনের যুগে অনেকগুলো উপাসনালয় স্থাপন করা হয়। এসব উপাসনালয়ে সূফীগণ সার্বক্ষণিকভাবে উপস্থিত থেকে সূফী তত্ত্ব অনশীলন করতেন। এসব উপাসনালয়কে "খানকাহ" বলা হতো। এগুলো মুসলিম দরিদ্রলোকদের ও তাদের পরিবারের লোকদের জন্য সরকারী অনুদান প্রাপ্তির আশ্রয়স্থল ছিলো। তারা বায়তুল জামাতে সালাত আদায় করতো এবং জুমু'আর সালাত শহরের অন্যসব মসজিদে আদায় করতো। সুলতান সালাহ উদ্দীন মিসরে সর্বপ্রথম "সা'ঈদুস-সু'আদা" খানকাহটি স্থাপন করেন। পরে যে সব খানকাহ মিসরে স্থাপিত হয় সেগুলো হলো: খানকাহ বায়বারসিয়্যা, খানকাহ সিরয়াকূস, খানকাহ কূসূন, খানকাহ শায়খো ইত্যাদি।[৩৭]

আয়্যূবী যুগে আরবী যুহ্দ বা সূফী কবিতার স্বরূপ

পৃথিবীর সকল ভাষায় সকল যুগে তার নিজস্ব সাহিত্যের স্বরূপ ও প্রকৃতিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন ইংরেজি কবি সেক্সপিয়রের সময়ের কবিতা ও বর্তমান সময়ে কবিতার স্বরূপ ও অবকাঠামোতে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্যনীয়। বাংলা ভাষায়ও মধ্য যুগের কাব্যসাহিত্য ও বর্তমান কালের কাব্যসাহিত্যের মাঝে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তেমনি ভাবে আরবী কবিতাও এর ব্যতিক্রম নয়। জাহিলী, ইসলামী, উমায়্যা, আব্বাসী ও আয়্যূবী যুগের কবিতার মধ্যে যদি পারস্পারিক তুলনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেক যুগের আরবী সূফীকবিতার স্বরূপ ও বিষয়বস্তুতে একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তবে অনেক ক্ষেত্রে কবিতার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুতে সামঞ্জস্য পাওয়া গেলেও শব্দ চয়ন, প্রকাশ ভঙ্গি, ছন্দের রীতি ও উপস্থাপনায় অনেকটাস্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য পাওয়া যায়। আয়্যূবী যুগের রচিত প্রচলিত আরবী সূফীকবিতার স্বরূপ, লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু তুলে ধরা হলো। তপশ্চর্যা বা তপস্যার কবিতা বা যুহ্দ কবিতা (شعر الزهد) এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে তপশ্চর্যার কবিতা, তপস্যও কবিতা, আর পারিভাষিক অর্থে যুহ্দ হলো পার্থিব সম্পদের মায়া ত্যাগ করে শুধুমাত্র পরকালের উদ্দেশ্যে নিজের জীবন সম্পদ উৎসর্গ করে ঐকান্তিকভাবে আল্লাহর দরবারে নিজকে সোপর্দ করে কবিতা রচনা করা। 'আব্বাসী যুগে আবু নুওয়াস, মুতানাব্বী, মা'আররী সহ আরো অনেকেই এই الزهد বা আধ্যাত্মিক কবিতা রচনা করেছেন। তবে, আয়্যূবী শাসনামলে যুহ্দ বিষয় নিয়ে অনেক কবি কবিতা রচনা করলেও ইবনুল

ফারিদ ছিলেন 'আব্বাসীয় মিসর- সিরিয়ার সূফীতাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠ কবি। আবুল 'আতাহিয়্যা ছিলেন 'আব্বাসীয় বাগদাদের শ্রেষ্ঠ যুহ্দ কবি।[৩৮]

যুহ্দ ও তাসাওফ-এর মধ্যে পার্থক্য

যুহুদ ও তাসাউফ কবিতার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্য নেই। যেখানে যুহুদ সেখানে তাসাউফ। ইবনুল ফারিদের কবিতায় আল্লাহর প্রতি ভালবাসা (হুব্বুল ইলাহী)-এর বিষয়টি পূর্ববর্তী সূফীদের কবিতার বিষয় ও স্বরূপ থেকে পৃথকভাবে গৃহীত কতকগুলো নতুন সংযোজন মাত্র। তাঁর একমাত্র কাব্যসংকলন দীওয়ন গ্রন্থে সে গুলো প্রকাশ পেয়েছে। যুহুদ বা পার্থিব দুনিয়ার আকর্ষণ ত্যাগকরে পরকালীন কল্যাণ ও মুক্তির আশায় জীবনও সম্পদকে তুচ্ছজ্ঞান করে ঐকান্তিকভাবে মহান আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা, জীবন ও জগতের যাবতীয় মোহ থেকে নিজেকে গুটিয়ে একমাত্র তাঁরই ইবাদতে লিপ্ত থাকাই ইবনুল ফারিদের যুহুদের তাৎপর্য। যুহ্দ (زهد) আরবী শব্দ যার অর্থ কৃচ্ছ্রসাধন। ইংরেজিতে বলা হয় ধংপবঃরংস, আর কৃচ্ছসাধনকারীকে বলা হয় যাহিদ (زاهد) বা ধংপবঃরপ. যুহ্দ হচ্ছে পার্থিব আকর্ষণ ত্যাগকরে পরকালীন কল্যাণ ও মুক্তির আশায় জীবন ও সম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ঐকান্তিকভাবে মহান স্রষ্টা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা, জীবন ও জগতের যাবতীয় মোহ থেকে নিজেকে গুটিয়ে একমাত্র তাঁরই ইবাদতে লিপ্ত থাকা। সূফী-সম্প্রদায় সম্পূর্ণভাবে যুহদ-সম্প্রদায়ভুক্ত। যে পথ বা তরীকা পরিপূর্ণ যুহ্দ দ্বারা শুরু ও পরিচালিত হয় তা-ই তাসাওফ(تصوف)। তাসাওফ শব্দের অর্থ আধ্যাত্মিকতা বা Sufism, Mysticism. হিজরী তৃতীয়/খ্রিষ্টীয় ১০ম শতকে যুহ্দের অন্তবর্তিকালীন একটি স্তরের মধ্যে তাসাওফের বিকাশ ঘটে।[৩৯]

যুহ্দের অনেকগুলো ধাপের একটি পরিপূর্ণ ধাপ হলো তাসাওফ বা ইসলামী আধ্যাত্মিকতা (Islamic Mysticism) নামে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। তাসাওফ শব্দটি সাধারণত যুহ্দের তুলনায় একটি বিশেষ স্তর। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্যের প্রতি বিরাগভাজন এবং তার প্রতি অনাসক্তিমূলক কবিতাই زهديات বা দুনিয়া-বিমুখতামূলক কবিতা। যুহ্দ ও সূফী কবিতার ভাব ও ভাষা ইসলামী ভাবধারায় উজ্জীবিত। সিরিয়া ও মিসরের আব্বাসীয় যুগে সূফী কবিতা চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। ইসলামী ভাবধারায় কবিতা রচনার অন্যতম সংযোজন হচ্ছে যুহ্দ ও সূফীকবিতা। জাহিলিযুগের কবিগণ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস নিয়ে মত্ত থাকলেও তাদের কারো কারো কবিতায় আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি যুহায়র বিন আবী সুলমার কবিতায় যুহদিয়াত-এর ছাপ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর কবিতায় নৈতিকতা, মানবীয়গুণাবলী, কিরামান কাতিবীন, আল্লাহর

একককত্বে বিশ্বাস, মৃত্যুরপর পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি ধর্মীয় বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। কবি যুহায়র বিন আবী সুলমা বলেন:[৪০]

فَـلَا تَـكْـتُـمُـنَ اللهَ مَـا فِيْ صُـدُوْرِكُـمْ   لِـيُـخْـفِيَ وَمَـهْـمَـا يُكْـتَـمِ اللهَ يُـعْـلَـمِ

يـؤخَـرْفـيـوضَـعْ فِيْ كِتَـابٍ فَـيُـدخَـرْ   لِيَـوْمِ الـحِسَـابِ أَوْ يُـعَـجَـلْ فَـيُـنْـقَـمِ

"তোমাদের অন্তরে যা আছে তা গোপন থাকবে ভেবে তোমরা আল্লাহর নিকট থেকে কোন কিছু লুকিয়ে রেখোনা; কারণ, যখন মহান আল্লাহর নিকট থেকে কোনো কিছু গোপন রাখা হয় তিনি তা অবগত হন। দেরিতে হলেও তা হিসাবের দিন প্রকাশের জন্য একটি কিতাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে, অথবা তাৎক্ষণিক তার শাস্তি প্রদান করা হবে।"

আধ্যাত্মিকতা, সূফীতত্ত্ব ও মিসরীয় সূফীদের স্তরবিন্যাস

আধ্যাত্মিকতা বা সূফীতত্ত্বের অর্থ হলো, কারণ ও অনুভূতি ব্যতীরেকে উপাসনা ও ধ্যানের মাধ্যমে মহান আল্লাহ ও প্রকৃতসত্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে বিশ্বাস স্থাপন করা:[৪১]

"The belief that knowledge of God and of real truth can be found through prayer and meditation rather than through reason and the senses".

ব্যাপক অনুসন্ধানের পর মিসরের সূফীদের তিনটি স্তরের সন্ধান পাওয়া যায়া: ক. দার্শনিক সূফী স্তর, যেমন , ইবনুল ফারিদ। খ. ফকীহ সূফী স্তর, যেমন, সৈয়দ আবদুর রহীম আল-কানা'ঈ এবং তাঁর শিষ্য আবুল হাসান আস-সাব্বাগ। গ. দরবেশ সূফী স্তর, এই স্তরে রয়েছে ৩৬টি তরীকা পন্থী। যেমন, সৈয়দ আহমদ আল-বাদাভী(মৃ.৬৭৫/১২৭৬) ইত্যাদি। যুহুদ ও তাসাউফ কবিতার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্য নেই। যেখানে যুহ্‌দের অস্তিত্ব রয়েছে সেখানে সেখানে তাসাওউফের অস্তিত্ববিরাজ করবে। ইবনুল ফারিদের কবিতায় যুহ্‌দ ও তাসাওউফ উভয়ের সংমিশ্রণ রয়েছে। তাঁর কবিতায় আল্লাহর প্রতি ভালবাসা (হুব্বুল ইলাহী) বিষয়টি পূর্ববর্তী সূফীদের কবিতার বিষয় ও স্বরূপ থেকে পৃথকভাবে গৃহীত কতকগুলো নতুন সংযোজন মাত্র। তাঁর একমাত্র তাসাওউফ উভয়ের সংমিশ্রণ রয়েছে। তাঁর কবিতায় আল্লাহর প্রতি ভালবাসা (হুব্বুল ইলাহী) বিষয়টি পূর্ববর্তী সূফীদের কবিতার বিষয় ও স্বরূপ থেকে পৃথকভাবে গৃহীত কতকগুলো নতুন সংযোজন মাত্র। তাঁর একমাত্র কাব্যসংকলন দীওয়ান গ্রন্থে সে গুলো ব্যাপকহারে প্রকাশ পেয়েছে। যুহ্‌দ বা পার্থিব দুনিয়ার আকর্ষণ ত্যাগকরে পরকালীন কল্যাণ ও মুক্তির আশায় জীবনও সম্পদকে তুচ্ছজ্ঞান করে ঐকান্তিকভাবে মহান আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা, জীবন ও জগতের যাবতীয় মোহ থেকে নিজেকে গুটিয়ে একমাত্র তাঁরই ইবাদতে লিপ্ত থাকাই ইবনুল ফারিদের যুহ্‌দের ও সূফী তত্ত্বের তাৎপর্য। তাঁর রচিত কাব্যে সূফী দর্শনের পাঁচটি শ্রেণীস্তরের অস্তিত্ব খুঝে পাওয়া যায়।[৪২]

ইবনুল ফারিদের আয়্যুবী যুগে আরবী সূফী কবিতার স্বরূপ

পৃথিবীর সকল ভাষায় সকল যুগে তার নিজস্ব সাহিত্যের স্বরূপ ও প্রকৃতিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন ইংরেজি কবি সেক্সপিয়রের সময়ের কবিতা ও বর্তমান সময়ে কবিতার স্বরূপ ও অবকাঠামোতে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্যনীয়। বাংলা ভাষায়ও মধ্য যুগের কাব্যসাহিত্য ও বর্তমান কালের কাব্যসাহিত্যের মাঝে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তেমনি ভাবে আরবী কবিতাও এর ব্যতিক্রম নয়। জাহিলী, ইসলামী, উমায়্যা, আব্বাসী ও আয়্যুবী মামলূকী যুগের কবিতার মধ্যে যদি পারস্পারিক তুলনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেক যুগের আরবী কবিতার স্বরূপ ও বিষয়বস্তুতে একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।তবে অনেক ক্ষেত্রে কবিতার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুতে সামঞ্জস্য পাওয়া গেলেও শব্দ চয়ন, প্রকাশ ভঙ্গি, ছন্দের রীতি ও উপস্থাপনায় অনেকটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য পাওয়া যায়। খৃষ্ট্রীয় পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে আরবী কবিতা চর্চা চলমান হলেও প্রত্যেক যুগেই কবিতা রচনার লক্ষ্য উদ্দেশ্যে ভিন্নতা ছিল। যেমন জাহিলী যুগে স্বেচ্ছা প্রনোদিত হয়ে কবিরা বিভিন্ন ব্যক্তির বন্দনা ও প্রশংসা করতেন। তারা অবাস্তবতার ব্যসাতি মুক্ত হয়ে সত্য ঘটনার আলোকে কবিতা রচনা করতেন। তাই তাদের কাব্যের ভাষা ছিল সরাসরি এবং তাতে কোন রকম কৃত্রিমতার অনুপ্রবেশ ছিলনা। এ প্রসঙ্গে কবি যুহায়র বিন আবি সুলমা বলেন:[৪৩]

وإن أشعر بيت أنت قائله بيت يقالُ اذا أنشدتهُ صدقا

"তোমার রচিত সবচেয়ে উত্তম কবিতা সেটিই যা শুনে বলা হবে তুমি সত্য বলেছ।"

তেমনি ভাবে ইসলামী উমায়্যা যুগের আরবী কবিতার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামদ্রোহী শক্তির অপবাদের জবাব দেয়ার পাশাপাশি ইসলাম ও মুসলমানদের বিভিন্ন ভালো দিক তুলে ধরা। তবে 'আব্বাসী যুগে এসে আরবী কবিতা চর্চার লক্ষ্য উদ্দেশ্যে বৈপবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কবিতার চর্চার এমন কোন লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু অবশিষ্ট ছিলোনা যা নিয়ে তাঁরা কবিতা রচনা করেননি। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা যদি মিসর ও সিরিয়া ভিত্তিক আয়্যুবী সুলতানদের সূফী তাত্ত্বিক শাসনের ছত্রছায়ায় 'আব্বাসী যুগের কবিতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর দিকে তাকাই তাহলে সূফীতাত্ত্বিক কবিতার ব্যাপক প্রসার দেখতে পাই।[৪৪]

পাদটীকা ও তথ্য-নির্দেশিকা

১ মুহাম্মদ 'আলাউদ্দীন আল-আযহারী, 'আরবী-বাংলা অভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯খ্রি.), খ.২, পৃ.১৪১৪; 'আরবী-বাংলা অভিধান, সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৬খ্রি.), খ.১, পৃ.১০৯৩; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, 'আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান (ঢাকা:রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩খ্রি.), পৃ. ৩৮৬; লূয়িস মালূফ, আল-মুনজিদ ফিল লুগাতি ওয়াল আ'লাম (বৈরূত: দারুল মাশরিক, ১৯৭৩খ্রি.), পৃ.৩০৮; মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ফিরোজাবাদী, আল-কামূসুল মুহীত (কায়রো: দারুল হাদীস, ১৪২৯/২০০৮), পৃ.৭২৫।

২ ইমাম গাযালী, এহয়াউল উলূমিদ্দীন (বৈরূত: দারুল মা'রিফা, তা বি), খ.৪, পৃ.২১৬।

৩ মুফতী 'আমীমুল ইহসান, আত-তা'রিফাতুল ফিকরিয়্যা(করাচী: আস-সাদাত পাবলিশার্স, তা বি), পৃ.৩১৫।

৪ জামাল উদ্দীন আল-বালখী, 'আয়নুল 'ইলম (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা বি), পৃ.১২৬।

৫ ড. 'আবদুল জলীল, 'আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৭৪।

৬ Peter J. Awn,"Sufism", The Encyclopedia of Religion,(Mircea Eliade, NewYork: Macmillan,১৯৮৭ A D, P.s v

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ং।.

৮ ড. হান্না আল-ফাখূরী, আল-জামি' ফি তারিখিল আদাবিল 'আরাবী, আল-আদাবুল কাদীম (বৈরূত: দারুল জীল, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৩২৭-৩৩।

৯ প্রগুক্ত, পৃ. ৩৩০-৩৩।

১০ ড. মুহাম্মাদ মতিউর রহমান, সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা (ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মন্জুরী কমিশন, ২০০৯, খ্রি.), পৃ.১৪৫।

১১ ড. 'আবদুল জলীল, 'আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১২০।

১২ আল-ইমাম 'আলী(রা) ইবন আবী তালিব, দীওয়ান (বৈরূত: দারুল মা'রিফা, ১৪৩৬/২০০৫), পৃ. ৫০।

১৩ ড. শাওকী দায়ফ, তারিখুল আদাবিল 'আরাবী (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৩ খ্রি.), খ.২, পৃ. ৯৩।

১৪ ড. 'আবদুল জলীল, 'আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা(ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৯৭।

১৫ ড. শাওকী দায়ফ, তারিখুল আদাবিল 'আরাবী (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৩ খ্রি.), খ.২, পৃ. ৩৭৪।

১৬ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৩৭৩।

১৭ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৩৭৫।

১৮ ড. শাওকী দায়ফ, তারিখুল আদাবিল 'আরাবী (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৬ খ্রি.), খ.৩, পৃ. ২৩৭-৫৩।

১৯ আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী (কায়রো: মাতবা'আতু দারিল কুতুবিল মিসরিয়্যা, ১৩৬৯/১৯৫০), খ.৪, পৃ.১-১১২।

২০ প্রাগুক্ত, পৃ.৫০-১১০।

২১ আবদুল হক ফরিদী, "আরব কবি আবুল 'আতাহিয়্যা", মাসিক মুহাম্মাদী, ঢাকা,১৩৩৪ বাং, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃ. ২৮১-৮৮; ঐ, "আবুল 'আতাহিয়্যা", সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫ খ্রি., খ.২, পৃ.১০৮-১২।

২২ আবুল 'আতাহিয়্যা, দীওয়ান (বৈরূত : দারু বৈরূত,১৪০৬/১৯৮৬), পৃ.১২৮।

২৩ আল-কুর'আন, ১২:২০।

২৪ Louis Massignon, "যুদ", সম্পাদনা পরিষদ. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৬খ্রি., খ.২১, পৃ.৬৬৯।

২৫ আল-কুর'আন, ৫৭:২৭।

২৬ Louis Massignon, "যুহ্দ", সম্পাদনা পরিষদ. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৬খ্রি., খ.২১, পৃ.৬৬৯।

২৭ Louis Massignon, "তাসাওউফ" সম্পাদনা পরিষদ. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২খ্রি., খ.১২, পৃ.৩৯৩-৪০৬।

২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩-৪০৬।

২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩-৪০৬।

৩০ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৩-৪০৬।

৩১ ড. মুহাম্মাদ যাগলুল সাল্লাম, আল-আদাব ফিল 'আসরিল ফাতিমী (কায়রো: মানশা'আতুল মা'অরিফ, তা বি), পৃ.৩৮৪; ঢ. শাওকী দায়ফ, তারিখুল আদাবিল 'আরাবী, খ.৩, পৃ.৩৫৩-৫৬।

৩২ Louis Massignon, "তাসাওউফ" সম্পাদনা পরিষদ. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২খ্রি., খ.১২, পৃ.৩৯৩-৪০৬

৩৩ প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৩৯৩-৪০৬।

৩৪ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান (বৈরূত: দার সাদির, তা বি), পৃ. ৬৬।

৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬।

৩৬ প্রা, পৃ. ৬৯-৭০।

৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭০।

৩৮ 'অবদুল লতীফ হামযা, আল-হারাকাতুল ফিকরিয়্যা ফী মিসর ফিল 'আসরায়নিল-আয়্যুবী (কায়রো:আল-হায়্যাতুল-মিসরিয়্যা, ২০১৬, পৃ. ১২৩-৩১।

৩৯ Louis Massignon, "তাসাওউফ" সম্পাদনা পরিষদ. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২খ্রি., খ.১২, পৃ.৩৯৩-৪০৬।

৪০ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৩-৪০৬।

৪১ ড. মুহাম্মাদ মতিউর রহমান, সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা(ঢাকা:বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মন্জুরী কমিশন, ২০০৯, খ্রি.), পৃ.১৪৫।

৪২ ড. 'অবদুল লতীফ হামযা, আল-আদাবুল-মিসরী মিন কিয়ামিদ-দাওলাতিল-আয়্যুবীয্যা ইলা মাজিয়িল-হামলাতিল-ফরান্সিয়্যা, (কায়রো: আল-হায়্যাতুল মিসরিয়্যাল-'আম্মা লিল-কুত্তাব, ২০০০ খ্যি.), পৃ.৪৮-১০২।)

৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-১০২।

৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮-১০২।

তৃতীয় অধ্যায়
আবুল ‘আতাহিয়্যার জীবন ও যুহ্দকাব্য

আবুল আতাহিয়্যার জন্ম, শৈশব ও কর্মজীবন

কবি আবুল আতাহিয়্যার প্রকৃত নাম ইসমাঈল, উপনাম বা কুনিয়াত আবু ইসহাক। আবুল আতাহিয়্যা তাঁর উপাধী, যার অর্থ উম্মত্ততার জনক। এনামেই তিনি কাব্য জগতে অমর হয়ে আছেন। কবির পিতার নাম কাসিম। তাঁর উর্ধ্বক্রম বংশধারা হলো, আবু ইসহাক ইসমাঈল ইব্নুল কাসিম ইব্ন সুয়াইদ ইব্ন কায়সান আল আনাযী। কবির মাতার নাম উম্মু যায়িদ বিনতু যিয়াদ আল-মুহারিবী। কবির পরিবার ‘আনাযা’ গোত্রের মিত্র বা মাওয়ালী ছিল। কবির বংশীয় পেশা ছিল নিম্ন মানের। তাঁর পিতা হাজ্জাম (রক্তমোক্ষক) ছিলেন অর্থাৎ তিনি শিঙ্গা লাগাতেন। বংশীয় পেশা নিম্ন শ্রেণির হওয়ায় তিনি সামাজিকভাবে উপেক্ষার পাত্র হয়েছিলেন, যা তাঁর জীবনে যথেষ্ট বিরোপ প্রভাব বিস্তার করে। ফলে, তাঁকে আনাযী বলা হতো। উল্লেখ্য, তাঁর মাতার বংশ ছিল বনু যুহরের মিত্র বা মাওয়ালী। কবি আবুল আতাহিয়্যা হি.১৩০/খ্রি.৭৪৮ কুফার ‘আয়নুত তামার’ নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন এবং এখানেই তিনি বেড়ে উঠেন। কবি নিচু বংশে জন্মে ছিলেন বিধায় তাঁকে বহু মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল। আবুল আতাহিয়্যা নিম্নবংশে জন্ম গ্রহণ করায় সামাজিকভাবে নিগৃহীত হয়েছেন। এক পর্যায়ে তিনি দুনিয়া ত্যাগী হয়ে যুহ্দকবি তথা মরমীকবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সামাজিক উপেক্ষা তাঁর হৃদয় মানসকে তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করে। ফলে তাঁর কাব্যে শাসক ও সম্পদশালী শ্রেণির প্রতি অবজ্ঞা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এক পর্যায়ে তাঁর মাঝে দুনিয়াবিমুখতা তথা যুহদিয়াত এমন প্রভাব ফেলে যে, তিনি হয়ে উঠেন একজন সনামধন্য মরমী কবি। সহজ ভাষা, হ্রস্ব ছন্দ, সরল, অনাড়ম্বর ও স্বাভাবিক লিখনভঙ্গী তাঁকে সমকালীন আরবী সাহিত্য জগতে এমন এক উঁচু স্থানে পৌঁছে দেয় –যা শুধু তাঁর জন্যই শোভা পেয়েছিল।[১]

ابو العتاهية অর্থ ভ্রান্তি, নির্বুদ্ধিতা বা উন্মত্ততার জনক। আবুল আতাহিয়্যা জীবন ও জগৎ থেকে ব্যাপক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। দারিদ্রের কাছে তিনি হার মানেননি। আরবী পদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে আবুল আতাহিয়্যা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি তাঁর অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার মাধ্যমে আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। তাঁর ছিল অনন্য সাধারণ কাব্যপ্রতিভা। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। অফুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্য ও নিরলস সাধনার মাধ্যমে তিনি তাঁর কাব্যপ্রতিভার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হন। বহু ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে স্বীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে তিনি

আত্মপ্রকাশ করেন। সমকালীন রাজন্যবর্গের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। তখন ছিল আব্বাসী খিলাফতের যুগ। খলীফা মাহদী ও হারুনুর রশীদ তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি হয়ে উঠেন দরবারী কবি। আবুল আতাহিয়্যা নিম্নবংশে জন্ম গ্রহণ করেছেন বিধায় সামাজিকভাবে তিনি নিগৃহীত হয়েছেন। সামাজিকভাবে উপেক্ষিত তাঁর হৃদয় মানসকে তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করে। খলীফাদের সুদৃষ্টি তাঁকে বিশাল সম্পদের অধিকারী করলেও তিনি জাগতিক ভোগ বিলাসে গা ভাসিয়ে দেননি। জীবন ও জগতে ছড়িয়ে থাকা অসঙ্গতি ও অভিজাত শ্রেণির ভোগবাদী চরিত্র তাঁকে দুনিয়া বিমুখ করে তুলে। তিনি নির্মাণ করতে থাকেন অসাধারণ সব যুহদ বা তাপস কবিতা। এক সময় তিনি হয়ে উঠেন যুহদ কবিতার প্রতীক।[২]

পরবর্তীতে কাব্য রচনায় শাসক ও সম্পদশালীশ্রেণির প্রতি আবুল আতাহিয়্যার অবজ্ঞা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এক পর্যায়ে তাঁর মাঝে দুনিয়া বিমুখতা তথা যুহদিয়াত এমন প্রভাব ফেলে যে, তিনি হয়ে উঠেন একজন সনামধন্য মরমী কবি। সহজ ভাষাহ্রস্ব ছন্দ, সরল, অনাড়ম্বর ও স্বাভাবিক লিখনভঙ্গী তাঁকে সমকালীন আরবী সাহিত্য জগতে এমন এক উঁচু স্থানে পৌঁছে দেয় –যা শুধু তাঁর জন্যই শোভা পেয়েছিল। একবার কেউ তাঁকে নিম্ন বংশের খোঁটা দিলে তিনি এর জবাব দিয়েছিলেন নিম্নোক্ত পঙক্তির মাধ্যমে:[৩]

ألا إنما التقوي هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والعدم

وليس علي عبد تقي نقيصة، إذا صحح التقوي، وإن حاك أوحجم

"সাধুতাই প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মান, সংসারের প্রতি তোমার লোভ-লালসা কেবল দারিদ্র্য ও অভাব সৃষ্টি করে থাকে; প্রকৃত ধার্মিক ও সাধু ব্যক্তি জোলা বা রক্তমোক্ষক হলেও কোন দোষ তাকে স্পর্শ করতে পারে না।"

কবি অন্যত্র বলেছেন:[৪]

اذا تناسبتِ الرجالُ، فما أري نسبا يقاس بصالح الأعمال

وإذا بحثتُ عن التقي وجدته رجلا، يُصدق قولَه بفعال

"যদিও মানুষ বংশ মর্যাদার গৌরব করে; কিন্তু আমি দেখি, বংশ মর্যাদার গৌরব কখনো সৎকর্মের সাথে তুলনীয় হতে পারে না; আর যখন আমি সাধুতা অন্বেষণ করি তখন আমি এমন মহান ব্যক্তির সন্ধান পাই যার কথা কর্মকে সত্যায়িত করে।"

আরবী পদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে আবুল আতাহিয়্যা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। শৈশবেই কাব্য রচনায় তিনি পারদর্শী হয়ে উঠেন। তিনি তাঁর অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার মাধ্যমে আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন

বিধায় তাঁর বংশ কৌলিন্য ছিলনা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার্জন সম্ভব হয়নি বলে তিনি জীবন ও জগৎ থেকে ব্যাপক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

দারিদ্র্যের কাছে তিনি হার মানেননি। তাঁর ছিল অনন্য সাধারণ কাব্যপ্রতিভা। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। অফুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্য ও নিরলস সাধনার মাধ্যমে তিনি তাঁর কাব্যপ্রতিভার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হন। সমকালীন রাজন্যবর্গের সাথে তার সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। তখন ছিল আব্বাসী খিলাফতের যুগ। খলীফা মাহদী ও হারুনুর রশীদ তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি হয়ে উঠেন দরবারী কবি। খলীফাদের সুদৃষ্টি তাঁকে বিশাল সম্পদের অধিকারী করলেও তিনি জাগতিক ভোগ বিলাসে গা ভাসিয়ে দেননি। বহু ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে স্বীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। জীবন ও জগতে ছড়িয়ে থাকা অসঙ্গতি ও অভিজাত শ্রেণির ভোগবাদী চরিত্র তাঁকে দুনিয়া বিমুখ করে তুলে। একজন কুম্বকার থেকে তিনি ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠেন। এজন্য তাঁকে দীর্ঘ বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। কাব্যশক্তির নিয়মিত পরিচর্যা ও কঠোর সাধনা তাঁকে সমকালীন কাব্যসাহিত্যের অঙ্গনে মর্যার আসনে সমাসীন করেছে। সমকালীন রাজন্যবর্গের সাথে তার সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। তখন ছিল আব্বাসী খিলাফতের যুগ। খলীফা মাহদী ও হারুনুর রশীদ তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি হয়ে উঠেন দরবারি কবি। খলীফাদের সুদৃষ্টি তাঁকে বিশাল সম্পদের অধিকারী করলেও তিনি জাগতিক ভোগ বিলাসে গা ভাসিয়ে দেননি। জীবন ও জগতে ছড়িয়ে থাকা অসঙ্গতি ও অভিজাত শ্রেণির ভোগবাদী চরিত্র তাঁকে দুনিয়াবিমুখ করে তুলে। তিনি নির্মাণ করতে থাকেন অসাধারণ সব যুহদ বা মরমী কবিতা। এক সময় তিনি হয়ে উঠেন যুহদ কবিতার প্রতীক।[৫]

আবুল 'আতাহিয়্যার পেশা ও কর্মজীবন

আবুল আতাহিয়্যার শৈশব কাটে তাঁর পরিবারের সাথেই। দারিদ্র্যের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচীন কাব্য সম্পর্কে তাঁর কোন কিছুই জানা ছিল না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও জীবন ও জগৎ থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষের পেশা ছিল মৃৎপাত্র তৈরি করা। তিনি তাঁর ভাইদের সাথে পারিবারিক মৃৎপাত্র তৈরির কারখানায় কাজ করতেন। এ জন্য তিনি 'আল জাররার' বা কুম্ভকার নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর ভাইদের সাথে সবুজ রঙের মটকা তৈরি করতেন। আবুল আতাহিয়্যা শুধু মৃৎপাত্র তৈরিই করতেন না, তৈরি মৃৎপাত্রগুলো খাঁচি ও জালে করে মাথায় ও পিঠে বহন করে কুফার পথে পথে ও অলিতে গলিতে বিক্রি করতেন। মালামাল ফেরি করার সময় তাঁর মনে কবিতা আবৃত্তির আবেগ

জাগ্রত হতো এবং তখন মনের সুখে তিনি কবিতা আবৃত্তি করতে থাকতেন। এ ছাড়া মৃৎপাত্র তৈরি করার সময়ও তিনি কবিতা আবৃত্তি করতে থাকতেন।[৬]

আবুল আতাহিয়্যার সমসাময়িক বনী 'আজলের মাওয়ালী আব্দুল হামীদ ইব্ন সারীহ' বলেন:[৭]

أنا رأيت أباالعتاهية، وهو جرار يأتيه الأحداث والمتأدبون فينشدهم أشعاره، فيأخذون ما تكسر من الخزف فيكتبونها فيها.

"আমি দেখেছি আবুল আতাহিয়্যা যখন কুম্ভকারের কাজ করতেন তখন তরুণ কাব্যপ্রেমিক শিক্ষাথীরা তাঁর নিকট যেতো। তিনি কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং তারা ভগ্ন মৃৎপাত্রের উপর তা লিখে নিতো।"

খলিল ইবনে আসাদ বলেন, 'আবুল আতাহিয়্যা আমাদের নিকট আসার অনুমতি চাওয়ার সময় বলতেন':[৮]

انا ابو اسحاق الخزان

"আমি আবু ইসহাক কুম্ভকার।"

মৃৎপাত্র তৈরি করার বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন:[৯]

انا جرار القوافي واخي جرار التجارة

"আমি ছন্দের কারিগর আর আমার ভাই(যায়দ) মৃৎপাত্র ব্যবসায়ের কারিগর।"

আব্বাসী খলীফাদে দরবারে কবি হিসেবে তাঁর মর্যাদা

আবুল আতাহিয়্যা স্বীয় কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী ও সচেতন ছিলেন। সে সময় বাগদাদ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু। মাওসিলবাসী ইবরাহীমের সাথে তিনি কুফা থেকে বাগদাদ পৌঁছেন। অতঃপর তিনি হীরাতে অবস্থান করতে থাকেন। এখানে তাঁর কাব্য সাধনা চলতে থাকে। চারদিকে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তখন ছিল আব্বাসীদের শাসনামল। খিলাফতের আসনে সমাসীন ছিলেন খলীফা মাহদী বিন মানসুর। মাহদী যেমন ছিলেন প্রজাবৎসল তেমনি সাহিত্যামোদী। আবুল আতাহিয়্যার সুখ্যাতি মাহদীর দরবারে পৌঁছালে তিনি তাঁকে ডেকে পাঠান। কবি বাগদাদ গমন করেন এবং খলীফা মাহদীর স্তুতিমূলক কবিতা পাঠ করে তাকে মুগ্ধ করে দেন। আবুল আতাহিয়্যার কাব্য প্রতিভায় বিমুগ্ধ খলীফা তাকে পুরস্কৃত করেন। অতঃপর কবি বাগদাদেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। খলীফা হাদী, হারুনুর রশীদ, আমীনুর রশীদ ও মামুনুর রশীদ-এর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁরা সকলেই কবির গুণমুগ্ধ ছিলেন। আবুল আতাহিয়্যা খলীফা হাদীর আমলে যুহদ কবিতার সূচনা করেন। পরবর্তীতে হারুনুর রশীদের আমলে কবিতা আবৃত্তি বন্ধ করেদেন। কিন্তু খলীফা তাকে বন্দী করে রাখেন এবং কবিতা আবৃত্তি না করার কারণে

ষাটটি বেত্রাঘাতের নির্দেশদেন। এক পর্যায়ে কবি নতিস্বীকার করেন এবং কবিতা আবৃত্তির অঙ্গীকার করে বন্দীশালা থেকে মুক্তি পান। এরপর তিনি কবিতা আবৃত্তি আর কখনো বন্ধ করেননি। আমৃত্যু কবিতাই ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। কবিতা রচনা আর আবৃত্তি ছাড়া আবুল আতাহিয়্যা আর কোন কাজ করেননি। এমন কি তার প্রয়োজনও ছিল না। কেননা, জীবন ধারনের জন্য এটিই ছিল তাঁর উপযোগী। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাঁর জন্য মাসিক ভাতা ধার্য করা ছিল পঞ্চাশ হাজার দিরহাম। এ ছাড়া খলীফা আমীর-ওমরাদের পক্ষ থেকে উপঢৌকন তো ছিলই। খলীফা হারুনুর রশিদের সাথে কবির অনন্য সাধারণ সম্পর্ক ছিল। খলীফা তাঁকে খুবই সম্মান করতেন।[১০]

হাম্মাদ ইবন ইসহাক বলেন:[১১]

"একদা খলীফা দুই পাতা কাগজ নিয়ে আমাদের নিকট এলেন। এক পাতা কাগজ তাঁর ছেলের গৃহ শিক্ষককে দিয়ে বললেন, তা যেন তাঁর ছেলেকে কণ্ঠস্থ করানো হয়। অপর পাতা আমার হাতে দিয়ে তাতে সুরারোপ করার জন্য বললেন।"

আবুল আতাহিয়্যা হারুনুর রশীদের গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি খলীফাকে ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী ও সাহায্যকারী হিসেবেই জানতেন। এ মর্মে তাঁর রচিত কবিতার নিম্নোক্ত পঙক্তিগুলো প্রণিধানযোগ্য:[১২]

إذا نُكبَ الإسلامُ يوما بنكبةٍ فهارونُ من بين البرية ثائرُه

ومن ذا يفوتُ الموتَ والموتُ مدركٌ كذا لم يفت هارونَ ضدٌ ينافرُه

''কোন দিন যদি ইসলাম বিপন্ন হয়, তাহলে সকল সৃষ্টির মধ্য থেকে হারুনই হবেন এর সাহয্যকারী; এমন কেউ নেই যাকে মৃত্যু পাবেনা, মৃত্যু অবশ্যই তার সাথে সাক্ষাত করবে, এমনিভাবে হারুনের বিরোধীরাও তাঁর সাক্ষাত পাবে।" কবি হারুনুর রশীদকে শান্তি ও করুণার প্রতিবিম্ব হিসেবে আখ্যায়িত করেন। সেই সাথে মহান করুণাময় আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করেন যে, যাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং কিয়ামত দিবসে শান্তির ফয়সালা করেন। যেমন কবি বলেন:[১৩]

إنما أنت رحمة وسلامةْ زادك الله غبطة وكرامةْ

لو توجعت لي فروحت عني روح الله عنك يوم القيامةْ

"আপনি তো দয়া ও শান্তির মূর্ত প্রতীক। আল্লাহ আপনার সুখ-শান্তি ও মর্যাদা বাড়িয়ে দিন। আপনি যদি আমার জন্য সদয় হন অতঃপর আমার শান্তির ব্যবস্থা করেন তবে কিয়ামতে আল্লাহ আপনার শান্তির ব্যবস্থা করবেন।" কবিতাটি শুনে খলীফার মন গলে গেল। তিনি কবিকে কারামুক্ত করে দেন।[১৪]

কবি হিসাবে আবুল 'আতাহিয়্যার আত্মবিশ্বাস

আবুল আতাহিয়্যা স্বীয় কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী ও সচেতন ছিলেন। সে সময় বাগদাদ ছিল জ্ঞান-

বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু। মাওসিলবাসী ইবরাহীমের সাথে তিনি কুফা থেকে বাগদাদ পৌঁছেন। অতঃপর তিনি হীরাতে অবস্থান করতে থাকেন। এখানে তাঁর কাব্য সাধনা চলতে থাকে। চারদিকে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তখন ছিল আব্বাসীয়দের শাসনামল(৭৫০-১২৫৮ খ্রী.)। খিলাফতের আসনে সমাসীন ছিলেন খলীফা মাহদী বিন মানসুর(৭৭৫-৭৮৫খ্রী.)। মাহদী যেমন ছিলেন প্রজাবৎসল তেমনি সাহিত্যামোদী। আবুল আতাহিয়্যার সুখ্যাতি মাহদীর দরবারে পৌঁছলে তিনি তাঁকে ডেকে পাঠান। কবি বাগদাদ গমন করেন এবং খলীফা মাহদীর স্তুতিমূলক কবিতা পাঠ করে তাকে মুগ্ধ করে দেন। আবুল আতাহিয়্যার কাব্য প্রতিভায় বিমুগ্ধ খলীফা তাঁকে পুরস্কৃত করেন। অতঃপর কবি বাগদাদেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। খলীফা মাহদী, হাদী, হারুনুর রশীদ, আমীনুর রশীদ ও মামুনুর রশীদ-এর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁরা সকলেই কবির কাব্য প্রতিভায় বিমুগ্ধ ছিলেন।আবুল আতাহিয়্যা খলীফা হাদীর আমলে যুহদ কবিতার সূচনা করেন। পরবর্তীতে হারুনুররশীদ- এর আমলে কবিতা আবৃত্তি বন্ধ করে দেন। কিন্তু খলীফা তাঁকে বন্দী করে রাখেন এবং কবিতা আবৃত্তি না করার কারণে ষাটটি বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেন। এক পর্যায়ে কবি নতি স্বীকার করেন এবং কবিতা আবৃত্তি করার অঙ্গীকার করে বন্দীশালা থেকে মুক্তি পান। এরপর তিনি কবিতা আবৃত্তি আর বন্ধ করেননি। আমৃত্যু কবিতাই ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। কবিতা রচনা আর আবৃত্তি ছাড়া আবুল আতাহিয়্যা আর কোন কাজ করেননি। এমন কি তার প্রয়োজনও ছিল না। কেননা, জীবন ধারনের জন্য এটিই ছিল তাঁর উপযোগী। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাঁর জন্য মাসিক ভাতা ধার্য করা ছিল পঞ্চাশ হাজার দিরহাম। এ ছাড়া খলীফা ও আমীর-ওমরাদের পক্ষ থেকে উপঢৌকন তো ছিলই।[১৫]

আবুল 'আতাহিয়্যার মৃত্যু

আবুল আতহিয়ার মৃত্যুর তারিখ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কারো মতে খলীফা মামূনুর রশীদের খিলাফত কালে আবুল 'আতাহিয়্যা, ইব্রাহীম আল-মূসিলী ও আবূ 'আমর আবদুস সালাম আশ-শায়বানী একই দিন ২১০/ ৮২৫ সালে মৃত্যু বরণ করেন। আবার কারো মতে আবুল 'আতাহিয়া, রাশিদ আল-খান্নাক ও হাশীমাতুল খাম্মার একই দিন ২১৯ /৮২৫ সালে মৃত্যু বরণ করেন। তবে, অধিকাংশের মতে হি.২১১ /খ্রি.৮২৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল

৮০ বছর। এ সময় খলীফা মামুনুর রশীদ(৮১৩-৮৩৩খ্রি.) খিলাফতের মসনদে আসীন ছিলেন। বাগদাদের পশ্চিম উপকণ্ঠে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর পূর্বে তঁর রচিত সর্বশেষ কবিতা হলো:[১৬]

إلـــهي لا تُـعذبْني، فــإنــي   مقــرٌ بـالــذي قــدْ كــان منــي

ومـا لي حـيـلـةٌ، إلا رَجـائي،   وعـفـوُك، إن عفوْتَ، وحسنُ ظني

"ওহে আমার প্রভু! আমাকে শাস্তি দিওনা, আমি যেসব অপরাধ ও পাপ করেছি তা অকাতরে স্বীকার করছি; তোমার ক্ষমার আশা ব্যাতীত আমার কোন উপায় নেই, আমার সেই শুভ আশা অনুসারে ক্ষমা কর।"

আবুল 'আতাহিয়্যার এক ছেলে ও তিন মেয়ে ছিলো। ছেলে মুহাম্মদ তিনিও কবি ছিলেন। তাঁর রচিত কবিতা হলো:[১৭]

قـدْ أفلـحَ السالـمُ الصمُـوتُ   كـلامُ راعي الـكلامِ قُـوْتُ

مَـا كُلُ نُطْـقٍ لـه جـوابٌ   جـوابُ مَـا يُكْـرهُ السكُـوْتُ

"নিরাপদে নিরব ব্যাক্তি আবশ্যই সফল হয়েছে, কথা রক্ষাকারীর কথা শক্তিশালী উপজিব্য; সবধরণের বাক্যেও কোনো উত্তর নেই, তবে অপছন্দনীয় কথার প্রতিউত্তর হলো নিরবতা"।

আবুল 'আতাহিয়্যার তিন মেয়ে ছিলো নাম-রুকায়্যা, লিল্লাহ ও বিল্লাহ। মৃত্যুশয্যা কবি তাঁর মেয়ে রুকায়্যাকে নিম্নের কবিতায় তাঁর শোকগাঁথা রচনার আদেশ করেন:[১৮]

لَـعِـبَ الـبِـلَى بِـمَـعَالمى ورُسُـومى   وقُـبِـرْتُ حَيًا تحت ردمِ هُمُـومىْ

لــَزِمَ الـْبِـلَى جسمى فَـأَوْهَـنَ قـُوتِىْ   إن الـبـلى لَمُـوكـلٌ بـلـُزُوْمىْ

"দুর্যোগ আমার প্রতীকী চিহ্নসমূহ ও নিদর্শনসমূহের সাথে কৌতুক করেছে, আমার চিন্তা-চেতনাসমূহের বাধার নীচে আমাকে জীবীত কবর দেয়া হয়েছে; আমার শরীরে জীর্ণতা অবস্থান করেছে বিধায় আমার শক্তি দুর্বল করেছে, প্রকৃতপক্ষে দুর্যোগ আমার সাথে অপরিহায়ভাবে নিয়োজিত"।

কবি আবুল 'আতাহিয়্যা তাঁর কবরের উপর তাঁর রচিত পাঁচ চরণের নিম্নের কবিতাটি লিখার জন্য তাঁর পুত্র মুহাম্মদকে অসিয়ত করে যান:[১৯]

أُذْنَ حَــيٍ تَـسَمَـعِـيْ،   اِسْـمَعِيْ ثُـم عِـيْ، وَعِـيْ

أَنــا رَهْـنٌ بِـمَضْـجَـعِيْ،   فَـاحْـذَرِيْ مِثْـلَ مَصْـرَعِـيْ

" ওহেএকজন জীবিত ব্যক্তির কান! মনোযোগদিয়ে শোনো, শোনো আবার সতর্কতার সাথে অনুধাবন কর; আমি আমার কবরের জামানত, সুতরাং আমার মত কারোর মৃত্যু থেকে সতর্ক হও"।

আবুল আতাহিয়্যার যুহদ কবিতা রচনার পটভূমি

আবুল আতাহিয়্যা এমন এক পরিবারে জন্মেছিলেন, যার সামাজিক মর্যাদা ছিল না। এতে করে কবি শিশু বয়সেই নানাবিধ সমাজিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হন। শ্রেণি বৈষম্যের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে, নানাবিধ লাঞ্ছনা আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর শিশু হৃদয়ে ঝড় বয়ে যায়। এ ঝড়ই তাকে ভাব জগতের রাজপুত্র হিসেবে তৈরি করে। তিনি নির্মাণ করতে থাকেন অজস্র পঙক্তিমালা। এতে তাঁর হৃদয় নিকুঞ্জে লুকিয়ে থাকা যন্ত্রণা কিছুটা

লাঘব হয়। এভাবেই এক সময় তিনি হয়ে উঠেন উদীয়মান কবি। অতঃপর তিনি যখন বাগদদে আসেন, খলীফা মাহদীর বাঁদী 'উতবার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। উদ্ভীন্ন যৌবনা-সুন্দরী এ রমনীর অপরূপ সৌন্দর্যে তিনি বিমোহিত হয়ে পড়েন। তাকে নিয়ে তিনি নির্মাণ করতে থাকেন অসাধারণ গযল(প্রেমকাব্য) কবিতা। কিন্তু অনন্য সাধারণ সৌন্দর্যের আঁধার 'উতবা কবির প্রণয়ে সাড়া দেননি। কবি বেচাইন হয়ে পড়েন। প্রিয়ার প্রত্যাখ্যান তাঁর হৃদয়ের বহ্নিশিখা আরো বাড়িয়ে দেয়। ব্যর্থ প্রেমের এ যন্ত্রণা তাঁকে দুনিয়া বিমুখ করে তুলে। তিনি হয়ে উঠেন 'যুহদ' কবিতার খ্যাতিমান কবি। তার কবিতার সাথে যুক্ত হয় তদানীন্তন দরবারি ও অভিজাত শ্রেণির ভোগ বিলাস, দুর্নীতি ও ধর্মের প্রতি উদাসীনতার বিষয়। শাসক শ্রেণির এহেন অনৈতিক কার্যকলাপ তিনি খুব কাছে থেকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করে ব্যাথিত ও মর্মাহত হন। বিদগ্ধ কবি রচনা করতে থাকেন– ধর্ম নিষ্টা, পার্থিব জীবনের অসারতা, মৃত্যুর চিরন্তন সত্যতা, কালের কুটিলতা, পরকালের পূণ্য সঞ্চয়, মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের ভয়াবহতা প্রভৃতি বিষয়ক কবিতা। যুহদ কবিতায় তার সফলতা প্রত্যক্ষ করে আরো অনেকে এতদ বিষয়ক কবিতা রচনায় এগিয়ে আসেন। এ ক্ষেত্রে কবি আবু নুওয়াসের নাম প্রণিধানযোগ্য। তিনি প্রথম জীবনে জন্মভূমিতে অবস্থান করলেও যুবক বয়স থেকে আমৃত্যু বাগদাদেই কাটান। তিনি দীর্ঘ ৮০ বছর হায়াত পেয়েছিলেন এবং দীর্ঘ সময় কবিতাই রচনা করে গিয়েছেন।[২০]

শুধু রচনার আধিক্যে নয় –অনুপম রচনাশৈলী ও মানের কারণেই তিনি বিখ্যাত কবি হিসেবে পরিগণিত হন। তাঁর এসব কবিতা সমকালে এতো জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, তিনি একাগ্রচিত্তে এ জাতীয় কবিতা রচনায় ব্যাপৃত থাকেন এবং সুখ্যাতি অর্জন করেন। আবুল আতাহিয়্যার আবির্ভাব খলীফা মাহদীর শাসনামলে–এসময় তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। অতঃপর খলীফা হাদী, হারুনুর রশীদ, আমীনুর রশীদ ও মামুনুর রশীদের শাসনকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। সুদীর্ঘজীবনে তিনি শুধু কাব্যই রচনা করেছেন। এতে করে তিনি অর্জন করেছেন সুনাম, সুখ্যাতি ও খলীফাগণ কর্তৃক অঢেল সম্পদ। প্রথম জীবনে গযলসহ বিভিন্ন ধরণের কবিতা লিখলেও পরিণত বয়সে

বিশেষ করে শেষ বয়সে মরমী কবিতাই শুধু রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন খুবই ধার্মিক মানুষ। যদিও কেউ কেউ তাকে যিন্দিকের অপবাদ দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর জীবন ধারা ও বিশাল সাহিত্য সম্ভারে এ অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি। বরং আল্লাহর উপর অবিচল বিশ্বাস ও আস্থা, একত্ববাদ, স্রষ্টার প্রশংসা, তাওবা, অনুতাপ, রাসূল (স.)-এর প্রতি ভালোবাসা, সম্মান, প্রশংসা এবং দুনিয়া বিমুখ কবিতা রচনার মাধ্যমে ধর্মভীরু একজন মুত্তাকী যাহেদ মানুষ হিসেবেই আমরা তাকে পাই। কবি আবুল আতাহিয়্যা ছিলেন সাদা মনের অধিকারী এক দিব্য পুরুষ। তিনি তাঁর দোষ-ত্রুটি অপকটে স্বীকার করে নিতেন। শেষ জীবনে তিনি নির্জনতাকে বেশি করে আঁকড়ে ধরেছেন। তাওবা ইস্তিগফার আর ইবাদাতের মধ্যেই তিনি সময় অতিবাহিত করেছেন। তিনি স্বভাব কবি ছিলেন। সংসারের সবকিছু ছেড়ে দিলেও কবিতা তিনি ছাড়েননি।[২১]

তবে কবির শেষ জীবনের কবিতাগুলি ছিল পরকালের মুক্তি ও নাজাতের উসিলা স্বরূপ। সে সময়কার যুহদ কবিতাগুলো কবির গভীর ধর্মীয় মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তিনি প্রথম জীবনে জন্মভূমিতে অবস্থান করলেও যুবক বয়স থেকে আমৃত্যু বাগদাদেই কাটান। তিনি দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন এবং দীর্ঘ সময় কবিতাই রচনা করে গিয়েছেন। শুধু রচনার আধিক্যে নয় –অনুপম রচনাশৈলী ও মানের কারণেই তিনি বিখ্যাত কবি হিসেবে পরিগণিত। আবুল আতাহিয়্যার আবির্ভাব খলীফা মাহদীর শাসনামলে–এসময় তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। অতঃপর খলীফা হাদী, হারুনুর রশীদ, আমীনুর রশীদ ও মামুনুর রশীদের শাসনকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কবি আবুল আতাহিয়্যা ছিলেন সাদা মনের অধিকারী এক দিব্য পুরুষ। তিনি তাঁর দোষ-ত্রুটি অপকটে স্বীকার করে নিতেন। শেষ জীবনে তিনি নির্জনতাকে বেশি করে আঁকড়ে ধরেছেন। তাওবা ইস্তিগফার আর ইবাদাতের মধ্যেই তিনি সময় অতিবাহিত করেছেন। সংসারের সবকিছু ছেড়ে দিলেও কবিতা তিনি ছাড়েননি। তবে শেষ জীবনের কবিতাগুলি ছিল পরকালের মুক্তি ও নাজাতের উসিলা স্বরূপ। সে সময়কার যুহদ কবিতাগুলোতে কবির গভীর ধর্মীয় মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। শেষ বয়সে কবি সংসারের যাবতীয় ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হয়ে যান।[২২]

ألا كُل مولُودٍ، فللموت يُولدُ، ولستُ أري حيًا لشيءٍ يُخَلدُ

تجردْ من الدنيا، فإنك إنما سقطتَ إلى الدنيا، و أنت مُجردُ

"জেনে রেখো! প্রত্যেক নবজাতক মৃত্যুর জন্য জন্মগ্রহণ করে থাকে, আর আমিতো কোনো জীবীত বস্তকে চির জীবি হতে দেখিনা; দুনিয়ার ঝামেলা থেকে মুক্ত হও, তুমি একাকীই এদুনিয়ায় আগমন করেছ।"

আবুল ‘আতাহিয়্যা রচিত কবিতায় দেখা যাচ্ছে :[২৩]

আমরা কবির ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি তাঁর কাব্যে লক্ষ্য করেছি। এর পরিমাণ এতো বেশি যে তাঁকে কোনভাবেই ধর্ম বিষয়ে উন্নাসিক ভাবতে পারি না। ধর্মনিষ্ঠ, মৃত্যু, সন্তোষ, কালের কুটিল গতি- এসব বিষয় নিয়ে তিনি অধিক কবিতা রচনা করেছেন। তিনি সর্বদাই আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন, এনশ্বও সংসার চিরন্তন নয়।এটা শুধু দুই দিনের পান্থশালা। আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই কবি আবুল আতাহিয়্যা ছিলেন আব্বাসী যুগের ইসলামী সূফী ভাবধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুহ্দ কবি।

আবুল আতাহিয়্যা গণমানুষের কবি

কবি আবুল আতাহিয়্যা গণমানুষের ও স্বভাব কবি ছিলেন। সহজ-সরল ও ধর্মীয় সুরের আবর্তে রচিত তাঁর কবিতা মাজী-মাল্লা, কামার-কুমার, সাধারণ ও অসাধারণ ব্যাক্তিদের মুখে মুখে প্রচলিত রয়েছে। প্রভাবশালী

আব্বাসী খলীফার দরবারে অবস্থান করেও তিনি সাধারণ মানুষের কাতারে ছিলেন। দরবারি কবির বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে ছিল না বরং তাঁর কাব্যে ভোগ বিলাসের বিপরীত বক্তব্যই পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে গযল বা প্রেমকাব্য রচনা করে পারদর্শীতা অর্জন করলেও শেষ জীবনে যুহদিয়াত বা মরমী কবিতা রচনায় ছিল তাঁর মূলঅবস্থান। কবির কবিতাই তাঁর স্বভাব, প্রকৃতি বা চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে সমকালীন সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফীসাধক বা মরমী কবি হিসেবেই পেয়েছি। উন্নত নৈতিক চরিত্র তাঁর ব্যক্তিত্বকে সুমহান করে তুলেছিল। এ জন্য তিনি আজও দুনিয়াবিমুখ সুফীকবি হিসেবেই পরিচিত। তিনি ছিলেন ইসলামের খুবই ধার্মিক কবি। যদিও কেউ কেউ তাঁকে যিন্দিকের অপবাদ দিয়েছিল। তাঁর বিশাল কাব্যভান্ডারে এঅপবাদ পাওয়া যায়নি। বরং মহান অল্লাহর একত্বের উপর অবিচল বিশ্বাস ও আস্থা, স্রষ্টার প্রশংসা, তাকওয়া, তাওবা, অনুতাপ, রাসূলুল্লাহ(স.) এর প্রতি ভালোবাসা, সম্মান প্রদর্শন, প্রশংসা এবং যুহ্দ বা দুনিয়াবিমুখ কবিতা রচনার মাধ্যমে ধর্মভীরু একজন সূফী-যাহিদ মানুষের কবি হিসাবে আমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। আবুল আতাহিয়্যার আবির্ভাব আব্বাসী খলীফা মাহদীর শাসনামলে। এসময় তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা রচনা শুরু করেন। খলীফা হাদী, হারুনুর রশীদ, আমীনুর রশীদ ও মামুনুর রশীদের খিলাফত পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। সুদীর্ঘ ৮০ বছরের এজীবনে তিনি সর্ব সাধারণের জন্য আজীবন কবিতা রচনা করে গিয়েছেন এবং গণমানুষের কবি হিসাবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে সামর্থ হয়েছেন। মোটকথা, কবি নিজে ছিলেন মিতব্যয়ী আর মিতব্যয়ীতার আশ্রয়ে গণমানুষের জন্য কবিতা রচনা করেছেন এবং অন্যদের প্রতি মিতব্যয়িতার উপদেশপ্রদান করতেন। আমরা তাতে কৃপণতা দেখছি না, বরং কবি আবুল আতাহিয়্যা অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন।[২৪]

সাহিত্য জীবন ও কাব্য রচনার উন্মেষ

আবুল আতাহিয়্যা এমন এক পরিবারে জন্মেছিলেন, যার সামাজিক মর্যাদা ছিল না। এতে করে কবি শিশু বয়সেই নানাবিধ সমাজিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হন। শ্রেণী বৈষম্যের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে, নানাবিধ লাঞ্ছনা আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর শিশু হৃদয়ে ঝড় বয়ে যায়। এ ঝড়ই তাকে ভাব জগতের রাজপুত্র হিসেবে তৈরি করে। তিনি নির্মাণ করতে থাকেন অজস্র পঙক্তিমালা। এতে তাঁর হৃদয় নিকুঞ্জে লুকিয়ে থাকা যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব হয়। এভাবেই এক সময় তিনি হয়ে উঠেন উদীয়মান কবি। অতঃপর তিনি যখন বাগদাদ আসেন, খলীফা মাহদীর বাদী উতবার সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। উদ্ভীন্ন যৌবনা-সুন্দরী এ রমনীর অপরূপ সৌন্দর্যে তিনি বিমোহিত হয়ে পড়েন। নির্মাণ করতে থাকেন অসাধারণ গযল বা প্রেমকাব্য। কিন্তু অনন্যসাধারণ সৌন্দর্যের আঁধার উতবা কবির প্রণয়ে সাড়া দেননি। কবি বেচাইন হয়ে উঠেন। প্রিয়ার প্রত্যাখ্যান তাঁর হৃদয়ের বহ্নিশিখা আরো বাড়িয়ে দেয়। ব্যর্থ প্রেমের এ যন্ত্রণা তাঁকে দুনিয়া বিমুখ করে তুলে। তিনি হয়ে উঠেন 'যুহদ' কবিতার খ্যাতিমান কবি। সেই সাথে যুক্ত হয় তদানীন্তন দরবারী ও অভিজাত শ্রেণির ভোগ বিলাস, দুর্নীতি ও ধর্মের প্রতি উদাসীনতা। শাসক শ্রেণির এহেন অনৈতিক কার্যকলাপ তিনি খুব কাছে থেকে অন্তদৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করে ব্যাথিত ও মর্মাহত হয়েছেন। বিদগ্ধ কবি রচনা করতে থাকেন– ধর্ম নিষ্টা, পার্থিব জীবনের অসারতা, মৃত্যুর চিরন্তন সত্যতা, কালের কুটিলতা, পরকালের পূণ্য সঞ্চয়, মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের ভয়াবহতা প্রভৃতি বিষয়ক কবিতা। তাঁর এসব কবিতা সমকালে এ গুলো এতো জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, তিনি একাগ্রচিত্তে এ জাতীয় কবিতাই রচনায় ব্যাপৃত থাকেন এবং সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি প্রথম জীবনে জন্মভূমিতে অবস্থান করলেও যুবক বয়স থেকে আমৃত্যু বাগদাদেই কাটান। তিনি দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন এবং দীর্ঘ সময় কবিতাই রচনা করে গিয়েছেন। শুধু রচনার আধিক্যে নয় –অনুপম রচনাশৈলী ও মানের কারণেই তিনি বিখ্যাত কবি হিসেবে পরিগণিত। আমরা কবির ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি তাঁর কাব্যে লক্ষ্য করেছি। এর পরিমাণ এতো বেশি যে তাঁকে কোনভাবেই ধর্ম বিষয়ে উন্নাসিক ভাবতে পারি না। আমরা নির্ভরযোগ্যতার সাথে বলতে পারি যে, কবি আবুল আতাহিয়্যা ছিলেন একজন ইসলামী ভাবধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুহ্দ বা মরমীকবি।[২৫]

আবুল আতাহিয়্যা রচিত যুহদ কবিতার বিষয়বস্তু

আবুল আতাহিয়্যা সেই শিশুকাল থেকে আমৃত্যু নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কাব্য রচনা করে গিয়েছেন। তিনি অনেক সময় মুখে মুখে কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর এতো কবিতা যে, তা পূর্ণ সংরক্ষণ বা সংকলন সম্ভব হয়নি। আন্দালুসিয়া মুসলিম স্পেনের খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ ও ধর্মতত্ত্ববিদ ইব্ন

আবদিল বার (রহ.) আবুল আতাহিয়্যার ধর্ম বিষয়ক (زهديات) কবিতা সমূহের একটি সংকলন তৈরি করেছিলেন। কবির বন্ধু ইব্রাহীম আল মাওসিলী তাঁর বহু কবিতার সুরারোপ করেন। এগুলো বহু শহর ও গ্রামে গাওয়া হয়ে থাকে।আবুল আতাহিয়্যার কবিতায় যুহদ বেশি পরিমাণে থাকলেও অন্যান্য বিষয়েও তিনি কাব্য রচনা করেছেন। প্রথম জীবনে তিনি কিছু গযল বা প্রেমের কবিতা রচনা করেছেন। প্রেয়সী উৎবাকে নিয়ে রচিত সেসব কবিতা মানোত্তীর্ণও হয়েছে। শৈশব থেকে কবি দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছেন। তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করেছেন কালের কুটিলতা, দুঃখ-যন্ত্রণা আর মিথ্যার বাগাড়ম্বর। তাঁর সাথে যুক্ত হয়েছে প্রেয়সীকে হারানোর অসহ্য যন্ত্রণা। জীবন ও জগতে ছড়িয়ে থাকা অসঙ্গতি কবি হৃদয়কে ব্যথিত করেছে। শাসক ও অভিজাত শ্রেণির আস্ফালন ও ভোগবাদী চরিত্র তাঁকে ভোগ-বিলাস থেকে বিমুখ করেছে। চিরন্তন ও অনিবার্য মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরের জীবনের বিভীষিকা কবি হৃদয়কে ভীত সন্ত্রস্ত করেছে। কবির উপলব্ধি মহান স্রষ্টা আল্লাহর নিকটই মানব জাতির শেষ প্রত্যাবর্তন। ফলে আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে সন্তুষ্টি অর্জন করে নেওয়া বাঞ্চনীয়। উপর্যুক্ত বিষয় সমূহ তাঁর কাব্যে আলোচিত হয়েছে। এসব বিষয়কে মোটা দাগে যুহদিয়াত বলা চলে। অর্থাৎ কবির গযল বিষয়ক কবিতা বাদ দিলে আর যেসব বিষয়ের উপর তিনি কবিতা লিখেছেন সেগুলো অবশ্যই মরমী কবিতার আওতাভূক্ত।[২৬]

বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে কবি যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আবহমান কাল ধরে বয়ে আসা প্রাচীন সাহিত্যের বিষয় সমূহ বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে নতুন বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। এক পর্যায়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে কম রস পূর্ণ যুহদ কবিতা দিয়েই তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর বিরল প্রতিভা, নিরলস সাধনা ও অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি প্রধান নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। ধর্মতাত্ত্বিক এসব কবিতার মাধ্যমে তিনি জাতিকে বার্তা পাঠিয়েছেন – শুদ্ধতা, সততা, তাকওয়াহ, সৎকর্মই গৌরবের বিষয়; বংশ গরিমা, আভিজাত্য, উচ্চ পদস্থ কর্মজীবন শ্রেষ্ঠত্বের কোন বিষয় নয়। দুনিয়াই শেষ ঠিকানা নয়; অনিবার্য মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আখিরাতে পদার্পন করতে হবে। আর জবাবদিহিতার কঠিনতম স্থান এই আখিরাত। সেখানে যে ব্যক্তি

মুক্তি অর্জন করবে সেই সফল। এই সফলতার স্বাদ সে অনিঃশেষ কাল ধরে ভোগ করতে থাকবে। আর এ জন্য প্রয়োজন অল্পে তুষ্টি, সৎ জীবন-যাপন. ধৈর্য ও সহনশীলতা, তাওবা ও ইস্তিগফার সর্বোপরি মহান স্রষ্টার নির্দেশ ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উত্তম আদর্শ অনুসরণ। এ ভাবেই তাঁর কবিতা মরমী কবিদের পথিকৃৎ হয়ে উঠে।[২৭]

আবুল আতাহিয়্যা বিরচিত যুহ্‌দ কবিতার বিষয়বস্তু

কবির কবিতাসংকলন দীওয়ান নিরবিচ্ছিন্ন পর্যালোনা করে আমরা তাঁর যুহ্‌দ কবিতার বিষয়বস্তুগুলো নিম্মলিখিতভাবে চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হয়েছি:

১. মহান আল্লাহর একত্ব

একদিন আবুল আতাহিয়্যা নুশহানবাসী খলীল ইব্‌ন আসাদের নিকট গিয়ে বলেন, "লোকে আমাকে অধার্মিকতার অপবাদ দেয়, অথচ আমার ধর্ম সত্য সনাতন তাওহীদ।" জবাবে খলীল বললেন, "তাহলে আপনি এমন কিছু বলুন যা দ্বারা লোকজনের অভিযোগ খণ্ডণ করা যায়।" তখন আবুল আতাহিয়্যা বললেন:[২৮]

ألا إننـــا كـلــنـا بـائــدُ،   وأي بـني آدمٍ خـالـدُ؟

وبـدؤُهُــم كـان مـن ربهم،   وكـلّ إلى ربـــه عـائـدُ

"আমাদের সকলকে মৃত্যুর পর যেতে হবে। কোন আদম সন্তান অমর নয়; তাদের শুরু ছিলো বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের নিকট থেকে এবং সকলকেই তাঁর নিকট আবার ফিরে যেতে হবে।"

কবি এসম্পর্কে আরো বলেন:[২৯]

ولـلـه في كل تحـــريكـةٍ،   وفى كل تسكينـةٍ شاهدُ

وفـي كـــل شيءٍ لــه آيــةٌ   تـدل علي أنــه الـواحدُ

"প্রত্যেক গতি ও স্পন্দন এবং নিরব নিস্তদ্ধতা ও নিথরতারই যে সর্বদা আল্লাহর সাক্ষ্য রয়েছে; প্রত্যেক বস্তুতেই তাঁর নিদর্শন আছে যা সাক্ষ্য দেয় যে তিনি একক।"

২. মহান আল্লাহর প্রশংসায় কবিতা

কবি শুধু মাত্র আল্লাহর একত্ববাদের গানই গাননি তিনি মহান স্রষ্টার প্রশংসায় তার হৃদয়ের অর্গল খুলে দিয়ে বলেছেন:[৩০]

كــل يــومٍ يـأتي بــرزقٍ جـديـدٍ،   مـن مـليكٍ لـنـا غنيٍ، حـميـدِ

قـاهـرٍ، قـادرٍ، رحـيمٍ، لـطـيفٍ،   ظـاهـرٍ، بـاطـنٍ، قـريـبٍ، بعيــدِ

"প্রতিদিনই নতুন নতুন রিযিক আসে আমাদের মালিকের পক্ষ থেকে যিনি ধনী, প্রশংসিত, ক্ষমতাবান; পরাক্রমশালী, শক্তিমান, সুক্ষ্মদর্শী, প্রকাশ্য, গোপন, নিকটবর্তী ও দূরবর্তী।"

৩. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রশংসায় ও তাঁর অনুসরণে কবিতা

আবুল আতাহিয়্যার কবিতায় এরকম আল্লাহ প্রেমের বহু পঙক্তি লক্ষ্যণীয়। তিনি যেমনি ছিলেন খোদাপ্রেমী ও তাঁর দাসানুদাস তেমনি তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রশংসা ও পদাঙ্ক অনুসরণে

অগ্রগামী উম্মত। রাসূল (স.)-এর প্রশংসায় তিনি বহু কবিতা লিখেছেন। নিম্নে কয়েকটি পঙক্তি পেশ করা হলো:[৩১]

واحمدوا اللهَ الذي أكرمكمْ بنذير قام فيكمْ، فنصحْ
بخطيب، فتح الله به كل خير نلتمُوهُ وشرحْ

"তোমরা সেই আল্লাহর প্রশংসা কর যিনি তোমাদেরকে সম্মানিত করেছেন এমন এক নবীর দ্বারা –যিনি তোমাদের মাঝে অবস্থান করে সদুপদেশ দিয়েছেন;যে নবীর দ্বারা আল্লাহ সেই সব কল্যাণের পথ খুলে দিয়েছেন যা তোমরা লাভ করেছ, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত।"

এতো গেলো মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার বিষয়ে কবির মনোভাব। এ ছাড়া তাঁর বেশির ভাগ কবিতাতেই ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন আদর্শের কথা উঠে এসেছে।

৪. কবির কবরের ফলকে তাকওয়াহর নিদর্শন

কবি আবুল 'আতাহিয়্যা তাঁর কবরের ফলকে চার চরণে অঙ্কিত করার জন্য একটি কবিতা রচনা করে পুত্র মুহাম্মদকে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন। তাঁর শেষ দু'টি পঙক্তি হলো:[৩২]

عشتُ تسعين حجةً، في ديارِ التزعْزُعِ
ليس زادٌ سوي التقوي، فخُذي منهُ أو دَعي

''ভয় আর শঙ্কার জগতে আমি নব্বই বছর অতিবাহিত করেছি; পূণ্য বা আল্লাহ ভীতির মতো কোন পাথেয় নেই; হয় তা অর্জন করো নাহয় তা বর্জন করো।"

৫. জীবনের ধ্বংস অনিবার্য

জীবন-মৃত্যুর দার্শনিক ব্যাখ্যা কবি নিঃশঙ্কুচে দিয়ে গেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর গভীর ধর্মীয় জীবন বোধই প্রকাশ

পেয়েছে। যেমন তিনি বলেছেন:[৩৩]

حياتك أنفاسٌ تُعدُ، فكُلما مضى نفَسٌ منها نقصتَ بها جُزءا
يُميتكَ ما يُحييك، في كل ساعةٍ، و يَحدوك حادٍ ما يُريدُ بكَ الهُزءا

"তোমার জীবন কতিপয় গুণা নিশ্বাস মাত্র, যখনই শ্বাস গ্রহণ কর তখনই তুমি জীবনের একটি অংশ হারাও;

যা দ্বারা বেঁচে থাক, প্রতি মূহুর্তে তাই তোমার মৃত্যু ঘনিয়ে আনে, তোমাকে এক চালক হাঁকাচ্ছে, সে তোমার সাথে নম্র হতে চায় না।"

৬. ধৈর্য ও সহনশীলতা

কবি ধৈর্যশীল মানুষ ছিলেন, সত্যের সাধক ছিলেন। ভূমি উত্তম বিছানা শিরোনামের কাসীদায় কবি বলেন:[৩৪]

مـا أكـرمَ الصبرَ، ومـا أحسنَ الـ صـدقَ، وآ زينَـــهُ بـالفَــتَـي

الـخُـــرْقُ شُـؤْمٌ، والـتقى جُنـــة، والرفـق يُـمْـــنٌ، والقُنوعُ الغـني

" ধৈর্য অতি মহৎ, সত্য অতি মনোরম, আর যে কোন তরুণের জন্য এটি শ্রেষ্ঠ ভূষণ; উদ্ভটপনা অমঙ্গল, আল্লাহভীতি ঢালস্বরূপ, কোমলতা সৌভাগ্য আর পরিতুষ্টি প্রাচুর্য"।

৭. প্রবৃত্তির বিরোধিতা

আবুল আতাহিয়্যা প্রবৃত্তির বিরোধিতা করে কবিতা লিখেছেন। তার নিম্নোক্ত পঙক্তিই একথার প্রমাণ দেয়:[৩৫]

أشـدُ الجهـاد جهـــادُ الهــوي، ومـا كـــرم المرءَ إلا الـتــقي

وأخـلاقُ ذي الـفضـل معـروفـةٌ بـبـذل الجـمـيـل، وكـف الأذي

"প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামই কঠিনতম জিহাদ, আর আল্লাহভীতি মানুষকে সম্মানিত করে; মহান ব্যক্তির মহৎচরিত্র অনুগ্রহ প্রদান ও কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকার মধ্যেই পরিচিতি নিহত "।

৮. ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

আবুল আতাহিয়া দুনিয়াবিমুখ কবি। তিনি দুনিয়াকে ক্ষণিকের বিশ্রামাগার হিসেবেই দেখেছেন। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কবর অতঃপর হাশর, পুলসিরাত হয়ে চিরস্থায়ী আবাস জান্নাত অথবা জাহান্নাম। কবি এ বিশ্বাসের জোরালো সমর্থক। দুনিয়া সম্পর্কে কবির মনোভাব সুস্পষ্ট। কবি একে কখনও দেখেছেন ক্ষণস্থায়ী আবাসভূমি হিসেবে, কখনো একে প্রতারক, ধোকাবাজ, কখনো এর লোভাতুর ধ্বংসাত্মক চাকচিক্য অবলোকন করেছেন। সেই সাথে তিনি দুনিয়ার প্রতি মোহ, আসক্ত ও লোভী মানুষকেও খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন–যারা এর ফাঁদে পা দিয়ে নিজের জীবনকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে। এতদদৃষ্টে তিনি দুনিয়ার ব্যাপারে মসলমান জাতিকে সতর্ক ও সচেতন করে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন। কবি মনে করেন দুনিয়া অস্থায়ী আবাসস্থল মাত্র। এক দিন এর ধ্বংস অনিবার্য। ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ার পেছনে সময় ব্যয় করে চিরস্থায়ী আবাসস্থল আখিরাত ক্ষতিগ্রস্থ করা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাম্য নয়। কবির নিকট সুসজ্জিত চাকচিক্যময় দুনিয়ার সৌন্দর্যের কোন মূল্য নেই। এসম্পর্কে কবি বলেন:[৩৬]

لعمرك، مـا الـدنـيـا بـدار بـقـاء؛ كفـاك بـدار الـمـوت دار فـنــاء

فـلا تعشق الـدنيـا، أخي، فـإنـمـا يـرى عـاشق الـدنيـا بجـهـد بـلاء

"তোমার জীবনের শপথ! দুনিয়া চিরস্থায়ী নয়। ধ্বংসশীল ঘরের বিপরীতে মৃত্যুর ঘরই তোমার জন্য যথেষ্ট। হে আমার ভাই! দুনিয়ার প্রতি উম্মমত্ত হয়োনা, কেননা দুনিয়াপ্রেমিকদের বিপদে পড়তে দেখা গেছে"।

এ সম্পর্কে তিনি আরো বলেন:[৩৭]

حــلاوتُهــا ممـزوجــة بـمــرارةٍ؛   وراحـتـهــا ممـزوجـة بـعـنــاء

فـلا تمش يـومـا في ثـيـاب مخـيـلـة   فـإنـك مـن طـيـن، خـُلـقـت، ومــاء

"দুনিয়ার মিষ্টিস্বাদ তিক্ততার সাথে মিশ্রিত, আর দুনিয়ার সুখ-শান্তি দুঃখ-কষ্টের সাথে মিশ্রিত; অতএব, কোন দিন অহংকারের বস্ত্র পরিধান করোনা। কেননা তোমাকে মাটি ও পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।"

৯. কবরের জীবন শেষে আখিরাত মানুষের শেষ ঠিকানা

কবির উপলব্ধি ও বিশ্বাস– দুনিয়ার জীবন ক্ষণিকের বিশ্রামস্থল মাত্র। মানুষের প্রকৃত ঠিকানা আখিরাত, সেখানে যারা ভালো থাকবে তারাই সফলকাম হবে, আর সেখানে যারা কষ্টে থাকবে প্রকৃত অর্থে তারাই ব্যর্থ ও বিফল। আর আখিরাতের পাথেয় এই ক্ষণিকের দুনিয়া থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। অতএব, দুনিয়া খেল- তামাসার জায়গা নয়; দুনিয়া হচ্ছে কঠিন আখিরাত দিবসের পাথেয় সংগ্রহের জায়গা। দুনিয়া হলো আখিরাতের ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্র। আখিরাতই মানুষের শেষ ঠিকানা। বরযখ বা কবরের জীবন শেষে হিসাব-নিকাশের পর মানুষ তার স্থায়ী নিবাস জান্নাত বা জাহান্নামে বসবাস করবে। যারা সৌভাগ্যবান তারা তাদের নেক আমলের বদৌলতে জান্নাতবাসী হবে, আর দুর্ভাগ্যের অধিকারী তারা, যারা চিরস্থায়ী দুঃখ-কষ্টের আবাসভূমি জাহান্নামে অবস্থান করবে। অতএব চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত নেক আমলের। নেক আমলই হচ্ছে মানবজাতির প্রকৃত সম্পদ। এ সম্পর্কে কবি কাব্য রচনা করে বলেন:[৩৮]

أمــامَــك، يــا نَـومــانُ، دارُ سعــــادةٍ   يــدومُ الـبـقـا فـيـهــا، ودارُ شـقـــاءِ

خُـلـقـتَ لإحــدى الغـايـتَـيـن، فـلا تـنـَمْ،   وكـنْ بَـيْـن خـوفٍ منهُـمـا ورَجـــاءِ

"হে অধিক ঘুমন্তব্যক্তি! তোমার সামনে দুটি পথ আছে, সৌভাগ্যের স্থল অথবা দুর্ভগ্যের স্থল, সেখানে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে; তোমাকে উপর্যুক্ত দুটির একটির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব তুমি ঘুমাবে না এবং আশা ও ভয়ের মাঝে অবস্থান করবে"।

১০. মৃত্যু সম্পর্কীয় কবিতা

শেষ বয়সে মৃত্যুর অনিবার্য আহ্বান কবি বেশি করে অনুভব করেছেন। এ সময়ে তাঁর রচিত কবিতায় তাই ফুটে উঠেছে মৃত্যুর কঠোরতা। জন্মিলে মরতে হবে এই সত্যে বিশ্বাস করে কবি বলেন:[৩৯]

لــدوا للـمـوت، وابـنـوا لـلـخـراب، فـكـلـكـم يـصـيـرُ إلى تبــابٍ

لـمـنْ نـبـني، ونـحـن إلى تــرابٍ تـصيرُ،كما خُـلقنا من ترابٍ

"মৃত্যুর জন্যই জীবনযাপন ও বংশ বৃদ্ধি, ধ্বংসের জন্যই অট্টালিকা নির্মাণ। সকলকেই বিনাশের পথে যেতে হবে; কার জন্যে এঅট্রালিকার নির্মাণ, আমরা সকলেই মাটিতে মিশে যাবো, যেমন মাটি থেকে আমাদের সৃষ্টি।"

কবি আবুল 'আতাহিয়্যার বিচারে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কবিতার চরণদ্বয় হলো:[৪০]

لـيت شعـري، فـإنـني لستُ أدري: أي يـومٍ يكـونُ آخـرَ عُـمْـريْ

وبــأي الـبــلادِ يُـقـبَـضُ روحــي؛ و بـأي الـبـلاد يُحـفرُ قبْـريْ

"হায় পরিতাপ! আমি জানিনা কোন দিনটি আমার শেষ দিন হবে; কোন স্থানে আমার মৃত্যু হবে এবং কোন ভূখণ্ডে আমার কবর খোঁড়া হবে।"

কবির রচিত উল্লিখিত রচণদ্বয় তাঁর কাব্যের গতি-প্রকৃতি, বিষয়বস্তু ও দর্শন ও সঠিক মতাদর্শেরই পরিচয় বহন করে, যা আল-কুর'আনে উল্লেখিত নিম্নের আয়াত কারীমাটির মর্ম সকলকে স্মরণ করিয়ে দেয়:[৪১]

وَمَـا تَـدْرِيْ نَـفْسٌ مَـاذَا تَـكـْسِبُ غَـداً وَمَـا تـدْرِيْ نَـفْسٌ بِـأَيِ أَرْضٍ تَـمُـوْتُ

"কেউ জানেনা আগামী কাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে"।

১১. আখিরাত সম্পর্কিত কবিতা

মরমী কবি আবুল আতাহিয়্যা জীবনের শেষপ্রান্তে পরকালীন জীবনে জবাবদিহিতার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন। এ সম্পর্কে তাঁর রচিত নিম্নোক্ত পঙক্তিগুলো প্রণিধানযোগ্য:[৪২]

سأسألُ عن أمورٍ كنتُ فيها، فما عُذري هُـنـاك، و مـا جـوابـي؟

بــأيــة حـجــةٍ احـتـج يــومَ الـ حســابَ، إذا دعيـتُ إلى الـحسـابِ

''এখানে এসে কী কী করেছি সে বিষয়ে যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তখন কি আপত্তি পেশ করবো, আর কি উত্তরইবা দিব? কিয়ামতের দিন যখন আমার হিসাব দেওয়ার জন্য ডাকা হবে তখন কী যুক্তি দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করবো?"

১২. দুনিয়াপ্রেম মুক্ত হয়ে আখিরাত সম্পর্কিত কবির শ্রেষ্ঠ কবিতা

দুনিয়াপ্রেম মুক্ত হয়ে আখিরাত সম্পর্কিত নিম্নোক্ত পঙক্তিটি কবির শ্রেষ্ঠরচনা বলে বিবেচিত:[৪৩]

ألا كـل مـولـودٍ، فـللـموت يـولـد،   ولستُ أرى حـيـاً لـشيء يـخلـــدُ

تجــرد مـن الـدنـيـا، فـإنــك أنمــا   سـقطت إلى الـدنـيـا، و أنـت مـجـردُ

"সাবধান! প্রত্যেক নবজাতক মৃত্যুর জন্য জন্মগ্রহণ করে থাকে, কোনো জীবিত বস্তুকে আমি চিরস্থায়ী হতে দেখিনি; দুনিয়ার ঝামেলা হতে মুক্ত হও, তুমি একাকীই দুনিয়ায় আগমন করেছ।"

১৩. আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে রচিত কবিতা

আবুল 'আতাহিয়্যার পুত্র মুহাম্মদের বণনানুসারে মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব থেকে তাঁর পিতা বন্ধুদের সংসর্গ পরিত্যাগ করে আধ্যাত্মিক তথা যুহ্‌দ সাধনায় ব্যাপৃত থাকেন। এর কিছুকাল পর তিনি 'কালরোগে' আক্রান্ত হন। মৃত্যুর পদধ্বনি তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বার বার নিম্নোক্ত কবিতাটি সে সময় আবৃত্তি করতে থাকেন:[৪৪]

الـــهـي لا تـعـذبـني فـــإنـي   مقـــربـالــذي قـــد كـــان مـــنـي

يـظـن الـنـــاسُ بي خـيـراً وإني   لشـر الناسِ، إن لـم تعْـفُ عـــنـي

"হে আমার প্রভূ! আমাকে শাস্তি দিওনা, আমার থেকে যা কিছু হয়েছে (পাপকার্য) তা আমি স্বীকার করছি; আমার সম্পর্কে মানুষের ভাল ধারণা, তুমি আমাকে ক্ষমা না করলে আমি মানুষের মাঝে অতিমন্দ ব্যাক্তি হবো"।

১৪. কৃচ্ছ্রতা সাধন ও মিতব্যয়িতা

আবুল আতাহিয়্যা সুশ্রী ছিলেন। গায়ের রঙ ছিল গৌরবর্ণ। মাথায় ছিল কালো কুচকুচে কুঞ্চিত কেশরাজি।

তিনি ছিলেন আড়ম্বরপূর্ণ ও মার্জিত রুচির অধিকারী, ব্যবহারে ছিলেন আমায়িক। তাঁর ভাষা ছিল সুমধুর। উচ্চ অথবা নিম্ন আওয়াজ নয়, মধ্যম আওয়াজে কথা বলতেন। তিনি হাসি-তামাশা পছন্দ করতেন। সদা থাকতেন হাস্যোজ্জ্বল, তাঁর হাসি-খুশি থাকাটাকে অনেকে যুহদ কবিতা রচনাকারী ব্যক্তির চরিত্রের বিপরীত মনে করতেন। তাদের ধারণা ছিল তিনি যুহদিয়াত রচনা করলেও তাঁর ব্যাক্তি জীবনে এর কোন প্রভাব নেই। কবির আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট স্বচ্ছল থাকা সত্ত্বেও তিনি খরচ করার ক্ষেত্রে খুব হিসেবি ছিলেন। জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জন্য সামান্যই ব্যয় করতেন। এ জন্য অনেকে তাঁকে কৃপণ মনে করতেন। আর কবি একাজকে মিতব্যয়িতা মনে করতেন। প্রকৃত পক্ষে কবি ছিলেন যাহিদ, দুনিয়াবিমুখ। তিনি ছিলেন দারিদ্র্যপ্রেমী। মহানবী (স.) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা.)ও দারিদ্র্যপ্রেমী ছিলেন। তিনি একজন যাহিদ

হিসেবেদারিদ্র্যকে ভালোবেসেছেন আর এজন্যই দরিদ্রের মতো জীবন কাটাতেই তিনি পছন্দ করতেন। দরিদ্র ব্যক্তির মূল্যায়নে তিনি বলেন:[৪৫]

إذا اردت شـريـف الـنـاس كـلهـم   فانـظـر إلى ملـكٍ زي مسكيـــنِ

ذاك الذي عظـمـتْ في الناس حرمتُه،   وذاك يـصلـحُ للدنـيـا، وللـديـــنِ

"যদি শ্রেষ্ঠ মানুষকে দেখতে চাও তাহলে কাঙালবেশী রাজাধিরাজ (মিসকীন দারিমী) -এর প্রতি দৃষ্টিপাত কর;

তিনি সেই মহান ব্যক্তি, সমাজে যার বড় মর্যাদা রয়েছে, আর যিনি দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য মহান সংস্কারক ।"

কবি বিশ্বাস করতেন, প্রয়োজনের বেশি সম্পদ কল্যাণ বয়ে আনে না বরং তা দুর্ভোগই বয়ে নিয়ে আসে। কবি বলেছেন:[৪৬]

لمـا حصلتُ علي القناعة، لـم أزلْ   مَلِـكاً، يَـري الإكثـارَ كـالإقـلالِ

إن الـقـنـاعة بـالكـفـافِ هيَ الغِـنى،   والفـقـرُ عينُ القفـرِ في الأمـوالِ

"অল্পে তুষ্টতা অর্জনের পর আমি এমন এক রাজ-রাজ্যে প্রবেশ করি যেখানে অধিক সম্পদকে তুচ্ছ গণ্য করা হয়; অল্পেতুষ্টতা অবশ্যই ঐশ্যর্যতা, আর অধিক সম্পদে বিরাজ করছে প্রকৃত দরিদ্রতার উপর দরিদ্রতা।"

কবির আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট স্বচ্ছল থাকা সত্ত্বেও তিনি খরচ করার ক্ষেত্রে খুব হিসেবি ছিলেন। জীবন

পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জন্য সামান্যই ব্যয় করতেন। এ জন্য অনেকে তাঁকে কৃপণ মনে করতেন। আর কবি একাজকে মিতব্যয়িতা মনে করতেন। প্রকৃত পক্ষে কবি ছিলেন যাহিদ বা দুনিয়া বিমুখ। অল্পে তুষ্টি ছিল তাঁর অসাধারণ চারিত্রিক গুণ। এবিষয়ে কবি নিজেই বলেছেন:[৪৭]

لـم يـزل الـقـانـعون لشـرفـنـا

"আমাদের পরিতুষ্ট ব্যক্তিগণই চিরদিন সম্মানিত।"

আতাহিয়্যার কাব্যপ্রতিভা

কবি আবুল আতাহিয়্যা গণমানুষের কবি ছিলেন। খলীফার দরবারে থেকেও কবিতার মাধ্যমে তিনি সাধারণ মানুষের কাতারে ছিলেন। দরবারী কবির বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে ছিল না বরং তাঁর কাব্যে ভোগ বিলাসের বিপরীত বক্তব্যই পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে গযল প্রেমকাব্য) কবিতা লিখে পারদর্শীতা অর্জন করলেও শেষ বয়সে যুহদিয়াতই ছিল তাঁর কাব্যরচনার মূলঅবস্থান। কবির রচিত কবিতা

মালাই তাঁর স্বভাব, প্রকৃতি বা চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে সমকালীন সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফীসাধক কবি হিসেবেই পেয়েছি। উন্নত নৈতিক চরিত্র তাঁর ব্যক্তিত্বকে সুমহান করে তুলেছিল। এ জন্য তিনি আজও দুনিয়া বিমুখ সম্মানিত সুফীকবি হিসেবেই পরিচিত।[৪৮]

আবুল আতাহিয়্যা জন্মসূত্রেই স্বাভাবিক কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর কাব্যে অভিনবত্বের ছোঁয়া পরিলক্ষিত হয়। সহজ-সরল স্বাভাবিক লিখনভঙ্গি হ্রস্ব ছন্দ এবং উঁচুমানের দার্শনিক ভাবধারা তাঁর কাব্যে লক্ষ্যণীয়। তাঁর কাব্যে ছিল এক মোহনীয় আকর্ষণ। নিরক্ষর বেদুঈন থেকে উচ্চ শিক্ষিত বিদগ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি পর্যন্ত তাঁর কবিতা আবৃত্তি করে থাকে। পৃথিবীর যে প্রান্তেই আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চা আছে সেখানেই আবুল আতাহিয়্যার কবিতা পঠিত ও সর্বজন সমাদৃত হয়ে থাকে। আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে সর্ব প্রথম তিনিই প্রমাণ করেছেন, কাব্যের সৌন্দর্যহানী না করেও অতি সহজ ও সাধারণ ভাষা ব্যবহার করে অসাধারণ সব কবিতা রচনা করা যায়। 'ভন ক্রেমার (von kremer)-এর মতে আবু নুওয়াস অপেক্ষা আবুল আতাহিয়্যার কাব্য-প্রতিভা ছিল অধিকতর। কবির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিলনা। ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচীন কাব্য সম্পর্কে তিনি পাঠ নিতে পারেননি। তথাপি তাঁর কবিতার মান সমসাময়িক কবিদের কবিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিল। ছন্দ মেলানোর জন্য তিনি দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করতেন না। প্রাচীন নিয়ম-কানুনের বন্ধন মুক্ত অনাবিল স্রোতের ন্যায় সহজগামী কবিতা জাতিকে তিনি উপহার দেন। এ জন্য তাঁর রচনা অনায়াসেই বেছে নেওয়া যায়। অনাবিল ভাবধারা ও সহজ-সরল ভাষা দ্বারাই তার পার্থক্য নির্ণয় করা যায়।[৪৯] আরবী ছন্দ শাস্ত্র উপেক্ষা করে তিনি বহু কাব্য রচনা করেছেন কিন্তু এগুলো কাব্য হিসেবে অপূর্ব হিসেবেই পরিগণিত। এ কথা তাঁর কঠোর সমালোচকরাও স্বীকার করে নিয়েছেন। ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁর এতো দখল ছিল যে, তিনি অনর্গল পদ্যে কথা বলতে পারতেন। এমন হঠাৎ রচিত কিছু কবিতা আছে, যা তাঁর অন্যান্য রচনার মতোই মান সম্পন্ন। তিনি বলতেন, ইচ্ছা করলে তিনি সর্বদা পদ্যে কথা বলতে পারেন। আবুল আতাহিয়্যা এমন এক কাব্য প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন যা নানাবিধ প্রতিকূলতায় হার মানেনি। দারিদ্র্য আর শিক্ষার অভাব তার প্রতিভাকে ধ্বংস করতে পারেনি। অস্বচ্ছল ও নিচু শ্রেণির বংশীয় পরিচয় তাঁর কাব

প্রতিভাকে আরো শানিত ও বিকশিত করেছিলো। তিনি ছিলেন প্রথাভাঙ্গা সাহসী কবি। কবিতা রচনার জন্য তিনি ছন্দের কাছে যাননি। ছন্দই তাঁর কাছে এসেছে। আবহমান কাল ধরে আরবী কবিতায় আলোচিত মরুভূমির বাগাড়ম্বরকে সম্পূর্ণ পরিহার করে নাগরিক সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যশীল কাব্য তিনি জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভা এতো বিভাময় ছিল যে,

সমকালীন কাব্যের বিষয়বস্তু তিনি পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। যুহদ কবিতার মতো অজনপ্রিয় কবিতা লিখে তিনি খ্যাতিমান হয়ে উঠেন। যুহদ কবিতায় তাঁর সফলতা দেখে সমকালীন অন্যান্য কবিও এ জাতীয় কাব্য রচনায় এগিয়ে আসেন। এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে আবু নুওয়াসের নাম প্রণিধানযোগ্য।[৫০]

সমকালীন যুহদ কবিদের মাঝে আবুল আতাহিয়্যার অবস্থান

কবির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিলনা। ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচীন কাব্য সম্পর্কে তিনি পাঠ নিতে পারেননি। তথাপি তাঁর কবিতার মান সমসাময়িক কবিদের কবিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিল। ছন্দ মেলানোর জন্য তিনি দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করতেন না। প্রাচীন নিয়ম-কানুনের বন্ধন মুক্ত অনাবিল স্রোতের ন্যায় সহজগামী কবিতা জাতিকে তিনি উপহার দেন। এ জন্য তাঁর রচনা অনায়াসেই বেছে নেওয়া যায়। অনাবিল ভাবধারা ও সহজ-সরল ভাষা দ্বারাই তার পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। আরবী ছন্দ শাস্ত্র উপেক্ষা করে তিনি বহু কাব্য রচনা করেছেন কিন্তু এগুলো কাব্য হিসেবে অপূর্ব হিসেবেই পরিগণিত। এ কথা তাঁর কঠোর সমালোচকরাও স্বীকার করে নিয়েছেন। ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁর এতো দখল ছিল যে, তিনি অনর্গল পদ্যে কথা বলতে পারতেন। এমন হঠাৎ রচিত কিছু কবিতা আছে, যা তাঁর অন্যান্য রচনার মতোই মান সম্পন্ন। আবুল 'অতাহিয়্যার কবিতা খলীল ইব্ন আমদের ছন্দের আওতায় পড়েনার অভিযোগ ছিলো এবং তিনি বলতেন, ইচ্ছা করলে তিনি সর্বদা পদ্যে কথা বলতে পারেন। তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ইবন আবিল আতাহিয়্যা বলেন, যে তাঁর পিতাকে জনৈক ব্যক্তি একবার জিজ্ঞাসা করলো, "আপনি ছন্দশাস্ত্র জানেন কি?" জবাবে তিনি বললেন:[৫১]

انا اكبر من العروض وله أوزان لاتدخل العروض

"আমি ছন্দের অনেক উর্ধ্বে, আর মাত্রা আমার ছন্দে প্রবেশ করেনা ।

আবুল আতাহিয়্যা এমন এক কবি প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন যা নানাবিধ প্রতিকূলতায় হার মানেনি। দারিদ্র্য আর শিক্ষার অভাব তার প্রতিভাকে ধ্বংস করতে পারেনি। অস্বচ্ছল ও নিচু শ্রেণির বংশীয় পরিচয় তাঁর কাব্য প্রতিভাকে আরো শানিত ও বিকশিত করেছিলো। তিনি ছিলেন প্রথাভাঙ্গা সাহসী কবি। কবিতা রচনার জন্য তিনি ছন্দের কাছে যাননি। ছন্দই তাঁর কাছে এসেছে। আবহমান কাল ধরে আরবী কবিতায় আলোচিত মরুভূমির বাগাড়ম্বরকে সম্পূর্ণ পরিহার করে নাগরিক সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যশীল কাব্য তিনি জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভা এতো বিভাময় ছিল যে, সমকালীন কাব্যের বিষয়বস্তু তিনি পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। যুহদ কবিতার মতো অজনপ্রিয় কবিতা লিখে তিনি খ্যাতিমান হয়ে উঠেন। যুহদ কবিতায় তাঁর সফলতা দেখে সমকালীন অন্যান্য কবিও এ জাতীয় কাব্য রচনায় এগিয়ে আসেন। এ ক্ষেত্রে সর্বাগে আবু নুওয়াসের নাম

প্রণিধানযোগ্য। আবুল আতহিয়্যা তাঁর অনন্য সাধারণ কাব্য প্রতিভা যথাযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে আরবী সাহিত্যে এমন এক স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন যা তাঁর জন্যই সংরক্ষিত ছিল। সহজ-সরল-স্বাভাবিক লিখন ভঙ্গি ও বিষয়বস্তু নির্বাচনের গভীর চিন্তন শক্তি তাঁকে এ স্থানে সমাসীন করে। ফারসী সাহিত্যে যুহদ কবিতায় শায়খ সাদীর যে স্থান আরবী সাহিত্যে আবুল আতহিয়্যার সেই স্থান। তাঁর সমসাময়িক আরব কবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতি কবি আবু নুওয়াস। ভন ক্রেমারের মতে, আবুল আতাহিয়্যার কাব্য-প্রতিভা আবু নুওয়াস অপেক্ষা অধিকতর ছিল।[৫২]

আধুনিক যুগের কাব্য সংকলক ড. শুকরী ফয়সাল বলেন:[৫৩]

"কাব্যের মনোরঞ্জন ও চিত্তবিনোদন শক্তি উপলব্দি করে আমি কয়েকটি উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ (দীওয়ান) প্রকাশে মনস্থির করি। এ জন্য আমি অনেকগুলো দীওয়ান অধ্যয়ন করি। কিন্তু স্বচ্ছ ভাবধারা, মার্জিত রুচি, সরল ভাষা ও মধুর ছন্দের দিক দিয়ে আবুল আতাহিয়ার দিওয়ানই আমার নিকট শ্রেষ্ঠতম মনে হয়েছে। সমকালীন কবিগণ আবুল আতাহিয়্যা সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছেন। তাঁদের মূল্যায়নে সমকালীন কবিদের মাঝে তাঁর স্থান নির্ধারণ করা যায়"।

আবুল আতাহিয়্যার কাব্যমর্যাদা মূল্যায়ন করে হারুন ইবন সা'দান বলেন:[৫৪]

"একদা আমি প্রখ্যাত কবি আবু নুওয়াসের সঙ্গে কবিতা আবৃত্তির একটি আসরে উপস্থিত ছিলাম। আবু নুওয়াস সে আসরে কবিতা আবৃত্তি করলেন। এ আসরে উপস্থিত জনৈক শ্রোতা তাঁকে প্রশ্ন করলো, আপনি কি সবচেয়ে বড় কবি? তিনি বললেন, বৃদ্ধ আবুল আতাহিয়্যা জীবিত থাকতে আমি বড় কবি নই।" এই বক্তব্যের মাধ্যমে আবু নুওয়াস আবুল আতাহিয়্যাকে অনেক সম্মান করেন এবং বলেন:[৫৫]

والله ما رئيته قط الاظننت انه سماء و أنا أرض، أما والشيخ، يعني أباالعتاهية، حي فلا.

"আল্লাহর কসম! আমি যখন তাঁকে দেখি, আমার মনে হয় তিনি আকাশ আর আমি জমিন, আর বৃদ্ধ আবুল আতাহিয়্যা জীবিত থাকতে আমি বড় কবি নই।"

জাফর ইবন ইয়াহইয়া ও প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ আল-ফার্‌রা বলেন, "সমকালীন কবিদের মধ্যে আবুল আতাহিয়্যা সবচেয়ে বড় কবি।" স্বনামধন্য কবি দাউদ ইবন রাযীনকে জিজ্ঞেস করা হলো, এই সময়ের বড় কবি কে? তিনি বললেন, আবু নুওয়াস। অতঃপর তাকে বলা হল, আবুল আতাহিয়্যা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী? তিনি বললেন, 'আবুল 'আতাহিয়্যা জীন ও মানব জাতীর মধ্যে বড় কবি। মুসা ইবন সাকেলহ বলেন, আবুল আতহিয়ার সমসাময়িক কবি سلم الخاسر-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে বললাম, তাঁর নিজের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে। তিনি বলেন, "তা

নয় বরং আজি তোমাকে জিন ও মানুষের বড় কবির কবিতা শোনাব।" অন্য এক বর্ণনা মতে রোজা ইবন মাসলামা বলেন, আমি سلم الخاسر -এর নিকট সবচেয়ে বড় কবির কবিতা শুনতে চাইলে তিনি বললেন, "আমি তোমাকে জীন-ইনসানের মধ্যে বড় কবির কবিতা শোনাব।" অতঃপর তিনি আবুল আতাহিয়ার নিম্নোক্ত কবিতা শুনালেন:[৫৬]

سكنٌ يبقي لهُ سكنٌ ما بهذا يُؤذنُ الزمنُ
نحن في دار يُخبرُنا عن بَلاها، ناطقٌ لَسِنُ

"কালেরপ্রবাহ এ বলে আহ্বান করছে, নিরব শান্তি শান্তিকে টিকে রাখে; আমরা এমন পৃথিবীর দ্বারে বসবাস করছি যে তার বিপদ-আপদ সম্পর্কে আমাদেরেকে একজন বিশুদ্ধভাষীর ভাষায় অবহিত করে থাকে"।

আহমাদ ইবন যুহায়র বলেন, "আমি মুস'আব ইবন আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি, 'আবুল আতাহিয়্যা হলেন কবিদের শ্রেষ্ঠ, আমি বললাম কী জন্য তিনি আপনার নিকট এমন মর্যাদার অধিকারী হলেন? তিনি বললেন, কবির এ কবিতার জন্য:[৫৭]

تعلقتُ بآمالٍ طوالٍ أي آمالِ
واقبلتُ علي الدنيا مُلحًا اي اقبالِ

"সব ধরনের দীর্ঘ কামনা-বাসনার সাথে আমি সম্পৃক্ত; আর পৃথিবীতে আমি সবধরণের আনন্দকে স্বাগতম জানাচ্ছি"।

মুস'আব বললেন," এগুলো সঠিক, সহজবোধ্য বাক্য। এতে বাড়তি-কমতি কিছুই নেই। বুদ্ধিমান তা জানে এবং অজ্ঞব্যক্তিও তার স্বীকৃতি দেয়।" এছাড়া আরো অনেক প্রাজ্ঞব্যক্তি কবি আবুল আতাহিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন। এদের মধ্যে ভাষাবিদ ও ব্যাকরণবিদ আসমা'ঈর নাম প্রনিধানযোগ্য। আবুল 'আতাহিয়্যা তাঁর কবিতায় দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেননি। তিনি জনসমাজ কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দের গাথুনী দিয়েই পঙক্তি নির্মাণ করেছেন। আর তাঁর কবিতার বাক্য সহজ-সরল ও অনায়াসগম্য। মানুষের মুখের কথা তিনি পদ্যাকারে সহজ-সাবলীল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে আমরা তাঁর কাব্যকে সহজ-সরল অনাড়ম্বও ও স্বাভাবিক লিখন ভঙ্গি বলেই মনে করি। তাঁর কবিতার ছন্দ ছিল অবাধগামী । সাধারনত: হ্রস্ব ছন্দে তিনি কবিতা লিখেছেন। ছন্দের অনুরোধে কখনও তিনি দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করেননি। আবার আরবী ছন্দ শাস্ত্রকে উপেক্ষা করেও তিনি কবিতা নির্মাণ করেছেন। তাঁর কঠোর সমালোচক স্বীকার করেছেন যে, তাঁর এসব রচনাও অপূর্ব। তিনি এবং তাঁর কনিষ্টতম কবি আবদুল হামিদই প্রথম مزدوج (দুই শ্লোকে অন্তমিল যুক্ত

পদ্য) রচনা করেন। مضارع ছন্দও সর্বপ্রথম তিনি আবিষ্কার করেন। এ ছাড়া আটটি দীর্ঘ শব্দাংশ বিশিষ্ট একটি ছন্দও তিনি স্বীয় কবিতায় ব্যবহার করেছেন।[৫৮]

আবুল আতাহিয়্যার কবিতায় দার্শনিক চিন্তা-চেতনার পেক্ষাপট

উপর্যুক্ত বিষয় সমূহের সাথে যুক্ত হয়েছিল কবির দার্শনিক চিন্তা-ধারা। কবির অর্ন্তদৃষ্টি তাঁর ভাবধারাকে শানিত ও মহিমান্বিত করেছিল। অর্থ ও আঙিকে এক অসাধারণ সাযুজ্য ছিল তার কবিতায়। প্রচলিত ও সহজ বোধ্য শব্দ, সরল ও অনাড়ম্বর বাক্য এবং হ্রস্ব ছন্দ–সবমিলে যেন বাচিকের ঝর্ণাধারা। সহজ-সরল বাগপদ্ধতি অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ভরা দার্শনিক চিন্তা-ধারা অশিক্ষিত-শিক্ষিত সবাই এর প্রতি সমর্থন দিয়েছেন। আহমাদ হাসান যাইয়্যাত তাঁর কবিতায় সহজ শব্দ চয়ন, সুক্ষ্ম ভাব, গভীর চিন্তাধারা ও বাস্তবতার বিবরণ অবলোকন করে কবির প্রশংসায় বলেন:[৫৯]

إن شعر ابي العتاهية كساحة الملوك يقع فيها الجوهر والذهب و التراب والخزف و النوي.

"আবুল আতাহিয়্যার কবিতা রাজা-বাদশাহদের আঙিনার মতো, যেখানে মনি মুক্তা, স্বর্ণ, মাটি ও দানা ছড়িয়ে পড়ে।"

আবুল 'আতাহিয়্যার কবিতার মধ্যে ছিল সুরের মূর্ছনা। তাঁর বন্ধু ইব্রাহীম আল মাওসিলী তার অনেক কবিতায় সুরারোপ করেন– যা বহু শহর, ও গ্রামে গাওয়া হয়ে থাকে। মোদ্দাকথা আবুল আতাহিয়্যা সমকালীন আরবী সাহিত্য সমাজে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গোটা আব্বাসী যুগে তাঁর সমকক্ষ কবি খুব কম সংখ্যকই ছিলেন। বিশেষ করে মরমী কবিতায় তিনিই ছিলেন সেরা কবি। তাঁর অনন্য সাধারণ কাব্য প্রতিভা যথাযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে আরবী সাহিত্যে এমন এক স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন যা তাঁর জন্যই সংরক্ষিত ছিল। সহজ-সরল-স্বাভাবিক লিখন ভঙ্গি ও বিষয়বস্তু নির্বাচনের গভীর চিন্তন শক্তি তাঁকে এ স্থানে সমাসীন করে। ফারসীসাহিত্যে যুহদ কবিতায় শায়খ সাদীর যে স্থান আরবীসাহিত্যে আবুল আতহিয়্যারও সেই স্থান। তাঁর সমসাময়িক আরব কবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আবু নুওয়াস। ভনক্রেমারের মতে, আবুল আতাহিয়্যার কাব্য-প্রতিভা আবু নুওয়াস অপেক্ষা অধিকতর চিত্তাকর্ষক ছিল। সমকালীন কবিগণ আবুল আতাহিয়্যা সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছেন। তাঁদের মূল্যায়নে সমকালীন কবিদের মাঝে তাঁর স্থান নির্ধারণ করা যায়। হারুন ইবন সা'দান বলেন:[৬০]

"একদা আমি প্রখ্যাত কবি আবু নুওয়াসের সঙ্গে কবিতা আবৃত্তির একটি আসরে উপস্থিত ছিলাম। আবু নুওয়াস সে আসরে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। এ আসরে উপস্থিত জনৈক শ্রোতা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি সবচেয়ে বড় কবি? তিনি বললেন, বৃদ্ধ আবুল আতাহিয়্যা জীবিত থাকতে আমি

বড় কবি নই"। জাফর ইব্ন ইয়াহইয়া ও প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ ইয়াহিয়া ইব্ন যিয়াদ আল-ফাররার মতে, "সমকালীন কবিদের মধ্যে তিনি(আবুল আতাহিয়্যা) সবচেয়ে বড় কবি।" স্বনামধন্য কবি দাউদ ইব্ন যায়িদ ইব্ন রাযীনকে জিজ্ঞেস করা হলো, এই সময়ের বড় কবি কে? তিনি বললেন, আবু নুওয়াস। অতঃপর তাকে বলা হল, আবুল আতাহিয়্যা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী? তিনি বললেন, "আবুল আতাহিয়্যা জীন ও ইনসানের মধ্যে বড় কবি।"

মূসা ইব্ন সালিহ আশ-শাহরাযূরী বলেন, আবুল 'আতহিয়্যার সমসাময়িক কবি সালমুল খাসিরের নিকট গেলাম এবং তাঁকে বললাম, তাঁর নিজের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে। তিনি বললেন, "তা নয় বরং আজি তোমাকে জিন ও মানুষের বড় কবির কবিতা শোনাব।" অন্য এক বর্ণনা মতে রোজা ইব্ন মাসলামা বলেন, আমি সালমুল খাসিরের নিকট সবচেয়ে বড় কবির কবিতা শুনতে চাইলে তিনি বললেন," আমি তোমাকে জীন-ইনসানের মধ্যে বড় কবির কবিতা শোনাব।" অতঃপর তিনি আবুল 'আতাহিয়ার নিম্নোক্ত কবিতা শুনালেন:[৬১]

سكنٌ يبقى له سكنٌ ما بهذا يُؤذنُ الزمن
نحنُ فى دارٍ يُخبرنا ببلاها ناطقٌ لَسِنُ

"কালেরপ্রবাহ এ বলে আহ্বান করছে, নিরব শান্তি শান্তিকে টিকে রাখে; আমরা এমন পৃথিবীর দ্বারে বসবাস করছি যে তার বিপদ-আপদ সম্পর্কে আমাদেরেকে একজন বিশুদ্ধভাষীর ভাষায় অবহিত করে থাকে"।

আবুল আতাহিয়্যা বিরচিত কবিতার মধ্যে ছিল সুরের মূর্ছনা। তাঁর বন্ধু ইব্রাহীম আল মাওসিলী তার অনেক কবিতায় সুরারোপ করেন– যা বহু শহর ও গ্রামে গাওয়া হয়ে থাকে। কবি আবুল আতাহিয়্যা সাধারণ একজন কুম্ভকার থেকে ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠেন। এজন্য তাঁকে দীর্ঘ বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। কবিত্ব শক্তির নিয়মিত পরিচর্যা ও কঠোর সাধনা তাঁকে সমকালীন সাহিত্যাঙ্গনে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। জীবনের

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে তিনি কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছেন। তিনি খুব কাছ থেকে ক্ষমতাসীন মানুষেরভোগ বিলাস ও অনাচার অবলোকন করে বিস্মিত ও হতভম্ব হয়েছেন সেই সাথে দুনিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এর আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন। ফলে প্রাসাদের কবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি কালক্রমে হয়ে উঠেন দুনিয়াবিমুখ কবি। তাঁর কবিতার পঙক্তিতে ঝরে পড়েছে চিরস্থায়ী আখিরাতের পুঁজি গ্রহণের আকুলতা সেই সাথে দুনিয়ার প্রতি অবজ্ঞা। আবুল আতাহিয়্যা সমকালীন আরবী সাহিত্যসমাজে অন্যতম শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গোটা আব্বাসী যুগে তাঁর সমকক্ষ কবি খুব কমই ছিল। বিশেষ করে মরমী ও যুহদ কবিতায় তিনিই িদুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও

প্রাচুর্যের প্রতি বিরাগভাব এবং তার প্রতি অনাসক্তিমূলক কবিতাই زهديات বা দুনিয়া বিমুখতামূলক কবিতা।[৬২]

মেদ্দা কথা, কবি আবুল 'আতাহিয়্যার যুহদ হচ্ছে পার্থিব দুনিয়ার আকর্ষণ ত্যাগ করে পরকালীন কল্যাণ ও মুক্তির আশায় জীবন ও সম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ঐকান্তিকভাবে মহান স্রষ্টার নিকট নিজেকে সমর্পণ করা, জীবন ও জগতের যাবতীয় মোহ থেকে নিজেকে গুটিয়ে একমাত্র মহান স্রষ্টার উপাসনায় লিপ্ত থাকা। আল-কুর'আনের অনুপম ভাষাশৈলী–এর শব্দ চয়ন, অলঙ্কার, উপমা-উৎপ্রেক্ষা সাহিত্য সমঝদার আরব জাতিকে বিস্মিত ও হতবাক করে দেয়। গোটা আরব জাতির মধ্যে ইনকিলাব সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি হয় নয়া সমাজ ব্যবস্থা, তথা আল–কুর'আনের সমাজ ব্যবস্থা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর হিসেবে আল-কুর'আনের উজ্জ্বল আলোকরশ্মি আরব জাতিকে নতুন রঙে রাঙিয়ে দেয়। প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা পর্যন্ত আল-কুর'আন এক আকর গ্রন্থ হিসেবে পরিণত হয়। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়। নতুন কিছু বিষয়ে কবিতা রচনা হতে থাকে। এ সব বিষয়গুলোকে মোটা দাগে 'ইসলামী ভাব ধারার' কবিতা বললে অত্যুক্তি হবে না। ইসলামী ভাবধারার কবিতার মধ্যে অন্যতম সংযোজন হচ্ছে যুহদ কবিতা। যুহদ কবিতার ভাব ও ভাষা ইসলামী ভাবধারায় পুষ্ট। এ জাতীয় কবিতা আব্বাসী যুগে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। উমায়্যা যুগে খুব সামান্য পরিমাণে এর চর্চা লক্ষ্য করা যায়। তবে এর উৎপত্তি বিষয়ে তেমন কোন তথ্য জানা যায় না। জাহিলী যুগে প্রত্যক্ষরূপে যুহদিয়াত কবিতা রচিত না হলেও এর আভাষ পাওয়া যায়। জাহিলী কবিগণ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস নিয়ে মত্ত থাকলেও এদের কেউ কেউ আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন। আখিরাতের ভয়-ভীতি তাদের কবিতায় ফুটে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে ইয়াহুদী কবি আস-সাজওয়াল ইবন আদিয়ার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।[৬৩]

জাহিলী যুগের খ্যাতিমান কবি যুহায়র ইব্ন আবী সুলমার কবিতায় যুহদিয়াত-এর আভাষ পাওয়া যায়। তিনি ম'আল্লাকার কবিদের প্রথম তিন জনের একজন। তাঁর কবিতায় মানবীয় গুণাবলী ও গভীর ইসলামী ভাব ও চিন্তাধারা লক্ষ্যণীয়। তাঁর কাব্যে সুনির্মল আল্লাহর একত্ব, ঈমান, পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি ইসলাম ধর্মীয় বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। আর এজন্য কোন কোন ঐতিহাসিক তাকে খ্রিস্টান বলে ধারণা করেছেন। কবি যুহায়র বলেন:[৬৪]

يُؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر ليوم الحساب او يعجل فينقم

وماالحرب الا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم

"তোমাদের অন্তরে যা আছে তা গোপন থাকবে ভেবে তোমরা আল্লাহর নিকট হতে কোন কিছু লুকিয়ে রেখোনা। কারণ যখন আল্লাহর নিকট থেকে কোন কিছু গোপন রাখা হয় তিনি তা অবগত

হন। (তোমরা যা কিছু কর) তা বিলম্বিত হয়ে একটি খাতায় লিপিবদ্ধ অবস্থায় বিচারের দিনের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত থাকে, অথবা অবিলম্বেই(তোমাদের) কোন কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করা হয়; যে যুদ্ধের স্বাদ তোমরা জেনে-শুনে গ্রহণ করেছ তা কথায় উড়িয়ে দেয়া যায়না"।

ইসলামের আবির্ভাবের পর আরব জাতির সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। কাব্য সাহিত্যেও এই নতুন আন্দোলনের ঢেউ লাগে। সাহিত্যের বিষয়বস্তুতেও এই নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায়। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা হতে থাকে। একটু দেরীতে হলেও যুহদ কবিতাও এ যুগে সংযোজিত হয়। এ যুগকে যুহদিয়াত কবিতার প্রস্তুতির যুগ বলা যায়। এ সময় সীমিত আকারে বিভিন্ন কবির কবিতায় যুহদিয়াত লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠে। খোলাফায়ে রাশেদীনের কারো কারো কবিতায় যুহদিয়াত প্রকাশ পেয়েছে। তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রা.) দানশীল ব্যক্তি হিসেবে ইসলামের ইতিহাসে কিংবদন্তী হয়ে আছেন। কিন্তু দুনিয়া ত্যাগী মানুষের মতোই তিনি জীবন-যাপন করেছেন। তাঁর সহায়-সম্পদ মুসলিম জাহানের বিভিন্ন কাজে তিনি ব্যয় করেছেন। মুক্ত হস্তে তিনি দান-সাদাকা করেছেন। তাঁর রচিত নিম্নোক্ত পঙক্তিদ্বয় যুহদিয়াত কবিতার অন্তর্গত:[৬৫]

غني النفس يغني النفس حتى يكفها وإن عضها حتي يضربها الفقر

وما عسرة فاصبر لها إن لقيتها بكائنة إلا سيتبعها يسر

"আত্মার ধনাঢ্যতা আত্মাকে মুখাপেক্ষীহীন করে দেয়; এমনকি সে যদি দরিদ্রও হয়ে যায় তবুও তার এই আত্মার ধনাঢ্যতা তাকে সর্ব প্রকারের ক্ষতি থেকে ফিরিয়ে রাখে; দুঃখ-কষ্ট কিছুই না; যদি তা তোমার উপর আপতিত হয় তাহলে ধৈর্য ধারন কর। কেননা, এই দুঃখ-কষ্টের পর পরই সুখ ও শান্তি রয়েছে।"

হযরত আলী (রা.) ছিলেন চতুর্থ খলীফা। প্রথম তিন খলীফার শাসনামলে তিনি মজলিসে শুরার সদস্য ছিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় তারা কোন সমস্যায় পড়লে তাঁর শরণাপন্ন হতেন। তিনি ছিলেন প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের এক প্রত্যুজ্জল মশাল। আরবী কবিতার ক্ষেত্রে তিনি অপরিসীম অবদান রাখেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি যে সকল কবিতা আবৃত্তি করেছেন তা দিওয়ান আকারে সংরক্ষিত আছে। আর বহু কবিতা সংরক্ষণের অভাবে চিরতরে হারিয়ে গেছে। হযরত আলী (রা.) বিভিন্ন ধরনের কবিতা রচনা করেছেন। এর মধ্যে বীরত্ব, যুদ্ধ ও জ্ঞান গর্ভ বিষয়েই তার কবিতা বেশি। তাঁর রচিত কিছু কবিতায় যহুদিয়াতের কথা উঠে এসেছে। যেমন, তিনি পৃথিবীর নশ্বরতা ও নিত্যতাকে মাকড়সার জালের সাথে তুলনা করে বলেছেন:[৬৬]

إنما الد نيا فناء ليس للد نيا ثبوت إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت

ولقــد يكفيك أيـها الطـالـب قــوت   ولعمري عن قليل كل من فيـها يموت

"নিশ্চয় দুনিয়া নশ্বর, এর কোন স্থায়ীত্ব নেই, এই দুনিয়ার উপমা হলো মাকড়সার তৈরি করা ঘর; ওহে দুনিয়ার অন্বেষণকারী! দিনের খোরাকই তোমার জন্য যথেষ্ট, আর আমার জীবনের শপথ! খুব শিগগীর এ দুনিয়ার বুকে যারা আছে, সবাই মারা যাবে।"

লাবীদ ইবন রাবীয়া (রা.) মুখাদরাম কবি। অমুসলিম ও মুসলিম উভয় অবস্থাতেই তিনি কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কবিতায় যুহদিয়াত লক্ষ্যণীয়। যেমন কবি বলেন:[৬৭]

الا كـل شيءٍ مـا خـلا اللـه باطـل   وكـل نعيـم لا محـالـة زائـل

وكــل أنـاس سـوف تدخـل بـينـهـم   دويـهـية يصفـر منها الأنـامـل

"ওহে জেনে রাখো! এক আল্লাহ ছাড়া সবই নশ্বর –মিথ্যা, আর নিশ্চয় সকল সুখ-সম্পদ অস্থায়ী ও বিলীয়মান; সকল মানুষ–অতি শ্রীঘ্র তাদের মধ্যে মৃত্যুর প্রবেশ ঘটবে, আর তাতে আঙ্গুলের আগা সমূহ হলুদ বর্ণ ধারণ করবে। কবি সাহম ইবন হানজালা ছিলেন মুখাদরাম কবি। তিনি ছিলেন শামের অধিবাসী। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এবং পরে প্রচুর কবিতা তিনি রচনা করেছেন। তাঁর কবিতায় দুনিয়া বিমুখতা লক্ষ্যণীয়।যেমন:[৬৮]

ويحملنـك اقـناع علي زهـد   ولا تزل في عطاء اللـه مرتـغبـا

اللـه يخلف مـا انفقت محسبا   اذا شكرت و يـؤتيك الـذي كتبـا

"দুনিয়া ত্যাগের উপর কৃপণতা যেন তোমাকে প্ররোচিত না করে, সর্বদাই তুমি আল্লাহর দাস সম্পর্কে খুশী ও আগ্রহী থাক; তুমি যা খরচ কর আল্লাহ তা হিসাব করে তোমাকে দিয়ে দেবেন, যখন তুমি শোকর করবে আর তোমাকে তিনি তাই দিবেন যা যা তিনি লিখে রেখেছেন।"

কবি মিসকীন আদ-দারিমী (মৃ.৭০৮ খ্রি.) বেশ কিছু যুহদ কবিতা রচনা করেছেন। নিম্নে তার রচিত কিছু পঙক্তি পেশ করা হলো:[৬৯]

وسُميتُ مسكينـًا و كـانتْ لـجاجة   وإنـي لـمسكـينٌ إلي اللـهِ راغـبُ

مـا أنـزل اللـهُ من أمرٍ فـاكـرهـُهُ   إلا سيُجعـلُ ليْ من بـعدِه فرجـا

"আমি মিসকীন নামে পরিচিত হয়েছি, আর এটা ছিল দ্বন্দের ব্যাপার; আর নিশ্চয় আমি আল্লাহর নিকট মিসকীন, তাঁরই প্রতি আসক্ত; আল্লাহ এমন কোন বিষয় অবতীর্ণ করেননি যা আমি অপছন্দ করি, এটা ব্যতীত যে, আমার জন্য এরপর স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্য আসবে"।

আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালী বানু কিনানা গোত্রের দুওয়াইল শাখায় রাসূলুল্লাহ(স.) এর মদীনায় হিজরতের কয়েক বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। খলীফা 'উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে তিনি

বসরায় বসবাস করতে থাকেন। তিনি খলীফা আলী (রা.)-এর শিষ্য ছিলেন। তাঁর কবিতায় যুহদিয়াত পরিলক্ষিত হয়। এর নমুনা নিম্নরূপ:[৭০]

واذا طلبت من الحوائج حاجة فادع الاله واحسن الأعمالا

إن العباد وشانهم وأمرهم بيد الاله يقلب الأحوالا

"তুমি যখন তোমার কোন প্রয়োজন চাইবে তখন আল্লাহকে ডাকবে এবং ভালো কাজ করবে; বান্দা ও তাদের অবস্থার বিষয়াবলী আল্লাহর হাতেই; তিনি অবস্থাকে পরিবর্তন করে দেন।"

উমাইয়া যুগের অন্যতম দুনিয়া বিমুখ কবি ও খতীব ছিলেন সাবিক আল-বারবারী(মৃ.)। আলিম হিসেবেও তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি আল-মাওসিলের অন্তর্গত রিক্কার কাযী ও সেখানকার মসজিদের ইমাম ছিলেন। খতীব হিসেবে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাক্ওয়া ও দুনিয়া বিরাগমূলক প্রচুর কবিতা তিনি রচনা করেছেন। দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ ক্ষণস্থায়ী, একদিন এসব ধ্বংস হয়ে যাবে। মানুষ জমাকৃত সম্পদ রেখে যায়, তা তাঁর অধিকারে থাকে না। এগুলো তাঁর ওয়ারিশদের মালিকানায় চলে যায়। এ সম্পর্কে কবি বলেন:[৭১]

أموالنا ذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها

والنفس تكلف بالدنيا و قد علمت إن السلامة منها ترك مافيها

"আমাদের যে সম্পদ আমরা জমা করি তাতো মীরাসের অধিকারীদের (ওয়ারিসদের), আর যে সব ঘর-বাড়ি আমরা তৈরি করি তাতো সময়ের আবর্তনে একদিন ধ্বংস হবেই; নফস দুনিয়ার প্রতি আসক্ত, অথচ সে জানে যে, তা থেকে নিরাপদ থাকার উপায় হলো তার মধ্যে যা কিছু আছে তা ত্যাগ করা।"

আব্বাসী খিলঅফতের যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। আরবী ভাষা ও সাহিত্য এ যুগে চরম উৎকর্ষতা লাভে সক্ষম হয়। আরবী কবিতার বিষয়বস্তুও প্রসারিত হয়।

বিশেষ করে যুহদ কবিতা এ সময় পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে। সমকালীন বহু কবি যুহদ কবিতা রচনা করেন।

এ যুগে দুনিয়া বিমুখ সুফী শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা ব্যাক্তি জীবনে ছিলেন দুনিয়া বিমূখ। আবুল 'আতাহিয়্যার ন্যায় তাঁরাও কম বেশি যুহদিয়াত কবিতা রচনা করেছেন। এ যুগের যুহদ কবিতা রচনাকারীদের মধ্যে আবু হানিফা, ইবরাহিম ইব্ন আদহাম, আব্দুল্লাহ ইব্ন মোবারক, বাহলুল উমর ইবন সায়রাফী, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আর-রূআসী, আবু নুওয়াস ও আবুল আতাহিয়া এর নাম উল্লেখযোগ্য।[৭২]

আবুল আতাহিয়্যার রচনাবলি

আবুল আতাহিয়্যা ছিলেন ধণাঢ্য স্বভাব কবি, শ্রমজীবী মানুষের কবি, সকল স্তরের জনগণের কবি যা তাঁর রচিত কবিতার সর্বত্র প্রতিফলিত হয়েছে। সহজ-সরল শব্দ, কাছাকাছি অর্থ জটিলতামুক্ত ছিল। সরলতা ও ধর্মীয় সুওে রচিত বিধায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ লোকের মুখে মুখে তাঁর কবিতা ধ্বনিত হতো। এই বিশিষ্টতার কারণে তাঁর রচনা ছিল প্রচুর– সেই শিশুকাল থেকে আমৃত্যু ধারাবাহিকভাবে তিনি কাব্য রচনা করে গিয়েছেন। তিনি অনেক সময় মুখে মুখে কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর এতো কবিতা যে, তা পূর্ণসংরক্ষণ বা সংকলন সম্ভব হয়নি। তাঁর অনেক কবিতা হারিয়ে হারিয়ে যাওয়া সত্বেও অনেক বিশিষ্টব্যক্তি ও গবেষক তাঁর প্রাপ্ত কবিতাগুলো যথাযথ টীকা-টিপ্পনীসহ সংকলন করে দীওয়ান আকারে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কবিতা গুলোর দীওয়ান আকারে সংকলিত গ্রন্থগুলোর একটি সম্পাদিত তালিকা প্রতিবেদন আকারে নিম্মে উপস্থাপন করা হলো:[৭৩]

১. আন্দালুসিয়া মুসলিম স্পেনের খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ ও ধর্মতত্ত্ববিদ ইবন ‘আবদিল বার্‌র আন-নামিরী আবুল আতাহিয়্যাহর আধ্যাত্মিক বিষয়ক (زهديات) কবিতা সমূহের দীওয়ান আকারে একটি কাব্যসংকলন তৈরি করেছেন। ১৮৮৬ খ্রি. এবং পরে ১৯১৪ খ্রি. লেবাননের রাজধানী বৈরুতের ক্যাথলিক প্রেস থেকে الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية শিরোনামে তাঁর দীওয়ানের এ সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। সংকলনটিতে বিভিন্নধরণের প্রমাদ পরিলক্ষিত হয়েছে বিধায় তার যথাযথ ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন সময়ের দাবী ছিলো।

২. সর্ব প্রথম ব্যক্তি পর্যায়ে কবি আবুল আতহিয়্যার কাব্য নিয়ে গবেষণা কর্ম পরিচালনা করেন স্বানধন্য গবেষক ড. শুকরী ফয়সল। তিনি দামেশকের জাহিরিয়া লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত সপ্তম হিজরীতে সংকলিত আবুল ‘আতাহিয়্যার দীওয়ানের একটি কপি এবং জার্মানীর তুবানজচান লাইব্রেরীতে অপর একটি কপিকে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। অতঃপর হি.১৩৮৪/খ্রি.১৯৬৫ أبوالعتاهية : اشعاره و اخباره শিরোনামে তাঁর সম্পাদিত ৭৬৩ পৃষ্ঠাসম্মলিত গবেষণাকর্মটি দামেশক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি আবুল ‘আতাহিয়্যার ৫৫০০(পাঁচ হাজার পাঁচশত) কবিতার পঙক্তি, ৪০০০ রাজায কবিতা সম্বলিত দীওয়ানে সংকলন ও পরিমার্জন করেন। তিনি তাঁর গবেষণাকর্মে খ্রিষ্টানদের বিকৃতি করণ ও শব্দ পরিবর্তনের বিষয়ের বিশদ আলোকপাত করেছেন। যেমন-আল-হুব্ব এর পরিবর্তে আল-ওয়াদ্দ, আল-হাওয়ার পরিবর্তে আন-নাওয়া, জারিয়্যা শব্দের পরিবর্তে নাদীম শব্দাবলীর ব্যবহার।

৩. দামেশকের দারুল মু'আল্লা থেকে তারিখ বিহীন একটি গবেষণাকর্ম প্রকাশিত হয়। কবি আবুল 'আতাহিয়্যার বন্ধু ইব্রাহীম আল মাওসিলী তাঁর বহু কবিতার সুরারোপ করেন। এগুলো বহু শহর ও গ্রামে এখনো গাওয়া হয়ে থাকে।

৪. করম আল-বুস্তানী কর্তৃক সম্পাদিত আবুল 'আতাহিয়্যার দীওয়ানের একটি সংকলনগ্রন্থ হি.১৪০৬/খ্রি.১৯৮৬ সালে দীওয়ান আবিল 'আতাহিয়্যা শিরোনামে ৫১১ পৃষ্ঠার সমন্বয়ে প্রকাশিত হয়। এতে কবির রচিত ৫৫০০ কবিতা ও ৪০০০ রজায কবিতা স্থান পেয়েছে।

৫. 'আবদুল মুতাঅ'ল আস-সা'ঈদী কর্তৃক সম্পাদিত তাঁর দীওয়ানের একটি সংকলনগ্রন্থ আবুল 'আতাহিয়্যা আশ-শা'ইর আল-'আলমী শিরোমে কায়রোর আশ-শারকুল ইসলামী প্রেস থেকে ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

৬. আহমদ বারানিক কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদি দীওয়ান আবিল 'আতাহিয়্যা শিরোনামের গন্থটি লজনাতুল বায়ান আল-'আরাবী প্রেস থেকে ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়।

৭. উসামা 'আনূতী কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত আবুল 'আতহিয়্যা রা'ইদুয-যুহ্দ ফিশ-শি'ররিল 'আরাবী দীওয়ান গ্রন্থটি বৈরূত থেকে ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়।

৮. 'আবদুল লতীফ শারারা কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত দীওয়ান আবুল 'আতাহিয়্যা শা'ইর আযযুহ্দ ওয়াল হুব্ব আল-খা'ইব শিরোনামের দীওয়ানটি বৈরূত থেকে দারুশ-শিরক আল-জাদীদ থেকে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়।[৭৪]

আবুল আতাহিয়ার কাব্য প্রতিভা

আবুল আতাহিয়্যা ছিলেন ধণাঢ্য-স্বভাব কবি। তিনি জন্মগতভাবেই স্বাভাবিক কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর কাব্যে অভিনবত্বের স্বাদ পরিলক্ষিত হয়। সহজ-সরল স্বাভাবিক লিখনভঙ্গি হ্রস্ব ছন্দ এবং উচ্চতর দার্শনিক ভাবধারা তাঁর কাব্যে লক্ষ্যণীয়। তাঁর কাব্যে ছিল এক মোহনীয় আকর্ষণ। নিরক্ষর বেদুঈন থেকে উচ্চ শিক্ষিত বিদগ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি পর্যন্ত তাঁর কবিতা আবৃত্তি করে থাকে। পৃথিবীর যে প্রান্তেই আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চা আছে সেখানেই আবুল আতাহিয়্যার কবিতা পঠিত ও সমাদৃত হয়ে থাকে। আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে সর্ব প্রথম তিনিই প্রমাণ করেছেন, কাব্যের সৌন্দর্যহানী না করেও অতি সহজ ও সাধারণ ভাষা ব্যবহার করে অসাধারণ সব কবিতা রচনা করা যায়। 'ভন ক্রেমার (von kremer)-এর মতে আবু নুওয়াস অপেক্ষা আবুল আতাহিয়্যার কাব্য-প্রতিভা ছিল অধিকতর শক্তিশালী। কবির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিলনা। ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচীন কাব্য সম্পর্কে তিনি পাঠ নিতে পারেননি। তথাপি তাঁর কবিতার মান সমসাময়িক কবিদের কবিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিল। ছন্দ মেলানোর জন্য তিনি দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার

করতেন না। প্রাচীন নিয়ম-কানুনের বন্ধন মুক্ত অনাবিল স্রোতের ন্যায় সহজগামী কবিতা জাতিকে তিনি উপহার দেন। এ জন্য তাঁর রচনা অনায়াসেই বেছে নেওয়া যায়। অনাবিল ভাবধারা ও সহজ-সরল ভাষা দ্বারাই তার পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। তাঁর কাব্যপ্রতিভার বিচার করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পর্যালোচনায় স্থান পাচ্ছে:[৭৫]

আরবী ছন্দ শাস্ত্র উপেক্ষা করে তিনি বহু কাব্য রচনা করেছেন কিন্তু এগুলো কাব্য হিসেবে অপূর্ব ও অভিনব হিসেবেই বিবেচিত। এ কথা তাঁর কঠোর সমালোচকরাও স্বীকার করে নিয়েছেন। ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁর এতো দখল ছিল যে, তিনি অনর্গল পদ্যে কথা বলতে পারতেন। এমন হঠাৎ রচিত কিছু কবিতা আছে, যা তাঁর অন্যান্য রচনার মতোই মান সম্পন্ন। তিনি বলতেন, ইচ্ছা করলে তিনি সর্বদা পদ্যে কথা বলতে পারেন। আবুল আতাহিয়্যার কবিতায় কৃত্রিমতা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, যা তাঁর সময়ে প্রায় সর্বজনীন। তাঁর কবিতায় আরবান জীবনের প্রকৃতির প্রতিফলন না হলেও তাঁর কবিতা প্রাচীন আরব মরুচারিতার রূপ ও রং অনুস্মরণ করা হয়েছে। কাব্য রচনায় প্রাচীন শোকগাঁথা কাসীদার গঠনপ্রকৃতি প্রত্যাহার করার ক্ষেত্রে আবুল আতাহিয়্যা সর্ব প্রথম অগ্রগামী ছিলেন। তিনি বহু মাত্রা ছন্দ ব্যবহার করে অনর্গল কাব্য রচনায় পারদর্শী ছিলেন। আরব দার্শনিক কবিদের মধ্যে তিনি প্রথম সারির কবি হিসাবে বিবেচিত। তাঁর রচিত অধিকাংশ কবিতায় সাধারণ জীবন-যাপন ও নৈতিকতার ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে, কখনো কখনো তাতে নৈরাশ্যতার আবরণও দেখা যায়। আর, তিনি উৎপথগামীর অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণমুক্ত। কবি আবুল আতাহিয়্যা সাধারণ একজন কুম্বকার থেকে ইতিহাসের বিশিষ্ট অংশ হয়ে উঠেন। এজন্য তাঁকে দীর্ঘ বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। কবিত্ব শক্তির নিয়মিত পরিচর্যা ও কঠোর সাধনা তাঁকে সমকালীন সাহিত্যাঙ্গনে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে তিনি কঠিন বাস্তবতার মখোমুখি হয়েছেন। তিনি খুব কাছ থেকে ক্ষমতাসীন মানুষের ভোগ বিলাস ও অনাচার অবলোকন করে বিস্মিত ও হতভম্ব হয়েছেন। সেই সাথে দুনিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এর আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন। ফলে প্রাসাদের কবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি কালক্রমে হয়ে উঠেন দুনিয়াবিমুখ যুহ্দ কবি। তাঁর কবিতার পঙক্তিতে ঝরে পড়েছে চিরস্থায়ী আখিরাতের পুঁজি গ্রহণের আকুলতা সেই সাথে দুনিয়ার প্রতি অবজ্ঞা। আব্বাসী যুগে যুহদ কবিতায় তিনি ছিলেন অন্যতম পতিকৃত ও পতাকাবাহী।[৭৬]

আবুল আতাহিয়্যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

আবুল আতাহিয়্যা সুশ্রী ছিলেন। গায়ের রঙ ছিল গৌরবর্ণ। মাথায় ছিল কালো কুচকুচে কুঞ্চিত কেশরাজি। তিনি ছিলেন আড়ম্বরপূর্ণ ও মার্জিত রুচির অধিকারী, ব্যবহারে ছিলেন আমায়িক। তাঁর

ভাষা ছিল সুমধুর। উচ্চ অথবা নিম্ন আওয়াজ নয়, মধ্যম আওয়াজে কথা বলতেন। তিনি হাসি-তামাশা পছন্দ করতেন। সদা থাকতেন হাস্যোজ্জ্বল, তাঁর হাসি-খুশি থাকাটাকে অনেকে যুহদ কবিতা রচনাকারী ব্যক্তির চরিত্রের বিপরীত মনে করতেন। তাদের ধারণা ছিল–তিনি যুহদিয়াত রচনা করলেও তাঁর ব্যাক্তি জীবনে এর কোন প্রভাব নেই। সালমুল খাসিরের ভাগিনা কবি আল-জাম্মায আবুল 'আতাহিয়্যার ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেন:[৭৭]

ما اقبحَ التزهيدَ من واعظٍ يُزهدُ الناسَ ولا يَزهدُ
لو كان فى تزهيدِه صادقاً أضحى وأمسى بيتُه المسجدُ

''কোন কবির যুহদের ভান করা কতইনা নিন্দনিয়! লোকদেরকে যুহদের কথা বলে নিজে যাহিদ হয়না; তিনি তাঁর যুহ্দ কর্মে যদি সত্য হতেন তা হলে সকাল-সন্ধা মসজিদ হতো তাঁর বাসস্থান।" কবির আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট স্বচ্ছল থাকা সত্ত্বেও তিনি খরচ করার ক্ষেত্রে খুব হিসেবি ছিলেন। জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জন্য সামান্যই ব্যয় করতেন। এ জন্য অনেকে তাঁকে কৃপণ মনে করতেন। আর কবি একাজকে মিতব্যয়িতা মনে করতেন। প্রকৃত পক্ষে কবি ছিলেন যাহিদ – দুনিয়া বিমুখ। অল্পে তুষ্টি ছিল তাঁর অসাধারণ গুণ। তিনি ছিলেন দারিদ্র্য প্রেমী। মহানবী (স.) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ও দারিদ্র্য প্রেমী ছিলেন। তিনি একজন যাহিদ হিসেবে দারিদ্র্যকে ভালোবেসেছেন আর এজন্যই দরিদ্রের মতো জীবন কাটাতেই তিনি পছন্দ করতেন। তিনি ছিলেন খুবই ধার্মিক মানুষ। যদিও কেউ কেউ তাকে যিন্দিকের অপবাদ দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর জীবন ধারা ও বিশাল সাহিত্য সম্ভারে এ অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি। বরং আল্লাহর উপর অবিচল বিশ্বাস ও আস্থা, একত্ববাদ, স্রষ্টার প্রশংসা, তাওবা, অনুতাপ, রাসূল (স.)-এর প্রতি ভালোবাসা, সম্মান, প্রশংসা এবং দুনিয়া বিমুখ কবিতা রচনার মাধ্যমে ধর্মভীরু একজন মুত্তাকী যাহিদ মানুষ হিসেবেই আমরা তাকে পাই। একই প্রসঙ্গ নিয়ে কবি আরো বলেন:[৭৮]

فيا عجبًا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحدُ
وللـه في كل تحريكةٍ، وفي كل تسكينةٍ شاهدُ
وفي كل شيء له آيةٌ، تدل علي أنه الو احدُ

"আশ্চর্য! লোকজন কীভাবে আল্লাহর অবাধ্য হয়! প্রত্যেক গতি ও স্পন্দন এবং নিরব নিস্তব্ধতা ও নিথরতারই যে সর্বদা আল্লাহর সাক্ষ্য রয়েছে।কীভাবে তার্কীকরা তাঁকে অস্বীকার করে? প্রত্যেক বস্তুতেই তার নিদর্শন আছে যা সাক্ষ্য দেয় যে তিনি এক ও অদ্বিতীয়"।

কবি শুধু মহান আল্লাহর একত্বের জয়গানই গাননি তিনি মহান স্রষ্টা আল্লাহর প্রশংসায় তাঁর হৃদয়ের অর্গল খুলে দিয়ে বলেছেন:[৭৯]

كُلُ يومٍ يأتني برزقٍ جديدٍ، من مليكٍ لنا غنيٍ حميدِ

قاهرٍ، قادرٍ، رحيمٍ، لطيفٍ، ظاهرٍ، باطنٍ، قريبٍ، بعيدٍ

"প্রতিদিনই নতুন নতুন রিযিক আসে আমাদের মালিকের পক্ষ থেকে যিনি ধনী, প্রশংসিত, ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী, শক্তিমান, সুক্ষ্মদর্শী, প্রকাশ্য, গোপন, নিকটবর্তী ও দূরবর্তী।"

আবুল আতাহিয়্যার কবিতায় এরকম আল্লাহ প্রেমের বহু পঙক্তি লক্ষ্যণীয়। তিনি যেমনি ছিলেন খোদাপ্রেমী ও তাঁর দাসানুদাস তেমনি তিনি ছিলেন রাসূল (স.)-এর প্রশংসা ও পদাঙ্ক অনুসরণে অগ্রগামী উম্মত। রাসূল (স.)-এর প্রশংসায় তিনি বহু কবিতা লিখেছেন। নিম্নে কয়েকটি পঙক্তি পেশ করা হলো:[৮০]

واحمدوا الله الذي اكرمكم بنبي قام فيكم فنصح

بنبي فتح الله به كل خيرنلتموه و شرح

"তোমরা সেই আল্লাহর প্রশংসা কর যিনি তোমাদেরকে সম্মানিত করেছেন এমন এক নবীর দ্বারা –যিনি তোমাদের মাঝে অবস্থান করে সদুপদেশ দিয়েছেন। যে নবীর দ্বারা আল্লাহ সেই সব কল্যাণের পথ খুলে দিয়েছেন–যা তোমরা লাভ করেছ। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত।"

এতো গেলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার বিষয়ে কবির মনোভাব। এ ছাড়া তাঁর বেশীর ভাগ কবিতাতেই ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন আদর্শের কথা উঠে এসেছে। অতএব নিন্দুকদের কথায় আমরা তাঁকে যিন্দিক বলতে পারি না বরং কবি ছিলেন –প্রবল ধর্মানুরাগী, আবেদ ও যাহেদ। কবি ছিলেন সাদা মনের অধিকারী এক দিব্য পুরুষ। তিনি তাঁর দোষ-ত্রুটি অপকটে স্বীকার করে নিতেন। শেষ জীবনে তিনি নির্জনতাকে বেশী করে আকড়ে ধরেছেন। তাওবা ইস্তিগফার আর ইবাদাতের মধ্যেই তিনি সময় অতিবাহিত করেছেন। তিনি স্বভাব কবি ছিলেন। সংসারের সবকিছু ছেড়ে দিলেও কবিতা তিনি ছাড়েননি। তবে শেষ জীবনের কবিতাগুলি ছিল পরকালের মুক্তি ও নাজাতের উসিলা স্বরূপ। সে সময়কার যুহদ কবিতাগুলো কবির গভীর ধর্মীয় মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। ইসলামী বিশ্বাকোষে তাঁর ধর্মনিষ্ঠা সম্পর্কে বলা হয়েছে:[৮১]

"অনেকের ধারণা যে, আবুল আতাহিয়্যা আরবী সাহিত্যের প্রথম দার্শনিক কবি। কিন্তু, দার্শনিক ভাবাপন্ন হলেও তাঁর কাব্যে ইসলামী ভাবধারা, মতাদর্শ ও ধর্মনিষ্ঠা সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা

রয়েছে। কাজেই তাঁর কাব্য সহজেই মুসলিম হৃদয় স্পর্শ করে থাকে।" জীবন-মৃত্যুর দার্শনিক ব্যাখ্যা কবি নি:শঙ্কুচে দিয়ে গেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর গভীর ধর্মীয় জীবন বোধই প্রকাশ পেয়েছে। যেমন তিনি বলেছেন:[৮২]

حيـــاتـــك أنفـــاس تعَـد، فكلمـــا مضي نفـس منهـا نقصتَ بـهـا جـزءأ

يـميتـُك مـا يحـييك، في كـل ساعـة ويحــدوك حـــاد ما يـريـد بك الـهـــزءأ

"তোমার জীবন কতিপয় গুণা নিশ্বাস মাত্র; যখনই শ্বাস গ্রহণ কর তখনই তুমি জীবনের একটি অংশ হারাও। যা দ্বারা বেঁচে থাক, প্রতি মুহূর্তে তাই তোমার মৃত্যু ঘনিয়ে আনে। তোমাকে এক চালক হাঁকাচ্ছে; সে তোমার সাথে নম্র হতে চায় না"।

পরিশেষে অমরা বলতে পারি যে, আবুল 'আতাহিয়্যার কবিতায় যুহ্দ বেশি পরিমাণে থাকলেও অন্যান্য বিষয়েও তিনি কাব্য রচনা করেছেন। প্রথম জীবনে তিনি কিছু গযল(প্রেমকাব্য) রচনা করেছেন। প্রেয়সী সু'দা ও 'উৎবাকে নিয়ে রচিত সেসব কবিতা মানোত্তীর্ণও হয়েছে। শৈশব থেকে কবি দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছেন। তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করেছেন কালের কুটিলতা, দুঃখ-যন্ত্রণা আর মিথ্যার বাগাড়ম্বর। তাঁর সাথে যুক্ত হয়েছে প্রেয়সী উৎবাকে হারানোর অসহ্য যন্ত্রণা। জীবন ও জগতে ছড়িয়ে থাকা অসঙ্গতি কবি হৃদয়কে ব্যথিত করেছে। শাসক ও অভিজাত শ্রেণীর আস্ফালন ও ভোগবাদী চরিত্র তাঁকে ভোগ-বিলাস থেকে বিমুখ করেছে। চিরন্তন ও অনিবার্য মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরের জীবনের বিভীষিকা কবি হৃদয়কে ভীত সন্ত্রস্ত করেছে। কবির উপলব্ধি মহান স্রষ্টা আল্লাহর নিকটই মানব জাতির শেষ প্রত্যাবর্তন। ফলে আল্লাহর ইবাদতের সন্তুষ্টি অর্জন কওে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ তাঁর কাব্যে আলোচিত হয়েছে। এসব বিষয়কে মোটা দাগে যুহ্দিয়াত বা মরমী কবিতা বলা হয়েছে। বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে কবি যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আবহমান কাল ধওে বয়ে আসা প্রচীন সাহিত্যের বিষয়সমূহ বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে নতুন বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। এক পর্যায়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে কম রন পূর্ণ যুহ্দ কবিতা দিয়েই তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর বিরল প্রতিভা, নিরলস সাধনা ও অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি প্রধান নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। ধর্মতাত্ত্বিক এসব কবিতার মাধ্যমে তিনি জাতিকে বার্তা পাঠিয়েছেন-শুদ্ধতা, সততা, তাকওয়া, সৎকর্মই গৌরবের বিষয়; বংশ গরিমা, আভিজাত্য, উচ্চ পদস্থ কর্মজীবন শ্রেষ্ঠত্বেও কোন বিষয় নয়। দুনিয়াই শেষ ঠিকানা নয়; অনিবার্য মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আখিরাতে পদার্পণ করতে হবে। আর জবাবদিহিতার কঠিনতম স্থান এই আখিরাত। সেখানে যে ব্যক্তি মুক্তি অর্জন করবে সে-ই সফল। এই সফলতার

স্বাদ সে অনিঃশেষ কাল ধওে ভোগ করতে থাকবে। আর, এজন্য প্রয়োজন অল্পে তুষ্টি, সৎ জীবন-যাপন, ধৈর্য ও সহনশীলতা, তাওবা ও ইস্তিগফার সর্বোপরি মহান স্রষ্টার নির্দেশ ও মহানবী(স.)-এর পদাংক অনুসরণ।[৮৩]

এভাবেই আবুল 'আতাহিয়্যা মরমীতত্ত্বের পথিকৃৎ হয়ে উঠেন। পরিশেষে, আমরা নির্ভরযোগ্যতার সাথে বলতে পারি যে, কবির ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি তাঁর কাব্যে লক্ষ্যণীয়। এর পরিমাণ এতো বেশি যে তাঁকে কোনভাবেই ধর্ম বিষয়ে উন্নাসিক ভাবতে পারি না। আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই কবি আবুল আতাহিয়্যা ছিলেন ইসলামী ভাবধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। কবি আবুল আতাহিয়্যা গণমানুষের কবি ছিলেন। খলীফার দরবারে থেকেও তিনি সাধারণ মানুষের কাতারে ছিলেন। দরবারী কবির বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে ছিল না বরং তাঁর কাব্যে ভোগ বিলাসের বিপরীত বক্তব্যই পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে গযল(প্রেমকাব্য) কবিতা লিখে পারদর্শীতা অর্জন করলেও শেষ বয়সে যুহদিয়াতই ছিল মূল স্থান। কবির কবিতাই তাঁর স্বভাব, প্রকৃতি বা চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে সমকালীন সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুহ্দ ও সুফীসাধক কবি হিসেবেই পেয়েছি। উন্নত নৈতিক চরিত্র তাঁর ব্যক্তিত্বকে সুমহান করে তুলেছিল। এ জন্য তিনি আজও দুনিয়া বিমুখ শ্রেষ্ঠ যুহ্দ কবি বা সুফীমরমী কবি হিসেবেই পরিচিত।[৮৪]

পাদটীকা ও তথ্য-নির্দেশিকা

১ নাজাহ্ আত্তার, 'আবুল 'আতাহিয়্যা; হিজ লাইফ এ্যন্ড হিজ পয়েট্রি,(লন্ডণ:এডিনবারগ ইউনিভার্সিটি, ১৯৫৮ খ্রি.),পৃ.৩২-৪০; 'আবুল 'আতাহিয়্যা, দীওয়ান(বৈরূত:দার বৈরূত, হি.১৪০৬/খ্রি.১৯৮৬), পৃ.৫-১০।

২. আবুল 'আতাহিয়্যা, দীওয়ান, ভূমিকা, পৃ.

৩ আবুল 'আতাহিয়্যা, দীওয়ান, পৃ.৩৯৪।

৪ প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৫-২৬।

৫ আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, *কিতাবুল আগানী* (কায়রো::দারলি কুতুব আল-মিসরিয়্যা,হি.১৩৬৯/খ্রি.১৯৫০),খ.৪,পৃ.৫-৬; নাজাহ্ আত্তার,'আবুল 'আতাহিয়্যা, হিজ লাইফ এ্যন্ড হিজ পয়েট্রি, পৃ.১৪৩-৫৫।

৬ আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, খ.৪, পৃ.৪-৭; আমদ হাসান আল-যায়্যাত, তারিখুল আদবিল 'অরাবী(কায়রো: দারন নাহদা, তা বি), পৃ.২৬৮।

৭ আবুল আতাহিয়্যা, দীওয়ান, পৃ.৬

৮ প্রাগুক্ত, পৃ.৬।

৯ প্রাগুক্ত, ৬।

১০ আহমদ হাসান আয-যায়্যাত, তারিখুল আদব, পৃ. ২৬৮-৭১; আবুল আতাহিয়্যা, দীওয়ান, পৃ.৭।

১১ আবুল আতাহিয়্যা, দীওয়ান, পৃ.৬

১২ আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, খ.১, পৃ.১৩।

১৩ আবুল আতাহিয়্যা, দীওয়ান, পৃ. ২১৩।

১৪ শাওকী দায়প, তারিকূল আদাবিল আরাবী(কায়রো:দারুল মা'আরিফ,তা বি),খ.৩,পৃ,২৪১।

১৫ শাওকী দায়ফ, তারিখুল আদাবিল আরাবী, খ.৩, পৃ. ২৩৮-৯৩; আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাবুল আগানী, খ৪, পৃ. ৩২-৩৭।

১৬ আবুল "আতাহিয়্যা, দীওয়ান, পৃ. ৪২৫; আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাবুল আগানী, খ৪, পৃ. ১০৯-১০।

১৭ আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাবুল আগানী, খ৪, পৃ. ৮৮।

১৮ আবুল 'আতাহিয়্যা, দীওয়ান, পৃ. ৪০২; আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাবুল আগানী, খ৪, পৃ. ১১০।

১৯ আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাবুল আগানী, খ.৪, পৃ. ১১১; আবুল 'আতাহিয়্যা, দীওয়ান, পৃ.২৬৮।

২০ প্রাগুক্ত, পৃ.২৪-২৫; শাওকী দায়ফ, তারিখুল আদাবিল 'অরাকী, খ.৩, পৃ.২৩৯; আবুল 'আতাহিয়্যা, ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.২, পৃ. ১০৯।

২১ শাওকী দায়ফ, তারিখ, পৃ.২৫২; আবুল 'আতাহিয়্যা, ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.২, পৃ.১০৯-১১০।

২২ আবুল 'আতাহিয়্যা, দীওয়ান, পৃ.১২৮।

২৩ আবুল 'আতাহিয়্যা, ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.২, পৃ.১০৮-১০।

২৪ আবদুল হক ফরিদী, আবুল 'আতাহিয়্যা, ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.২, পৃ.১০৯-১১২।

২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০-১১।

২৬ ইবন 'অবদিল বার্ও আল-কুরতুবী, আল-ইহতিবাল বিমা ফী শি'রি আবিল 'অতাহিয়্যা, পৃ.৭-৩২।

২৭ প্রাগুক্ত, পৃ.২০-৩০।

২৮ আবুল'আতাহিয়্যা, দীওয়ান, পৃ. ১২২।

২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।

৩১ প্রাগুক্ত, পৃ.১১৮।

৩২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮।

৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ.২৫।

৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ.২০।

৩৬ প্রাগুক্ত, পৃ.১২।

৩৭ প্রাগুত্ত, পৃ.১২।

৩৮ আবুল 'আতাহিয়্যা, দীওয়ান, পৃ.১৩।

৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬।

৪০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২; আবুল ফরাজ আল-ইফাহানী, কিতাবুল আগানী, খ.৪, পৃ.৪৬।

৪১ আল-কুর'আন, ৩১:৩৪।

৪২ আবুল 'আতাহিয়্যা, দীওয়ান, পৃ.৪৭।

৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ.১২৮।

৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৫; আবুল পারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাবুল আগানী, পৃ. ১০৯।

৪৫ আবুল 'আতাহিয়্যা, দীওয়ান, পৃ.৪৩৯।

৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩০।

৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪।

৪৮ আবদুল হক ফরিদী, আবুল 'আতাহিয়্যা, ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, পৃ. ১০৮।

৪৯ প্রাগুক্ত, পৃ.১০৮-৯।

৫০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮-১১০।

৫১ আবুল 'আতাহিয়্যা, দীওয়ান, ভূমিকা, পৃ. ৯-১০; আবুল ফরাজ ইসফাহানী, আল-আগানী, খ. ৪, পৃ.১৩।

৫২ আবদুল হক ফরিদী, আরব কবি আবুল 'আতাহিয়্যা, পৃ.২৮১-৮৮।

৫৩ আবুল 'আতাহিয়্যা আশ'অরুহু ওয়া আখবারুহু (দামিশক: মাতবা'অতু জামি'আ, হি.১৩৮৪/খ্রি.১৯৬৫), সম্পাদনা, ইবনু 'আবদিল বার্‌র, পৃ. ২৭।

৫৪ আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাবুল আগানী, খ.৪, পৃ.১৫।

৫৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

৫৬ আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাবুল আগানী, খ.৪, পৃ.১১-১২; আবুল 'আতাহিয়্রঅ, দীওয়ান, পৃ. ৪১২।

৫৭ আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাবুল আগানী, খ.৪, পৃ.১০-১১; আবুল ‘আতাহিয়্রঅ, দীওয়ান, পৃ. ৩৪৬।

৫৮ A. Gullaume, Abu'l-‘Atahiyya, Encyclopaedia of Islam, V. I, pp.108.

৫৯ আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাবুল আগানী, খ.৪, পৃ. ৩৯-৪০; আবুল ‘আতাহিয়্যা, দীওয়ান, ভূমিকা, পৃ.৬।

৬০ আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাবুল আগানী, খ. পৃ.১৫।

৬১ আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাবুল আগানী, খ. পৃ.১১; ড. শুকরী ফয়সাল, আবুল ‘আতাহিয়্যা আশ‘আরুহু ওয়া আখবারুহু, পৃ.২৯।

৬২ ড. শুকরী ফয়সাল, আবুল ‘আতাহিয়্যা আশ‘আরুহু ওয়া আখবারুহু, পৃ. ২৬-৩১।

৬৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩৪।

৬৪ আল-মু‘আল্লাকাতুস-সাব‘ (করাচি;মাকতাবাতুল-বুশরা, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি.), সম্পা. আয-যূযানী, পৃ.৭৮-৭৯।

৬৫ ড. আবদুল জলীল, কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল(স.) ও সাহাবীদেও মনোভাব (ঢাকা: ই ফা বা, ২০০৪খ্রি.), পৃ. ১২০।

৬৬ ‘আলী (রা.), দীওয়ান ‘আলী .(ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০০২ খ্রি.), পৃ.১১৪।

৬৭ ড. আবদুল মা‘বূদ, আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রকিভা, পৃ. ১০৯।

৬৮ ড. আবদুল জলীল, কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল(স.) ও সাহাবীদেও মনোভাব, পৃ.৯৭।

৬৯ ড. শাওকী দায়ফ, তারিখুল-আদাবিল ‘আরাবী (কায়রো;দারুল-মা‘অরিফ, ১৯৬৩ খ্রি.), খ.২, পৃ.৩৭৩-৪।

৭০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪।

৭১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫।

৭২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪-৮।

৭৩ ইবন আবদিল বার্‌র আল-কুরতুবী, আল-ইহতিবাল বিমা ফী শি‘রি আবিল ‘আতাহিয়্যা মিনাল হিকামে ওয়াল-আমছালি(আবূ জাবী: সংযুক্ত আরব আমিরাত, ১৪৩০/২০০৯), পৃ.১-৩০; উমর ফর্‌রূখ, তারিখুল আদাবিল-‘আরাবী, খ.২, পৃ.১৯০-৯৫; শাওকী দায়ফ, তারিখুল আদাবিল আরাবী, খ.৩, পৃ.২৩৭-৫৩।

৭৪ ইবন আবদিল বার্‌র আল-কুরতুবী, আল-ইহতিবাল বিমা ফী শি‘রি আবিল ‘আতাহিয়্যা মিনাল হিকামে ওয়াল-আমছালি (আবূ জাবী: সংযুক্ত আরব আমিরাত, ১৪৩০/২০০৯), পৃ.১-৩০; উমর ফর্‌রূখ, তারিখুল আদাবিল-‘আরাবী, খ.২, পৃ.১৯০-৯৫; শাওকী দায়ফ, তারিখুল আদাবিল আরাবী, খ.৩, পৃ.২৩৭-৫৩।

৭৫ আবদুল হক ফরিদী, "আবুল 'আতাহিয়্যা", ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা, ২০০৫ খ্রি., খ.২, পৃ. ১০৮-১২; A. Guillaume, "Abu"l-'Atahiya",The Encyclopaedia of Islam,(Leiden:E J Brill, 1986), V.i, pp.107-8.

৭৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-৮।

৭৭ আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাবুল আগানী, খ.৪, পৃ.৭৫-৭৬; উমর ফররূখ, তারিখুল আদাবিল 'আরাবী, খ.২, পৃ. ১৯১, টীকা, ১।

৭৮ আবুল 'অতাহিয়্যা, দীওয়ান, পৃ. ১২২।

৭৯ আবুল 'অতাহিয়্যা, দীওয়ান, পৃ.১৪৬।

৮০ প্রাগুক্ত, পৃ.১১৮।

৮১ আবদুল হক ফরিদী, "আবুল 'আতাহিয়্যা", ইসলামী বিশ্বকোষ., খ.২, পৃ. ১০৮-১২।

৮২ আবুল 'আতাহিয়্যা, দীওয়ান, পৃ, পৃ.১৪।

৮৩ ড. 'উমার ফুর্‌রূখ, তারিখুল আদাবিল 'আরাবী(বৈরূতঃ দারূল 'ইলমি লিরমালা'ঈন, ১৪০১/১৯৮১, খ.২, পৃ.১৯০-৫।

৮৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০-২।

চতুর্থ অধ্যায়
ইবনুল ফারিদের জীবন ও সূফীকাব্য

ইবনুল ফারিদের জন্ম, শৈশব ও কর্ম জীবন

আরব সূফীমরমী কবি ইবনুল ফারিদের (হি.৫৭৬-৬৩২/খ্রি. ১১৮১-১২৩৫) পূর্ণ নাম আবু হাফস ‘উমর ইব্ন আবিল হাসান ‘আলী ইব্ন আল-মুরশিদ ‘আলী। তিনি আয়্যুবী সুলতানদের চারজন সুলতানের শাসনামলে মিসওে ৫৬৭/১১৮১) সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৩২/১২৩৫) সালে মিসরেই মুত্যুবরণ করেন। যৌবন ও পরিণত বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে তিনি তাঁর অমর সূফীকাব্য রচনা করে সূফীকবি-সম্রাটের আসন অলংকৃত করেছেন। এ সময় মিসর ও সিরিয়ায় যুহ্দ ও সূফীতত্ত্বের ব্যাপক অনুশীলন হতো। সুলতান সালাহুদ্দীন মিসরে খানকাহ্ সা‘ঈদুস-সু‘আদা’(السُعَدَاء خَانقاهْ سَعِيدُ) নামের ‘দুওয়ায়রাতুস-সূফীয়্যাহ’(دُوَيْرَةُ الصُوْفِيَة) খানকাহটি প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনুল ফারিদের ১৬৪৪ চরণের একমাত্র ক্লাসিক ও সূফী কবিতাসংকলন ‘দীওয়ান ইবনুল ফারিদ’ বিশ্বজুড়ে স্থায়ী সুখ্যাতি লাভ করে। তাঁর রচিত দীওয়ান একটি ব্যতিক্রমধর্মী শৈল্পিকরূপে আরবী সূফীকাব্য। কবিতায় অপরিচিত শব্দের ব্যবহার পরিহার, বাক্যগঠনে কোমলতা ও সূক্ষ্মতার আশ্রয়, ভাষায় নতুন কলাকৌশল, ভাবধারা, সাংকেতিক, প্রতীকী ও রূপালংকার ব্যবহার, প্রেয়সীর বাস্তুভিটার স্মরণে কবিতার সূচনা পরিহার, সুরম্য অট্টালিকা, রাজকীয় প্রাসাদ ও মদের বর্ণনা, উপমা-উদাহরণ, কাসীদার বিভিন্ন অংশের সাথে পরস্পর সুসম্পর্ক এবং ছন্দের অন্ত্যমিল স্থাপনে গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদি বিষয়গুলো মিসওে চারজন আয়্যুবী সুলতানদের বিশেষ করে সুলতান আল-কামিল(হি.৫৭৬-৬৩৫/খ্রি.১১৮০-১২৩৭)-এর শাসনামলে রচিত আরবী কবিতার বৈশিষ্ট্য ছিল। ইবনুল ফারিদের রচিত কবিতায় এসব বৈশিষ্ট্য ব্যাপক প্রসার লাভ করে। কাব্যসাহিত্যের এসব বিষয়ের আদলেই ইবনুল ফারিদ তাঁর আরবী সূফীকাব্য রচনা করেন। মিসরে আয়্যুবী শাসনামলে আরবী কাব্যসাহিত্যের আকাশে ইবনুল ফারিদ ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি তাঁর অমর কাব্যগ্রন্থ দীওয়ান ইবনুল ফারিদের মাধ্যমে আরবী সূফীকাব্য একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। অদ্যাবধি পাঠক ওলোকগীতি ও সাংকেতিক বা প্রতীকী অর্থ ব্যবহারের কারণে ইবনুল ফারিদের রচিত কবিতা পাঠক, গবেষক, পণ্ডিতবর্গ, সূফীকবি ও সুধীজনের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।[১]

ইবনুল ফারিদ মিসরের আরব সূফীকবি ও সুলতানুল ‘আরিফীন উপাধীপ্রাপ্ত একজন প্রখ্যাত আরব মরমীকবি ছিলেন। পচঁ শত বৎসর স্থায়ী ‘আব্বাসী শাসনামলে ‘আরবী ভাষার বহু কবি ও সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আয়্যুবী সুলতান সালাহউদ্দীন আয়্যুবীর শাসনামলের একজন বিখ্যাত সূফী

কবি ছিলেন। তাঁর বাপ-দাদার গবেষকদের কাছ থেকে তাঁর কাব্যস্মৃতি কখনো বিলীন হয়নি। তাঁর শিল্পরূপ সূফীকাব্য তথা আরবী মরমি কাব্য বিনির্মাণের পেছনে সে সময়ের বেশ কয়েকজন কবি ও সাহিত্যিকের অনুপ্রেরণা কাজ করছিল। তাঁদের মধ্যে খামরিয়্যাহ কবিতা রচনায় পারদর্শী কবি আবূ নুওয়াস (মৃ.১৯৯/৮১৪), হিজাযী কবিতা রচনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি শরীফ আর-রাযী (মৃ.৪০৫/১০১৬) এবং গযল (প্রেমকাব্য) রচনায় বিশিষ্টকবি 'আব্বাস বিন আহনাফ (মৃ.১৯২/ ৮০৭)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। সূফীকাব্য রচনায় আক্ষরিক অর্থের পরিবর্তে সাংকেতিক, রূপক, ধাঁধাঁ, রূপালংকার, শ্লেষালংকার, বিরোধালংকার, চৌপদী, আবাসভূমি ছিল সিরিয়ার হামাত প্রদেশে। আর সেখানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈসবে বেড়ে উঠেন। তিনি ইসলামী চিন্তাশীল ও সূফী তত্ত্বের মরমী কবি ছিলেন। ইবনুল ফারিদ মিসরীয় একজন সূফী কবি হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পূর্বে তাঁর বাপ-দাদার আবাসভূমি ছিল সিরিয়া প্রদেশের হামাতে, সেখান থেকে তাঁরা মিসরে চলে আসেন। এখানেই ইবনুল ফারিদ শৈশবে বেড়ে উঠেন। তিনি ইসলামী চিন্তাশীল ও সূফী তত্ত্বের মরমী কবি ছিলেন। তাঁর রচিত কবিতা সংকলনের একটি দীওয়ান রয়েছে। আরবী তা' ছন্দে রচিত তাঁর একটি বিখ্যাত কাসীদা এবং মীম ছন্দে রচিত খামরিয়্যা শিরোনামের আরো একটি বিখ্যাত কাসীদা এই দীওয়ানে স্থান পেয়েছে।[২]

ইবনুল ফারিদের সময়কালীন কবিদের মাঝে দুটো বিষয়ের উপর কবিতার বেশ চর্চা ছিল: ১. সূফীমতবাদ এবং ২. ফিসক ফুজুর। ইবনুল ফারিদ সূফীমতবাদকে জীবনের ব্রতী হিসাবে গ্রহণ করেন। তৎকালীন সমাজে ফিসক ফুজুর, পরনিন্দা চর্চা ইত্যাদির হাত থেকে নিজকে বাচাঁবার জন্য আত্মারপরিশুদ্ধি, খোদাভীতি অর্জনের প্রতি গভীর দৃষ্টিদান করেই তিনি সূফী তরীকায় দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাসাওফের এ চর্চার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় তাঁর কবিতায়। তিনি ছিলেন কোমল স্বভাবের অধিকারী এবং খোশআলাপী ও খোদাভীরু তবে জাতি সত্ত্বার ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। সুন্দর সকল বস্তু ও সুর আকৃতি সবই তাঁকে আকৃষ্ট করত। উপত্যকা, নির্জন অরণ্যের প্রতি ছিল তাঁর আকর্ষণ। দানশীলতা, বদান্যতা, অধিক কল্যাণকর কাজের প্রতি তাঁর আত্মার ঝোঁক ছিল বেশী। তখন সে পরিবেশে দুটো ধারার প্রচলন ছিল: ১. মানুষ পরকালের ভয়ে সূফী মতবাদ ও তাকওয়া অবলম্বন করত এবং ২. মানুষের মাঝে ব্যাপক ভাবে কুসংস্কার, অপসংস্কৃতি, পরনিন্দা, কুৎসা রটনা ইত্যাদির চর্চা ছিল।[৩]

ইবনুল ফারিদ যেহেতু দ্বীনের পরিবেশে লালিত-পালিত হন, সেজন্য তিনি প্রথমোক্ত অবস্থা অর্থাৎ তাকওয়া ও সূফীয়ানা নীতি অনুসরণ করে নিজ পরিবারের কাব্যচর্চা নীতি অবলম্বন করেন। তাঁর কবিতায় বেশীর ভাগই আল্লাহর প্রশংসা ও পরকালের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর উলে-

খযোগ্য কাব্যগুলো ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পরিসরে বিভক্ত। এ দুই ধরনের কবিতার মধ্যেই সূফীমতবাদের উদ্দেশ্যাবলী সর্বত্র স্থান পেয়েছে। তখনকার আরবী কাব্যে ও গল্পে নতুন শব্দের সৃষ্টি, সংযোজন, সংস্করণ ইত্যাদির বেশ প্রভাব ছিল। তাঁর কবিতায় জড়বাদী ধর্মবাদী উভয়দিকের ইঙ্গিত রয়েছে। সমকালীন সূফীদেও তাসাওফ-মজলিসে এশকে ইলাহী বিষয়ক, প্রেমাস্পদ আলোচনা, মদ্য, প্রেম, বিরহ ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা ব্যাপক স্থান পেয়েছে। কবি ইবনুল ফারিদ মহান আল্লাহর আধ্যাত্মিক-প্রেম মদ্যপান সম্পর্কে ও সূফীতত্ত্বের বিষয় নিয়ে নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করেন:[৪]

شربنـــا على ذكـــر الحبيـبِ مُدَامَـةً سَكِـرْنَـا بِـهَ مِن قَبْـلِ أَنُ يخُلـقَ الكَـرَمُ

لهَـا البَـدْرُ كـأَسٌ و هِي شَمسٌ يُدِيـرُهـاَ هِـلاَلٌ وكـم يبـدو إذا مُـزِجَـتْ نُـجـمُ

“আমরা প্রেয়সীর স্বরণে মদ্য পান করেছি এবং মর্যাদা সৃষ্টির পূর্ব থেকে তার নেশায় আমরা মাতাল রয়েছি; পূর্ণিমার চাঁদ হলো তার পাত্র, আর সে (প্রেয়সী) হলো সূর্য যাকে কেন্দ্র কব্রে চাঁদ আবর্তণ করছে, সে কখনো উদিত হয় এমন সময় যখন আকাশে নক্ষত্র থাকে না।”

ইবনুল ফারিদ রচিত কবিতা সংকলনের একটি দীওয়ান রয়েছে। আরবী তা’ ছন্দে রচিত তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতা এই দীওয়ানে স্থান পেয়েছে। ইবনুল ফারিদের সময়কালে লোকদের মাঝে দুটো বিষয়ের বেশ চর্চা ছিল: সূফীবাদ ও ফিসক ফুজুর। তিনি সূফীবাদকে জীবনের ব্রতী হিসাবে গ্রহণ করেন। তৎকালীন সমাজে ফিসক ফুজুর, পরনিন্দা চর্চা ইত্যাদির হাত থেকে নিজকে বাচাঁবার জন্য আত্মার পরিশুদ্ধি, খোদাভীতি অর্জনের প্রতি গভীর দৃষ্টিদান করেই তিনি সূফী তরীকায় দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাসাওফের আধ্যাত্মিক চর্চার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় তাঁর রচিত কবিতায়। তিনি ছিলেন কোমল স্বভাবের অধিকারী এবং খোশআলাপী ও খোদাভীরু। তবে জাতিসত্ত্বার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। সুন্দর সকল বস্তু ও সুর আকৃতি সবই তাঁকে আকৃষ্ট করত। উপত্যকা, নির্জন অরণ্যের প্রতি ছিল তাঁর আকর্ষণ। দানশীলতা, বদান্যতা, অধিক কল্যাণকর কাজের প্রতি তাঁর আত্মার ঝোঁক ছিল বেশী। তখন সে পরিবেশে দুটো ধারার প্রচলন ছিল: **১**. মানুষ পরকালের ভয়ে সূফী মতবাদ ও তাকওয়া অবলম্বন করত। **২**. মানুষের মাঝে ব্যাপক ভাবে কুসংস্কার, অপসংস্কৃতি, পরনিন্দা ইত্যাদির চর্চা ছিল। ইবনুল ফারিদ যেহেতু দ্বীনের পরিবেশে লালিত সেজন্য তিনি প্রথমোক্ত অবস্থা অর্থাৎ তাকওয়া ও সূফীয়ানা নীতি অনুসরণ করে নিজ পরিবারের কাব্যচর্চা নীতি অবলম্বন করেন। তাঁর কবিতায়বেশীর ভাগই আল্লাহর প্রশংসা ও পরকালের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলো ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পরিসর বিভক্ত। এ দুই ধরনের কবিতার মধ্যেই সূফীবাদের উদ্দেশ্য স্থান পেয়েছে। তখনকার কাব্য, গল্পে নতুন শব্দের সৃষ্টি, সংযোজন ইত্যাদির বেশ প্রভাব ছিল। তাঁর কবিতায় জড়বাদী ধর্মবাদী উভয়দিকের ইঙ্গিত রয়েছে। তাসাওফের মজলিসে

এশকে ইলাহী বিষয়ক, প্রেমাস্পদ আলোচনা, মদ্য, প্রেম, বিরহ ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে।[৫]

কবি ইবনুল ফারিদে নাম 'উমার, উপ-নাম আবুল কাসিম অথবা আবূ হাফস। তাঁর উপাধী শরফুদ্দীন, সুলতানুল আশিকীন, তাঁর পিতান নাম আলী ইবন মুরশিদ আল-হামাভী আল-মিসরী আল-সা'দী। তাঁর পূর্ণনাম শরফুদ্দীন আবুল কাসিম 'উমার ইব্ন আলী ইব্ন মুরশিদ আল-হামাভী আল-মিসরী আস-সা'দী। তবে, 'ইবনুল ফারিদ' নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। আল-ফারিদ তাঁর পিতা আলী ইবন মুরশিদের উপাধি। আল-ফারিদ অর্থ পুরুষ ও মহিলা উত্তরাধিকারীদের অংশ বিতরণকারী। তাঁর পিতা মিসরের আদালতে উত্তরাধিকার-বিষয়ক(ফারা'ইদ) বিচারকার্য সম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এজন্য তাঁকে আল-ফারিদ নামে অভিহিত করা হতো। পিতার এ নামেই ইবনুল ফারিদ তাঁর নিজস্ব খ্যাতি লাভ করেন। সাধারণ জনগণ তাঁকে 'ইবনুল ফারিদ' হিসেবেই গ্রহণ করেছে। কবি স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হন। তখন রাসূলুল্লাহ(স.)তাঁকেজিজ্ঞেস করেন যে, তাঁর বংশপরিচয় কী। জবাবে তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ(স.)! আপনার দুধ-মাহালিমা আস-সা'দিয়াহ (রা.)-এর বংশ বনুসা'দ হচ্ছে আমার বংশ। এই বংশে আমার জন্ম। আমার পিতা ও পিতামহ আমাকে এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) কবিকে বলেন:[৬]

لَا، بَلْ أَنْتَ مِنِّيْ وَنَسَبُكَ مُتَصِلٌ بِيْ.

"না, বরং তুমি আমার এবং তোমার বংশ আমার(আনুগত্যের) সাথে সম্পর্কযুক্ত।" এরপর রাসূলুল্লাহ(স.) কে ইবনুল ফারিদ আবারও বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ(স.)! আমার বংশ-লতিকার ক্রমধারা বনু সা'দ পর্যন্ত পৌঁছে বলে আমার পিতা ও পিতামহ থেকে তা আমি মুখস্থ করে রেখেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) উচ্চৈঃস্বরে আবারো বলেন:

"না, বরং, তুমি আমার এবং তোমার বংশ আমার (আনুগত্য ও ভালোবাসার) সাথে সম্পর্কযুক্ত।" ইবনুল ফারিদ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ(স.)! আপনি সত্য বলেছেন সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সাথে ইবনুল ফারিদের পারিবারিক সম্পর্ক না থাকলেও তাঁর সাথে কবির আত্মার ও ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে, যা মুসলিম উম্মাহর কাছে অধিক সম্মান ও মর্যাদার বিষয়। এই বর্ণনাটি ইবনুল ফারিদ প্রায় সময় উল্লেখ করতেন। স্বপ্নটি প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করার পেছনে অধিক নির্ভরযোগ্য কোনো সনদ নেই।[৭]

তবে আবদুর রহমান আল-জামি(মৃ.১৩৬৬/১৯৪৬) বিশুদ্ধ সূত্রে কবির দৌহিত্র ‘আলীর বরাত দিয়ে দীবাজাতু দীওয়ান ইবনিল ফারিদ গ্রন্থে বলেন:[৮]

"بأنّه من قبيلة بني سعد، قبيلة حليمة السعدية التي أرضعت رسول الله يذكر لنا الشيخ عليّ عن ولد شاعرنا بأنّه قال: ﷺرأيت الشيخ رضي الله عنه نائماً وهو يقول: صدقت يا رسول الله (ص) واستيقظ من نومه وسألته عن سبب ذلك فقال: يا ولدي رأيت رسول الله في المنام وقال لي: يا عمر لمن تنتسب فقلت: يا رسول الله انتسب إلى بني سعد قبيلة حليمة السعدية فقال: لا بل أنت منّي ونسبك متصل بي ".

জন্মগ গতভাবে তিনি মিসরের অধিবাসী ইনুল ফারিদ সিরিয়ার হামাতের সাথে সম্পর্কিত হলেও ছিলেন। মিসরেই তিনি লালিত-পালিত হয়ে যৌবন ও বয়োঃপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং মিসরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। কবি ইবনুল ফারিদ তাঁর মাতৃভূমি মিসর সম্পর্কে বলেন:[৯]

وَطَـنِـيْ مِصْرُ وَفِيْهَـا وَطَـرِيْ وَلِعَـيْنِـيْ مُشْتَهَـاهَا مُشْتَهَـاهـاَ
وَلِنَـفْسِيْ غَـيْـرَهَـا، إِنْ سَكَـنَتْ يَـا خَلِيْلَيْ سَلاَهَـا مَـا سَلاَهَـا

“মিসর আমার জন্মভূমি, আমার মনোবাঞ্ছা তার মধ্যে পূরণীয়।এই মিসরের মুশতাহা স্থান আমার কাঙ্খিত নয়নাভিরাম স্থান। ওহে আমার বন্ধু! ডমসর ব্যতীত অন্য কারো প্রতি আমার মনের আকর্ষণ হবে কষ্টদায়ক ও প্রশ্নবিদ্ধ।”

কবির বয়স যখন ৩৫ বছর তখন তিনি শায়ক আবুল হাসান মুহাম্মদ ‘আলী আল-বাক্কাল নামক এক রহস্যময় সূফী সবজী বিক্রেতাকে এলোমেলো ওজু করা অবস্থায় সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি কবিকে বলেন যে, তিনি শুধু পবিত্র মক্কা গমন করে তাঁর কাঙ্খিত মনের স্বর্গীয় অর্গল খুলতে পারবে। সবজী বিক্রেতার কল্যাণে তিনি মক্কায় গমন করেন এবং সেখানে ১৫ বছর অবস্থান করার মাধ্যমে তিনি তাঁর কাঙ্খিত মনের অর্গল খুলতে সামর্থ্য হন। তিনি বলেন:[১০]

لايكاد يتصل بالناس إلاحين كان يأتي إلي الحرم الشريف معطوفا به، مصليا، فيه.

“…as I entered it [Mecca] enlightenment came to me wave after wave and has never left”.

তারপর তিনি নিম্মের কবিতাটি রচনা করেন:[১১]

يا سميري رَوح بمكة روحي شاديا إن رغبت في إسعادي
كان فيها أنسي ومعراج قدسي ومقامي المقام والفتح باد

“ওহে আমার রাতের সঙ্গী! যদি তুমি আমার মনকে পুলকিত করতে চাও, তাহলে পবিত্র মক্কার গুণাগুণ বর্ণনা করার মাধ্যমে তুমি আমার আত্মাকে উজ্জীবিত কর; তাতে (পবিত্র মক্কায়) রয়েছে

আমার অন্তরঙ্গতা, আমার ধর্মপ্রাণতার সমুত্থান, মকামে ইব্রাহীমে আমার অবস্থান এবং পরিষ্কার আলোক-সম্পাত”।

কবি ইবনুল ফারিদের মত একজন বিশিষ্ট আরব সূফী কবি সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে থোমাস এ্যমিল হোমারিন তাঁর সম্পর্কে অভিমত প্রদান করে বলেন:[১২]

"Contemporary religious singers and writers, including Nobel laureate Naguib Mahfouz, continue to cite the poet's verse. Using biographies, polemics, legal rulings, histories, and novels, Homerin traces the course of Ibn al-Farid's saintly reputation. He relates the rise and fall of Ibn al-Farid's popularity to Egypt's changing religious, cultural, and political environment Homerin's historical narrative reveals the dierent lenses through which people have read Ibn al-Farid's writings, the influence such readings have had on the practice and literature of Islam, and the varying viewpoints individuals have held regarding the importance of this holy man".

কবির পিতা আল-ফারিদ সিরিয়ার হামাত নগরীর এক ধণাঢ্য মুসলিম পরিবারের অধিবাসী ছিলেন। হামাত ত্যাগ করে তিনি পরে মিসরের কায়রো নগরীতে চলে আসেন। কায়রোর এই ধনাঢ্য মুসলিম পরিবারে ৫৭৭ /১১৮১ ইবনুল ফারিদ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্মসাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ‘ইব্ন খাল্লিকানের মতে তিনি ৫৭৬/১১৮০ মিসরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইবন ইয়াসিরের বরাতে মুস্তফা হিলমী বলেন, তিনি ৫৭৭/১১৮১সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনুল ইমাদের মতে তিনি ৫৭৭/১১৮১ জন্মগ্রহণ করেন। প্রফেসর ড. ফাদার জোসেফ স্কাতূলীনের গবেষণালব্ধ অভিমত হলো, তাঁর সঠিক জন্মতারিখ ৫৬৭/১১৮১। বাল্যকালে ইবনুল ফারিদ পিতার তত্ত্বাবধানে বড় হতে থাকেন। ধর্ম-কর্ম পালনে, পবিত্রতায়, যুহ্দিয়াত বা দুনিয়া-বিমুখতায় তিনি অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদ ও অল্পেতুষ্টির কারণে তিনি দুনিয়া বিমুখতার প্রবাদপুরুষে পরিণত হন।[১৩]

ইবনুল ফারিদ সুন্নী মতাবলম্বী শাফি‘ঈ আইন ও হাদীসে রাসূল(স.) ব্যাপক অধ্যয়ন করেন। বুরহানুদ্দীন আল-জা‘বিরী (মৃ.৬৮৭/১২৮৮), শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ আলকিমী (মৃ.৬৮৫/১২৮৬), শিহাবুদ্দীন আসসোহরাওয়ার্দী (মৃ.৬৩২/১২৩৪) ও যাকীউদ্দীন আব্দুল আজীম আল-মুনযিরী (মৃ.৬৫৬/১২৫৮) প্রমূখ সমকালীন প্রখ্যাত আলিমগণের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। ‘যাকী উদ্দীন

আব্দুল আজীম আল-মুনযিরী (মৃ.৬৫৬/১২৫৮) ছিলেন সমকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। ইবনুল ফারিদ তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তিনি ইবনুল 'আসাকির আদ-দিমাশকী(মৃ.৬০০/১২০৩)-এর কাছ থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। এক পর্যায়ে সূফীদর্শন ও সূফীতত্ত্বের প্রতি তাঁর প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠে এবং যুহ্দিয়াত বা দুনিয়াবিমুখিতা নিঃসঙ্গ জীবনকেই তিনি বেছে নেন। তিনি জীবনের শেষ চারবছর মাতৃভূমি মিশরেই অবস্থান করে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনী বক্তৃতা করতেন। আধ্যাত্মিক জগতের এই রাজপুত্র ২রা জুমাদীল উলা, ৬৩২/১২৮৪ কায়রোতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর অন্তিমউপদেশ অনুযায়ী কায়রোর মুকাত্তাম পাহাড়ের পাদদেশে 'আরীদ" নামক স্থানে পরদিন তাঁর নির্মিত মসজিদের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর জানাযার নামাজে বিপুলসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মুসল্লী উপস্থিত ছিলেন। এখনও তাঁর মাযারে ভ্রমণকারীদের ভিড় লেগে আছে।[১৪]

যুহ্দ ও সূফীতত্ত্বের প্রতি অনুপ্রেরণা

একদিন ইবনুল ফারিদ মিসরের জামি' মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করতে প্রবেশ করে দেখেন যে, খতীব খুতবা দিচ্ছেন, আর নাম না জানা একজন-লোককে মসজিদের ভেতর গান গাইতে দেখেন। তিনি লোকটিকে অতি সংগোপনে আদবের সাথে দূরে সরিয়ে দিলেন। নামাজ শেষে সকল মুসল্লী প্রস্থান করলে ইবনুল ফারিদ মসজিদ থেকে বের হয়ে দেখেন যে, গায়ক লোকটি তাঁর সামনে এসে নিম্নের কবিতাটি রচনা করেন:[১৫]

قَسَمَ الإِلَهُ الأَمْرَ بَيْنَ عِبَادِهِ فَالصَبُ يُنْشِدُ وَالْخَلِيُ يُسَبِحُ

وَلَعَمْرِيْ التَسْبِيْحُ خَيْرُ عِبادَةٍ لِلنَاسِكِيْنَ وَذاْ لِقَوْمٍ يُصْلِحُ

"আল্লাহ বান্দাদের মাঝে তাঁর নির্দেশ(হুকুম) ভাগাভাগি করে দিয়েছেন। অতএব, তাঁর অনুরক্ত বান্দা কবিতা রচনা করেন। আর তাঁর রিক্তহস্ত বান্দা তাসবীহ পড়েন। আমার জীবনের শপথ! সঠিকপথ অনুসরণকারী (নাসিক, যাহিদ) ও জাতীর সংস্কারকদের(মুসলিহ) জন্য তাসবীহ উৎকৃষ্ট ইবাদত"।

কবিতাটি শুনে ইবনুল ফারিদ যুহুদ বা আধ্যাত্মিকতার প্রতিযারপরনাই অনুপ্রাণিত হয়ে খ্যাতিমান মরমি কবি হতে চাইলেন।

ইবনুল ফারিদের সূফীকাব্য রচনার তাৎপর্য

ইবনুল ফারিদের কবিতায় মহান আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা (হুব্বুল ইলাহী)-এর বিষয়টি পূর্ববর্তী সূফীদের কবিতার বিষয়বস্তুর স্বরূপ থেকে পৃথকভাবে গৃহীত কতকগুলো নতুন সংযোজন মাত্র। তাঁর একমাত্র কাব্য সংকলন দীওয়ন ইবনুল ফারিদ গ্রন্থে সে গুলোর বিবরণ প্রকাশ পেয়েছে। যুহ্দ বা পার্থিব দুনিয়ার আকর্ষণ ত্যাগ করে পরকালীন কল্যাণ ও মুক্তির আশায় জীবন ও সম্পদ তুচ্ছ জ্ঞান

করে ঐকান্তিকভাবে মহান আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে জীবন ও জগতের যাবতীয় মোহ থেকে নিজেকে গুটিয়ে একমাত্র তাঁরই ইবাদতে লিপ্ত থাকাই ইবনুল ফারিদের যুহ্দ বা সূফীমতের তাৎপর্য। ইবনুল ফারিদ বলেন:[১৬]

فَلاَعَيْشَ فِيْ الدُنْيَا، لِمَنْ عَاشَ صَاحِيَا، وَمَنْ لَمْ يَمُتْ سُكْراً بِهَا فَاتَهُ الحَزْمْ

وَلَيْسَ لَهُ فِيْهَا نَصِيْبٌ، وَلاَ عَلَى نَفْسِهِ، فَلْيَبْكِ مَنْ ضَاعَ عُمْرُهُ، سَهْمْ

"এ পৃথিবীতে যে আত্মসংযমী হয়ে বসবাস করবে তার জন্য কোনো প্রকার আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ নেই, আর যে এখানে আল্লাহ-প্রেমে মরবেনা সে প্রকৃত দূরদর্শী নয়। অতএব, তাকে তার পরিণতির জন্য কাঁদতে দাও, যার জীবন সর্বস্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং সে সারাদিন আল্লাহ-প্রেমের মত্ততার কোনো অংশী-ধারী হবে না।" ইবনুল ফারিদ ছিলেন তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরব সূফীকবি বা আরব মরমি কবি (শা'ইর সূফী আল-'আরাবী), সুফীসাধক ও আল্লাহ-প্রেমিক(আশিকে ইলাহী)। আল্লাহ প্রেমের সত্যিকার প্রেমিক হিসেবে তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। সূফীতাত্ত্বিকগণ তাঁকে সুলতানুল আশিকীন বলেও অভিহিত করেছেন। ফার্সী কবি 'জালালুদ্দীন রুমীর (মৃ.৬৭২/১২৭৩) পরেই আরবী কবি ইবনুল ফারিদ যুহ্দ ও সুফী কবির মর্যাদার আসন অলংকৃত করেছেন।' তাঁর কবিতার চরণগুলোতে মহান আল্লাহর গুণাগুণ প্রকাশ করা হয়েছে।তাঁর কাব্যে মহান আল্লাহর প্রতি তাঁর হৃদয়নিংড়ানো ভালোবাসার ছাপ ফুটে উঠেছে। তাঁর রচিত কাব্যমালার সবকটি কবিতার বিষয়বস্তু হলো মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা(গযল)। বিশেষ করে তাঁর রচিত মদের প্রতীকীকবিতা(খামরিয়্যাহ) ও সূফী তরীকার কবিতা(নাজমুস সুলূক) সূফী কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিরল প্রতিভা। ইবনুল ফারিদ সুফীদর্শন গ্রহণ করার পর কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্তহন। তাঁর ইবাদত বন্দিগীর মধ্যে বহুমাত্রিক আধ্যাত্মিক চেতনা লক্ষণীয়। বহু বৎসর নির্জন উপাসনায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। মহান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির নৈপুণ্য অবলোকন করার তীব্র বাসনা তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। তিনি সূফী-দর্শন ও তত্ত্ব অন্বেষণে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করেন। কখনো কায়রোর পাহাড়-পর্বতে, কখনো মরুভূমির নির্জন প্রান্তরে, কখনো বনে-জঙ্গলে পশুদের সাথে অবস্থান করেছেন।[১৭]

হিজাযে কবির পনেরো বছর অবস্থান

একদা ইনুল ফারিদ হিজাযের উদ্দেশে সফর করেন এবং সেখানে ১৫ বছর যাবৎ নিঃসঙ্গ সূফীসাধকের ন্যায় জীবনযাপন করেন। মিসরে অবস্থানকালে ইবনুল ফারিদ কঠোর ত্যাগ ও সাধানায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে ও মরুভূমিতে অবস্থান করেও তাঁর হৃদয়ের অর্গল

খুলেনি এবং তাঁর আত্মার প্রশান্তি অর্জিত হয়নি। একদিন ব্যথিত হৃদয়ে কবি মাদরাসা-ই সুফিয়ায় প্রবেশ করেন। একজন সবজি- বিক্রেতাকে সালাত আদায়ের জন্য এলোমেলো ভাবে অজু করতে দেখে কবি তাঁকে মৃদু তিরস্কার করলেন। সবজি বিক্রেতা তাঁর তিরস্কারে কর্ণপাত নাকরে বললেন মিসরে তোমার হৃদয়দ্বার খুলবেনা; তুমি এখনই পবিত্র মক্কায় গমন কর। সেখানে তোমার অন্তরের পর্দা তিরোহিত হবে। অজানা দীনহীন এই সবজি বিক্রেতার কথাশুনে কবি যারপরনাই বিস্মিত হলেন। তিনি অনুধাবন করলেন, তরকারি বিক্রেতা ছদ্মবেশী একজন ওলী ব্যতীত অন্য কেউ নন। কবি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং বিনয়ের সাথে তাঁকে বললেন, শায়খ! পবিত্র মক্কায় যাওয়ার পাথেয় বলতে আমার নিকট কিছুই নেই, আমি কীভাবে সেখানে গমন করবো? ছদ্মবেশী ওলী তখন তাঁকে বললেন, এদিকে এসো, এই দেখ পবিত্র মক্কা তোমার সম্মুখে। কবি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখলেন সত্যিই তাঁর সম্মুখে মক্কার কা'বা শরীফ অবস্থিত। অতঃপর, তিনি তাতে গমন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কবির হৃদয়ের অর্গল খুলে গেল, অশান্ত আত্মা প্রশান্ত হলো, তাঁর সারাজীবনের সাধনা পূর্ণতা লাভ করল।[১৮]

দীর্ঘ পনেরো বছর ইবনুল ফারিদ পবিত্র মক্কায় অবস্থান করেন। সেখানে তিনি নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করে আল্লাহপ্রেমের উচ্চ মাকামে পৌঁছে যান। ত্যাগ-তিতিক্ষা আর সাধনার প্রতিটি মাকামে তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। যখন তিনি হারাম শরীফে আসতেন তখনই লোকেরা তাঁকে দেখতে পেত। তিনি পবিত্র কা'বা যিয়ারত ও সালাতে ব্যস্ত থাকতেন। এক সময় মিশরের সবজি বিক্রেতা বুযুর্গ অন্তিমশয্যায় ছিলেন বিধায় তিনি মিশরে ফিরে আসেন। কবি প্রিয় বুযুর্গের সাথে সাক্ষাৎ করেন। একজন আরেক জনকে চিরদিনের জন্য বিদায় জানান। সবজি বিক্রেতা মহান সাধক মৃত্যুবরণ করেন। এই সবজি বিক্রেতা ছদ্দবেশী ওলীর নাম জানা যায় তাঁর মাযারে কবির উৎকীর্ণ লিপি থেকে। সেখানে কবির পরিচয়ের শেষ লাইনে লেখা আছে, শায়খ আবুল হাসান আলী আল-বাক্কাল-এর ছাত্র। কবি স্বীয় শিক্ষকের জানাযার নামায পড়ান এবং তাঁর নির্মিত মসজিদের পার্শ্বে 'আল-আরিদ' পাহাড়ের পাদদেশে তাঁকে সমাহিত করেন।[১৯]

শেষ চার বছর মিসরে সূফীদর্শনের কঠোর অনুশীলন

হিজায থেকে ফিরে আসার পর থেকে কবি আজীবন মিসরেই অবস্থান করেন। তিনি ছিলেন আত্মনিবেদিত সূফীসাধক। তিনি যখন আল্লাহা-প্রেমের কবিতা শুনতেন তখন অচেতন হয়ে যেতেন। সে সময় তাঁর চেহারা রক্তমাখা হয়ে উঠতো। অসাধারণ এক সৌন্দর্য তাঁর উজ্জ্বল চেহারা থেকে বের হয়ে পড়তো। আল্লাহ-প্রেমের দহনে তাঁর শরীর থেকে ঘাম নির্গত হয়ে মাটি ভিজে যেতো। কবি বেশির ভাগ সময়ই ঐশী প্রেরণালব্দ প্রেম-ধ্যানে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। তাঁর মুর্শিদ ছিলেন

বিশ্ব বিখ্যাত দার্শনিক মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী। তবে কবির সাথে তাঁর সাক্ষাতের তথ্য পাওয়া যায়না। 'স্বীয় মুরশিদের সাথে তাঁর যোগাযোগ হতো চিঠি-পত্র ও বার্তাবাহকের মাধ্যমে।' তাঁর নিকট থেকে প্রেরণা লাভ করেই কবি ইলমে তাসাওফের সর্বোচ্চ মাকামে উন্নিত হন। আত্মনিবেদনহীন শুষ্ক ইবাদত-বন্দিগীর প্রতি কবির কোনো আকর্ষণ ছিলনা। ইবাদাতের বাহ্যিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে মহান আল্লাহর সমীপে সমর্পণ করাকেই তিনি প্রকৃত ইবাদত মনে করতেন। কবি একাধারে চল্লিশ দিন ধরে রোযা রাখতেন। এ সময় রাতে ঘুমাতেন না। তিনি সারা রাত ইবাদত করে কাটিয়ে দিতেন।[২০]

কবি ইবনুল ফারিদ নিঃসঙ্গ সাধকের জীবনযাপন করতেন। বহু বৎসর তিনি নির্জনে ইবাদাত করে কাটিয়ে দেন। বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে, মরুতে, বন্য পশুদের সাথে তিনি অবস্থান করেন। এক সময়স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। হিজাযের প্রবাসজীবন শেষে মিসরে ফিরে আসার পর মানুষ তাঁকে ওলী হিসেবে মান্য করতে থাকে। সারা দেশেই তাঁর বুযুর্গীর প্রভাব পড়ে। তিনি যখন মিসর শহরে বের হতেন তখন তাঁর করমর্দন ও করচুম্বন করে বরকত লাভের আশায় লোকেরা ভিড় জমিয়ে ফেলত। তিনি মুসাফাহা করতে দিতেন, কিন্তু হস্তচুম্বন করতে সম্মতি দিতেননা। এটা ছিল তাঁর বিনয় প্রকাশের নমুনা। তিনি অনাড়ম্বর সাদা-সিধে জীবনযাপন করতেন। পরিষ্কার, সুন্দর ও সুগন্ধযুক্ত পোশাক পরিধান করতেন। তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বুযুর্গীর আকর্ষণে দেশের আলিম, সুফী, উযীর এমনকি বাদশাহপর্যন্ত তাঁর দরবারে আসতে ব্যাকুলথাকতেন। তাঁরা তাঁর দরবারে এসে অত্যন্ত আদবের সাথে কথা বলতেন এবং তাঁর সার্থক দু'আর আবেদন করতেন। কবি তাঁদের সাথে বিনীত আচরণ করতেন। তিনি তাঁর দরবারে আগত সকলের জন্যই খাবারের ব্যবস্থা করতেন। আবার কাউকে কাউকে তিনি দানও করতেন।[২১]

ইবনুল ফারিদ দুনিয়াবিমুখ অনাড়ম্বর জীবনপদ্ধতি বেছে নিয়েছিলেন। খ্যাতির পেছনে তিনি ছুটে বেড়াননি। দুনিয়ার চাকচিক্য তাঁকে বিমোহিত করতে পারেনি। তিনি সর্বদা আল্লাহর প্রেমেই বিমুঢ় থাকতেন। ইবাদত আর মুজাহিদাতেই ছিল তাঁর আকর্ষণ। অন্য কবিগণ রাজন্যবর্গের কৃপা লাভের আশায় তাদের স্তুতিকাব্য তৈরি করতেন এবং সুযোগ পেলেই রাজদরবারের সুবিধা নিতে প্রানান্ত প্রচেষ্টা চালাতেন। ইবনুল ফারিদ ছিলেন এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর মানুষ। বহু অনুরোধ তাঁর নিকট অসলেও তিনি কখনো কোনো রাজন্যবর্গের স্তুতিকাব্য রচনা করেননি এবং তাঁদের রাজদরবারেও যাননি। মিশরের আয়্যুবী সুলতান আল-কামিল ইবনুল ফারিদের কাব্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁর ভক্তে পরিণত হন। কবির সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। প্রথমে তিনি তাঁকে রাজদরবারে নিয়ে আসতে চাইলেন এবং এক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ উপঢৌকনের প্রস্তাবও দিলেন।

কিন্তু দুনিয়াবিমুখ সাধককবি সুলতানের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। পরে সুলতান নিজেই কবির দরবারে আগমন করে সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হতে চাইলেন, কিন্তু কবি তাতেও সম্মতি দেননি। সুলতান হাল ছাড়লেননা কবির জন্য রাজকীয় নমুনায় মাযার নির্মাণ করে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। কবি এতেও সম্মতি দেননি। সাধককবি দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টি দেননি। তিনি সর্বদা আল্লাহ-প্রেমের অতল গহীনে অবস্থান করতেন। প্রায় চল্লিশ বছর কবি কাব্যরচনায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর জীবনাচার ও কবিতায় সমান্তরালভাবে দুনিয়াবিমুখ জীবনের প্রভাবই আমরা দেখতে পাই।[২২]

ইবনুল ফারিদ ও ওয়াহদাতুশ শুহুদ (وحدة الشهود) সূফীতত্ত্ব

ইবনুল ফারিদ সিরিয়া ও মিসরে আয়্যুবী সুলতানদের শাসনামলে নামেমাত্র আব্বাসী খিলাফতের ছত্রছায়ায় মিসরে জীবনযাপন করেছেন। সে যুগে দার্শনিক চিন্তাচেতনা, ইসলামী দলগুলোর মতাদর্শ, হুলূল(দেহধারণ বা অগমন), ইত্তিহাদ(এককত্ত্ব) ও ওয়াহদাতুল ওয়াজূদ(সর্বেশ্বরবাদ) সূফীদর্শন ও সূফীতত্ত্বের ব্যাপক প্রসার লাভ করে। সে সময় সূফীগণ তাঁদের সামনে প্রজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, আধ্যাত্মিক রুচিশীলতা ও ধর্মীয় বিশ্বাসপ্রাপ্ত ও চিন্তাচেতনালব্ধ মতাদর্শের বিশাল ক্ষেত্র উন্মুক্ত দেখতে পান। ফলে তাঁরা সে সব মতবাদ ও মতাদর্শ দ্বারা ব্যাপকহারে প্রভাবিত হন। সূফী কবি ইবনুল ফারিদ সে সময়ের একজন বিখ্যাত সূফী কবি ছিলেন। তবে তিনি তাঁর সুফীমতাদর্শে একজন ব্যতিক্রমধর্মী বিশেষ আরব কবি ছিলেন। তিনি সর্বেশ্বরবাদ (وحدة الوجود) অর্থাৎ মহান আল্লাহ ও পৃথিবী একই বস্তু এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন কিছু দেখা যায়না এবং সব কিছুই আল্লাহ' এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর একান্ত আকর্ষণ ছিল ঐক্য সংযুক্তির ইত্তিহাদ (وحدة الشهود) তত্ত্বের প্রতি অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব মহান আল্লাহরই অস্তিত্ব এবং 'আল্লাহ সব কিছুতেই দৃশ্যমান, যা তাঁর সূফী কাব্যদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিগণিত ছিল। তিনি তাঁর আধ্যাত্যিক শিক্ষক শামসুল মাগরিব, সুলতানুল আরিফীন, আল-ফুতূহাতুল মাক্কিয়্যা গন্থের প্রণেতা মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (মৃ.৬৩৮/১২৪০)-এর ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ সূফীতত্ত্ব দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হননি। তিনি কখনো তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেন নি। তবে পত্র-পত্রিকায় আলাপ চারিতার মাধ্যমে তিনি তাঁর এই অধ্যাত্মিক শিক্ষকের কাছ থেকে কিছু দীক্ষা লাভ করেন। থোমাস এমিল হোমারিনের মতে, তখন মিসরে শুধু ইবনুল ফারিদই (১১৮১-১২৩৫ খ্রি.) সাড়ে সাতশত বছরের সূফী কবির ভাগ্যাকাশ অলংকৃত করতে পেরেছেন। নোবেল বিজয়ী নাজীব মাহফুজসহ সমকালীন মিসরের কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁদের রচনায় এই সূফীকবির কবিতা তাঁদের লেখনিতে উদ্ধৃত করেছেন। ড. মুহাম্মদ মুস্তাফা হিলমীর মতে ইবনুল ফারিদ সর্বেশ্বরবাদী(وحدة الوجود) তথা "আল্লাহ সব কিছুতেই আছেন এবং সব কিছুই আল্লাহ" এই

তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না; বরং ঐক্য সংযুক্তিরইত্তিহাদ(وحدة الشهود) তথা "সব কিছুর মধ্যে মহান আল্লাহকে দেখা" তত্ত্বটি তাঁর সূফীকাব্যের কেন্দ্রবিন্দ ছিল।[২৩]

এ প্রসঙ্গে ইবনুল ফারিদ গবেষক বিশিষ্ট প্রাচ্যভাষাবিদ, লেবানন-আমেরিকান কবি প্রফেসর ড. ফাদার জোসেফ স্কাতুলীন(জ.১৯৫২খ্রি.) তাঁর মিসরের আন্তর্জাতিক সেমিনারে উপস্থাপিত

"عمر بن الفارض وحياته الصوفية من خلال قصيدته التائية الكبرى: دراسة تحليلية بلاغية"

শিরোনামের প্রবন্ধে বলেন:[২৪]

"فَنَحْنُ لَا نَعْتقدُ أن ابن الفارض كان تلميذاً لابن العربي أوتأثر به تأثراً مباشراً، ولكن أرجح احتمال عندنا أن كليهما استلهما أفكارهما من تراث صوفي سابق مشترك ومنتشر في الأوساط الصوفية في القرن السابع الهجري المقابل للقرن الثالث عشر الميلادي. إلا أن كليهما صوغا ذلك التراث حسب معاناتهما الشخصية وأسلوبهما الخاص. فبني ابن العربي صرحاً ضخماً من الأفكار والتأملات الفلسفية الصوفية في حين نظم ابن الفارض قصيدة فريدة نسج فيها بين عمق المعاناة الصوفية وروعة الأداء الفني. "

কবি ইবনুল ফারিদ নিজস্ব একটি সূফীদর্শন অনুসরণ করতেন। তাঁর সূফীদর্শনে তাঁর শিক্ষক মুহি উদ্দিন ইবনুল আরাবীর (হি.৫৬০-৬৩৮/খ্রি.১১৬৪-১২৪০) ওয়াহ্দাতুল ওয়াজূদ-এর তেমন প্রভাব ছিলনা। তাঁর একমাত্র কবিতাসংকলন দীওয়ানে তাঁর আধ্যাত্বিক চিন্তা-চেতনা ও সূফীদর্শন ফুটে উঠেছে। কবি ইবনুল ফারিদ তাঁর এই শিক্ষকের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রেখে এর অনেকটা বিপরীত মতাদর্শ ওয়াহদাতুশ শুহুদ মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন। কবি তাঁর কাব্যে স্বীয় শিক্ষকের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে বলেন:[২৫]

لَوْ طَوَيْتمْ نُصْحَ جَارٍ، لَمْ يَكُنْ فِيْهِ، يَوْمًا، يَأْلُ طَيًّا، يَالَ طَي

فَاجْمَعُوْا لِيْ هِمَمًا، إنْ فَرَقَ الـ ـدَهْرُ شَمْلِيْ بِالأَلِيْ بَانُوْا قَصَيْ

"শ্রদ্ধেয় তায়্যনন্দন! শোন, শিষ্যের শুভাকাঙ্খী যদি নাহও, তবে, অভিপ্রায় রলো, তোমর পানে চেয়ে আছি।

যারা রাজপথে আমাকে বহুদূর ফেলে চলে গেল, তাদেরকে নাগালে পাওয়ার শক্তি ও সাহস আমাকে খুলে প্রদান কর।" কবি এখানে তায়্যপুত্র বলে তাঁর শিক্ষক ও আধ্যাত্মিক মুর্শিদ মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীকে সম্ভোধন করেছেন। কারণ, ইবনুল আরাবী হাতিম তায়্য-এর বংশোদ্ভূত ছিলেন।

ইবনুল ফারিদের কবিতার বিষয়বস্তু

ইবনুল ফারিদ বিরচিত কবিতায় শৈশব ও কিশোরকালের চিত্র, নানারঙ্গ ও বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ রয়েছে। তাঁর কাব্যে মহান আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রেমাধিক্য ব্যাপক স্থান পেয়েছে। ইবনুল

ফারিদের যুহদ ও সুফীতত্ত্বেরক্ষেত্রে অবদান হিসাবে শুধু তাঁর রচিত একটি কবিতা সংকলনগ্রন্থ তথা দীওয়ান ইবনুল ফারিদ রয়েছে। তাতে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হিসাবে তাঁর সূফীতত্ত্বের বিষয়গুলোর অবস্থান রয়েছে। আখিরাতের বিষয়বস্তুকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে আখিরাতের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ। আখিরাতের সফলতাই প্রকৃত সফলতা। তিনি সকল কিছুর উপর আল্লাহর প্রেমকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। শারীরিক ও বাহ্যিক প্রেমের পরিবর্তে তিনি আত্মিক ও আধ্যাত্মিক প্রেমকে বেছে নিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন আল্লাহপ্রেমই মানুষের প্রধান ইবাদত। পার্থিব খ্যাতি অর্জনের পেছনে তিনি কখনো প্রতিযোগী হননি, বরং খ্যাতিই তাঁর পেছনে দৌঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। কোনো-শাসক সুলতান অথবা কোনো রাজা-বাদশাহর দরবারে তিনি গমন করেননি। এমনকি তিনি তাঁদের কারো প্রশংসায়স্তুতিকবিতা রচনা করেননি। রাজা-বাদশাহগণ তাঁর দরবারে আসতে চাইলেও, তিনি অনুমতি দেননি।[২৬]

ইবনুল ফারিদের অবস্থান ফার্সী সূফীকবি মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর (হি.৬০৪-৬৭২/খ্রি.১২০৭-১২৭৩) পরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তাঁর রচিত ও ২২০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত আরবী কবিতাসংকলন দীওয়ানের ২০টি কাসীদায় সর্বমোট ১৬৪৪ টি চরণ মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রকৃত প্রেমনিবেদক পরিপূর্ণ গযল এবং সূফীতত্ত্বনির্ভর। তাঁর রচিত নাজমুস সুলূক বা তা'ইয়্যাহ কুবরা(التائية الكبري) শিরোনামের কবিতাকুঞ্জটিতে রয়েছে ৭৬১টি চরণ। আর, প্রেমনেশাযুক্ত আল-খারিয়্যাহ কাসীদায় (الخمرية) ৪১টি কবিতাচরণ স্থান পেয়েছে। অবশিষ্ট ১৮টি কাসীদায় আরো ৮৪২ টি চরণ মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেব প্রতি নিবেদিত প্রেমকাব্য। ইবনুল ফারিদের কবিতাকে ইসলামী সূফীকাব্য(الشعر الصوفي), প্রেমকাব্য(غز), নারীর প্রতীক(رمز المرأة), মদের প্রতীক(رمزالخمرة) এবং প্রকৃতির প্রতীক(رمز الطبيعة), লোকগীতি,ধাঁধাঁ ইত্যাদি নামে নিম্নের বারটি বিষয়বস্তুতে চিহ্নিত করা হলো।[২৭]

১. সতীর্থদের উদ্দেশে রচিত কবিতা

সুদূর প্রান্তে এগিয়ে যাওয়া সতীর্থ পথচারীদের উদ্দেশ্যে রচিত (ইয়া ي অন্ত্যমিলবর্ণ) কাসীদায় তিনি বলেন:[২৮]

سَائِقَ الْأَظْعَانِ، يَطْوِيْ الْبَيْدَ طَيْ، مُنْعِمًا، عَرِجْ عَلَى كُثْبَانِ طَيْ

وَبِذَاتِ الشِيْحِ عَنِيْ، إِنْ مَرَرْ تَ بِحَيْ مِنْ عُرَيْبِ الْجِزْعِ، حَيْ

"হাওদার সুন্দরীদের(পথচারীদের) উটের বহর মরু পাড়ি দিয়ে যায়। চালক বহর! তাদেরকে তোমরা 'তায়্য'-এর আঙ্গিনায় থামাও। দখিনা প্রবাহিত সুরভি বায়ু 'যাতুশ-শীহ'-এর পাশ কেটে যাওয়া কালে ত্যাগ স্বীকারীদের আমার সালাম নিবেদন কর।

২. মহান আল্লাহর প্রতি শৈল্পিকরূপে নিবেদিত প্রেম

আল্লাহর প্রতি শিল্পরূপ, শ্লেষাত্মক ও আলংকারিক বাক্যে নিবেদিত "যাল"(ذ) অন্ত্যমিলবর্ণে প্রেমকাব্য রচনা করে কবি বলেন:[২৯]

صَدُّ حَمَى ظَمْئِي لَمَاكَ لِمَاذا   وَهَوَاكَ، قَلْبِيْ صَارَ مِنْهُ جُذاذا

إِنْ كَانَ فِيْ تَلَفِيْ رِضَاكَ، صَبَابَةً،   وَلَكَ الْبَقَاء، وَجَدْتُ فِيْهِ لَذاذا

"প্রতিবন্ধকতা তোমার প্রদত্ত পানিপানে আমার প্রবল তৃষ্ণা নিবারণ করতে কেন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে? এমন এক সময় যখন তোমার জন্য আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। যদি তোমার এই শুভসম্মতি হয় যে, আমার অনুরাগ আমারই মাঝে বিলীন হয়ে যাবে এবং তোমার অবস্থান বহাল থাকবে, তাহলে, আমি তাতে(দুঃখ না করে) এর সকল আনন্দ উপভোগ করবো।"

৩. কবিতায় প্রকৃতি ও কৃত্রিম উপাদানের সংমিশ্রণ

ইবনুল ফারিদের কবিতায় প্রকৃতি ও কৃত্রিমতার সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। সমসাময়িক কবিদের ন্যায় তাঁর সব কবিতায় না হলেও তাঁর কিছু কবিতায় বিশেষ করে হিজাযের যাযাবর জীবনের প্রকৃতি ও কৃত্রিমতার উপাদান পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই কৃত্রিমতার মধ্যেও তাঁর কবিতা প্রকৃতির শক্তিতে বলিয়ান। তিনি 'হামযা' ء অন্ত্যমিল বর্ণের কাসীদায় বলেন:[৩০]

أَرَجُ النَسِيْمِ سَرَى مِنَ الزَوْرَاءِ،   سَحْرًا ، فأَحْيَا مَيِّتَ الأَحْيَاءِ

أَهْدى لَنَا أَرْوَاحَ نَجْدٍ عَرْفُهُ،   فَالجَوَّ مِنْهُ مُعَنْبَرُ الأَرْجَاءِ

"প্রত্যুষে আয-য়াওরা' উপত্যকা থেকে রাতে ভ্রমণকারী মৃদু সমিরণ তার মিষ্টিসুগন্ধ আলতোভাবে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নজদেও বায়ূপ্রবাহ তার পরিচয় পেতে আমাদের দীশা প্রদান করছে। আর, তার থেকে প্রবাহিত সুগন্ধী তার চারদিককে সুরভিত করছে।"

৪. ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসে ভাসমান অন্তরের আকুতি

প্রাতঃসমীরণের স্নিগ্ধবাতাসে অন্তরের সুরভি আকুতি "তা" (ت)অন্ত্যমিল বর্ণের কাসীদায় ব্যাক্ত করে কবি বলেন:[৩১]

نَعَمْ، بِالصَبَا، قَلْبِيْ صَبَا لِأَحِبَتِيْ،   فَيَا حَبَذَا ذَاكَ الشَذَا حِيْنَ هَبَتِ

سَرَتْ، فَأَسَرَتْ لِلفُؤادِ، غُدَيَةً،   أَحَادِيْثَ جِيْرَانِ العُذَيْبِ، فَسَرَتِ

"আজ সত্যই পুলকিত, প্রাতঃসমীরণ কি সুরভি বাতাস বহন করে চলছে! এমন লগনে প্রিয়সীদের কথা ভুলে থাকা যায়না। উষার প্রথম ক্ষণে হৃদয়ের কাছ কে যেন চুপিচুপি বলে গেল, 'উযায়ব পারের প্রতিবেশীদের কথা, মন তাতে প্রশান্ত হলো।"

এ প্রসঙ্গে কবি আরো বলেন:[৩২]

هِيَ الْبَدْرُ أَوْصَافاً، وَذَاتِيْ سَمَاؤُهَا، سَمَتْ بِيْ إِلَيْهَا هِمَتِيْ، حِيْنَ هَمَتِ
مَنَازِلُهَا مِنِيْ الذِرَاعُ، تَوَسُداً، وَقَلْبِيْ وَطَرْفِيْ أَوطَنَتْ، أَوْ تَجَلَتِ

"আমি যে আকাশ, তাতে সে পূর্ণমাসিক চাঁদ হয়ে শোভিত, তার প্রতি আমার মনের অনুরাগ সব বাঁধ ভেঙ্গে দেয়, সে তো পূর্ণ মাসিক চাঁদ, তার মনজিল অবশ্যই আছে, আমার দুটো হাত তার মনজিলসদৃশ তাতে সে যখন ঠেস দিয়ে বসে।"

৫. সূফী তরীকায় বিলুপ্তি ও বিলীনের ইঙ্গিত

সূফীতরীকায় পথচারীদের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে 'আত-তাইয়্যাহ আল-কুবরা' (التائية الكبري) অন্ত্যমিলবর্ণের 'নাজ.মুস সুলূক' কাসীদায় কবি বলেন:[৩৩]

سَقَتْنِيْ حُمَيَا الْحُبِ رَاحَةُ مُقْلَتِيْ وَكَأْسِيْ مُحَيَا مَنْ عَنِ الْحُسْنِ جَلَتِ
فَأَوْهَمْتُ صَحْبِيْ أَنَ شُرْبَ شَرَابِهِمْ بِهِ سُرَسِرِيْ فِيْ اِنْتِشَائِيْ بِنَظْرَةِ

"আমার চোখের হাত আমাকে প্রেমের কঠিনমদ পানকরতে দিল, যখন আমার পানপাত্র তার উজ্জ্বল মুখমন্ডল ছিল। আমি আমার প্রেমের নেশাগ্রস্থতায় আমার বন্ধুদেরকে ইঙ্গিত করলাম যে, এটা আমার মনের আনন্দের নেশাপানমাত্র।"

সূফীতত্ত্ব অনুসরণ করতে গিয়ে ইবনুল ফারিদ ঘোষণা দেন যে, তিনি সব সময় আল-কুর'আন ও আল-হাদীসের আদেশ-নিষেধ শক্তভাবে পালন করবেন। এ দু'টো প্রধান উৎস থেকে তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার সকল উপাদান আহরিত হয়েছে। মহান আল্লাহর সত্তায় তাঁর বিলীন(ফানা) হওয়ার 'আকীদা(বিশ্বাস) টি রাসূলুল্লাহ(স.)-এর আদর্শ অনুসরণ থেকে প্রতিফলিত হয়েছে। এ পর্যায়ে ইনুল ফারিদ কাব্য রচনা করে বলেন:[৩৪]

وَجَاءَ حَدِيْثٌ فِيْ إِتِحَادِىْ ثَابِتٌ رِوَايَتُهُ فِيْ النَقْلِ غَيْرُ ضَعِيْفَةٍ
يُشِيْرُ بِحُبِ الْحَقِ بعد تَقَرُبٍ إِلَيْهِ بِنفْلٍ أَوْ أَدَاءِ فَرِيْضَةٍ

"আমার ইত্তিহাদের সমর্থনে একটি হাদীস(কুদসী) রয়েছে, যার বর্ণনাধারা সহীহ এবং যা দুর্বল হাদীস নয়। হাদীসটি নফল ও ফরজ ইবাদত আদায় করা ও রাসূলুল্লাহ(স)-এর নৈকট্য লাভের পর আল্লাহর ভালোবাসা প্রাপ্তিরদিকে ইঙ্গিত প্রদান করছে।"

কবিতায় উল্লিখিত হাদীসটি একটি হাদীস কুদসী সম্পর্কে, আর তা হলো:[৩৫]

مَا تَقَرَبَ إِلَىَ عَبْدِىْ بِشَىْءٍ أَحَبَ إِلَىَ مِنْ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَبُ إِلَيَ بِالنَوَافِلِ حَتَى أَحْبَبْتُهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَذِيْ يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرُهُ الَذِى يَبْصُرُ بِهِ، وَيَدُهُ الَتِيْ يَبْطُشُ بِهاَ وَ رِجْلُهُ الَتِيْ يَمْشِيْ بِهَا. وَإِنْ سأَلَنِيْ أَعْطَيْتُهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِىْ لأعِيْذَنهُ.

"যে ফরজ ইবাদত আমার প্রিয় তা আদায় করে আমার বান্দা আমার নিকটবর্তী হয় এবং যে নফল ইবাদত আমার পছন্দনীয় তা আমার বান্দা প্রতিনিয়ত আদায় করে আমার নিকবর্তী হয়, তখন আমি তাকে ভালবাসি। আমি তার শ্রবনশক্তি হই, যা দিয়ে সে শুনতেপায়, তার দৃষ্টিশক্তি হই যা দিয়ে সে দেখতে পায়,তার হাত হই যা দিয়ে সে ধরতেপারে এবং তার পা হই যা দিয়ে সে হাটতে পারে। সে আমার কাছে কিছু চাইলে তা আমি প্রদান করি, আর আমার কাছে ক্ষমা চাইলে আমি অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দিই।" আল্লাহ-প্রেমে বিলুপ্তি (الانمحاء) ও বিলীন (الفناء) হওয়া সূফীকবির এই চিন্তাধারাটি আলোচ্য হাদীসে প্রতিফলিত হয়েছে। আল- হুব্বুল ইলাহী বা আধ্যাত্মিক মাযহাব(মতাদর্শ) ও চিরন্তন বাস্তবতা প্রসঙ্গে ইবনুল ফারিদ তাঁর রচিত কাসীদা "নাজমুস সুলূক" বা আ-ত 'তা'ইয়্যাহ আল-কুবরা' ت কাব্যে আর বলেন:[৩৬]

وَعَنْ مَذْهَبِيْ، فِيْ الْحُبِ، مَا لِيْ، مَذْهَبٌ، وَإِنْ مِلْتُ يَوْماً عَنْهُ فَارَقْتُ مِلَتِي
وَلَوْ خَطَرَتْ لِيْ، فِيْ سِوَاكِ، إِرَادَةٌ عَلَي خَاطِرِيْ، سَهْوًا ، قَضَيْتُ بِرِدَتِيْ

"ভালবাসার পথ থেকে সরে যাওয়ার আমার কোন উপায় নেই, যদি কখনো সেই পথ থেকে আমি সরে যাই তাহলে আমি আমার ইসলামী তরীকা বা শরী'আহর পথ পরিত্যাগ করবো। আর, যদি অসতর্কতাবশত তুমি ব্যতীত অন্য কারো প্রতি আমার অন্তরে অনুরাগচিন্তা জাগ্রত হয়, তা হলে আমি একজন উল্টোপথযাত্রী হবো"

৬. মদ্যপানে সূফীতাত্ত্বিক প্রতীকীর প্রতিফলন

মহানপ্রিয়ার স্মরণে মদ্যপান "আল-খামরিয়্যাহ" বা 'শারিব্না 'আলা যিকরিল হাবীবি' কাসীদায় মদ্যপানের সূফীকাব্যিক পরিভাষা ও প্রতীকীর বর্ণনা দিয়ে ইবনুল ফারিদ বলেন:[৩৭]

شَرِبْنَا، على ذِكْرِالْحَبِيْبِ، مُدامَةً، سَكِرْنَا بِهَا، مِنْ قَبْلِ أنْ يُخلَقَ الكَرْمُ
لَها البَدْرُ كأسٌ، وهيَ شمسٌ، يُديرُهَا هِلالٌ، وكَمْ يَبدُو إذا مُزِجَتْ نَجْمُ

"আমরা প্রিয়ার স্মরণে এমন এক প্রকার (নেশাযুক্ত) মদ্যপান করেছি, যার দ্বারা আমরা মর্যাদা সৃষ্টির পূর্বেইনেশাগ্রস্ত হয়েছি। পূর্ণচন্দ্র ছিল তার পাণপাত্র, আর, তা ছিল স্বয়ং এমনএকটি সূর্য যার চারপাশ দিয়ে নতুনচাঁদ(হিলাল) অতিক্রম করছে এবং যখন এই মদের মিশ্রণঘটে তখন তার চারপাশের তারকাগুলো আলোয় ঝলমল করতে থাকে।"

এই মদের প্রকৃতি ও ধরণের প্রতীকী রূপ হাকীকতে ইলাহিয়্যাহ ও হাকীকতে মুহাম্মদীয়া'র বর্ণনা দিয়ে কবি বলেন:[৩৮]

يَقُأوْلُوْنَ لِي: صِفْها، فأنْتَ بوَصْفِها خبيْرٌ، أجَلْ عِندِيْ بِأوْصَافِهَا عِلمُ
صَفاءٌ، ولا مَاءٌ، ولُطْفٌ، وَلا هَواءٌ، ونُوْرٌ، وَلا نَارٌ، ورُوْحٌ، وَلا جِسْمُ

"তারা অমাকে বললোঃ সেই মদের বর্ণনা দাও; কারণ, তুমি তার গুণাগূণ সম্পর্কে ভালভাবে অবগত আছ, হ্যাঁ, প্রকৃত পক্ষে আমার কাছে তার গুণাগুণসম্পর্কে কিছুটা জ্ঞানআছে। তা বিশুদ্ধ, এখনো তাতে পানি মেশানো হয়নি, তা নিখুঁত, এখনো (দূষিত) বায়ুও তাতে অনুপবেশ করেনি, তা আলোকময়, সেখানে জলন্তআগুন নেই, (মুক্ত) আত্মা, পরিধেয় দ্বারা আবৃত নয়।"

৭. আল্লাহ-রাসূলের প্রেমবিরহে ধৈর্যধারণ

এক সময় মহান আল্লাহর প্রেমবিরহের যাতনা সহ্য করে তার যন্ত্রণায় কবির দেহ শীর্ণ হয়েগিয়েছিল। এসম্পর্কে কবি বলেন:[৩৯]

قُلْ تَـرَكْتُ الصَبَ فِيْكُمْ شَبْحـًا، مَـا لَـهُ مِمَـا يَـــرَاهُ الشَـــوْقُ، فَـىْ

خَـافِيـًا عَـنْ عَـائِـدٍ لَاحَ كَمَـــا لاَحَ فِـىْ بُـرْدَيْـهِ، بَعْـدَ النَـشْـرِ، طَيْ

"বলো, তোমাদের একটি প্রেমিক হেরে এসেছি গো রাহে; এমন শীর্ণছায়াটি বিরহ-শোষণের দেহে নেই। রোগী-দর্শনে বন্ধুরা এসে তাই চিনতেপারেনা; কাপড়ের ভাঁজে যথায় রেখাপড়ে, আসলে তা কিছু নয়।"

আল্লাহরপ্রেম কবিকে এমন দুনিয়াবিমুখ বানিয়েছে। মহান প্রভুরপ্রেম ও তাঁর বিরহের ব্যাথায় কবি দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সব বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছেন। কবি তাঁর আরাধ্য প্রেমময় মালিকের ভালোবাসা পাওয়ার আশায় অনাড়ম্বর জীবন বেছে নিয়েছেন। বিরহের যাতনায় কবির দেহমন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তাঁকে দেখতে এসে পরিচিতজনরা তাকে চিনতে পারেনা, কেননা, তার শরীরের অবস্থা আর আগের মতো নেই। এ সম্পর্কে কবি বলেন:[৪০]

صَــارَ وَصْـفُ الضُـرِ ذَاتِيـًا لَــهُ عَـنْ عَنَــاءٍ وَالـْـكَلَامُ الحَىْ لَـىْ

كَـهِـــلَاَلِ الشَــكِ، لَـــوْلاَ أَنـــهُ أَنَ، عَـيْـنِـيْ، عَـيْـنَـهُ، لَـمْ تَـتَـأَيْ

"রোগী দর্শনে বন্ধুরা এসে চিনতে পারেনা, তাই; কাপড়ের ভাঁজে রেখা পড়ে যথা আসলে তা কিছু নয়, সরলসুন্দর ভাষাটি যে তার হয়ে গেছে ক্ষীণ, তথা, বিরহ-ব্যাথার মলিনতা তার জীবনের মাঝে গাঁথা।" দুনিয়াবিমুখ আল্লাহপ্রেমিক একজন নিষ্ঠাবান বান্দা দুনিয়ার প্রতি কোনো আকর্ষণ রাখতে পারেনা। কারণ, তারএকমাত্র আরাধ্য বস্তু–মহান প্রভুর প্রেম ও সান্নিধ্য। তাই, দুনিয়ায় সে অবস্থান করে একজন প্রবাসীর মতো, মুসাফিরের মতো। প্রবাসজীবন যতই সুখময় হোক না কেন নিজ বাসভবনের মতো শান্তি সেখানে অনাহুত। এ সম্পর্কে কবি বলেন:[৪১]

بَـيْــنَ أَهْلِيْـهِ غَـرِيْـبـًا، نَـازِحـــًا وَعَلَـى الْأَوْطَـانِ لَـمْ يَـعْـطِـفْـهُ لَـىْ

جــَامِحـًا، إِنْ سِيْـمَ صَبْـرًا عَـنْكُــمُ، وَعَــلَـيْكُـمْ جَـانِحـــًا لَــمْ يَـتَـأَىْ

"স্বজনের মাঝে বেগানার মতো, প্রবাসীর হালে বাস; সোনার পুরীতে মন নাহি বসে, নাই কোনো উল্লাস।ভোলা তোমাদেরে? সে কথাটি কভু মেনে নিতে রাজি নয়; তোদের তরে বিরহ-বেদনাও সইতে আরাম পায়।"

ইবনুল ফারিদ বিরচিত কবিতার সর্বত্রউদ্দেশ্য হলো আল্লাহপ্রেম যার ভিত ইত্তিহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। অস্তিত্বের সকল বাহ্যিক দৃশ্য মর্যাদা ও মূল্যামানে সমান বলে বিশ্বাস করাই হলো ইত্তিহাদ। কেননা, প্রকৃতপক্ষে এসব দৃশ্যাবলী প্রভুত্তের পার্শ্বদেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। তাই, সমুদ্র, পর্বত, মানুষ, পাখি, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, পুজার ঘর, আগুন সব কিছুই একে অপরের পার্শ্বদেশের প্রভূত্তের প্রতিনিধিত্ব করছে। সুতরাং, মদের দোকানের একজন মদ্যপায়ী ও উপাসনালয়ের একজন ইবাদতকারী ভিন্নভিন্ন দৃশ্যে একই কাজ করছে।[৪২]

৮. সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টার অস্তিত্বের বিকাশ

আল্লাহর প্রতি নিবেদিত প্রেম, সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টার অস্তিত্ব, সমগ্র সৃষ্টিজগত মহানআল্লাহর গুণগ্রাহী, আত্মশুদ্ধীর জন্য আল্লাহপ্রেম ও সূফীসাধনা আবশ্যক, বাহ্যিক চোখে আল্লাহরদর্শন অসম্ভব, মহান আল্লাহর সদৃশ কিছু হতে পারেনা, আল্লাহর দাসত্বই মানবসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য এবং আল্লাহর দাসত্বেই আখিরাতের সফলতা বিষয়গুলো অবলম্বনে তিনি কবিতা রচনা করেন। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাকে কবি তাঁর প্রধান ইবাদত হিসেবে গ্রহণকরেন। কবি মনে করেন, আল্লাহর নামে আত্মীয়তার সম্পর্ক তথা তাঁর সাথে ভালোবাসার সম্পর্কই একমাত্র মুক্তির পথ। আল্লাহর সাথে বান্দার যে আত্মিকসম্পর্ক রয়েছে তা-ই তাকে উচ্চ স্থানে(মাকামে) নিয়ে যাবে। বান্দার সাথে আল্লাহর যে হুব্বুল ইলাহীর সম্পর্ক তা রক্ত, বংশ ও গোত্রের চেয়েও

অধিক শক্তিশালী। কবি এই সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন:[৪৩]

نَسَبٌ أقْرَبُ فِيْ شَرْعِ الْهَوَى بَيْنَنَا مِنْ نَسَبٍ مِنْ أبَوَىْ
هَكَذَا الْعِشْقُ رَضِيْنَاهُ، وَمَنْ يَأتَمِرْ، إنْ تَأمُرِىْ، خَيْرُمُرَىْ

"তোমার ও আমার মধ্যে শর'ঈ(রূহানী) বন্ধনটি গোত্রবন্ধনের চাইতেও অধিক মজবুত এবং পরস্পরের নৈকট্যতা প্রদানকারী। তোমার ভালবাসায় আমরা এভাবেই তৃপ্ত, যে তোমার আদেশ পালন করবে সে অবশ্যই উৎকৃষ্ট মানব।"

কবি মনে করতেন সৃষ্টির মধ্য দিয়েই স্রষ্টার প্রকাশ। তিনি সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করতেন। তাঁর চারদিকে চোখের আওতায় যা আসতো তাতেই তিনি স্বয়ং আল্লাহর কুদরাত অবলোকন করে তাকেই যেন দেখতে পেতেন। কবি

বলেন:[৪৪]

أىُ شَــيْءٍ مُـبْــرِدٌ حَــرًاشَــــوَى   لِلشَوَى، حَشْـوَ حَشَـائِـىْ، أىُ شَــيْ

سَقَـمِـىْ مِـــنْ سُـقْـمِ أجْـفَـانِكُـمْ   وَبِـمَـعْسُـوْلِ الثَـنَـــايَـا يَـا لِـــىْ دُوَى

"এখানে এমনকিছু সামান্যবস্তু আছে কি, যা আমার হাত, পা, পাকস্থলিসহ সারা শরীরের আগুনের উষ্ণতা ঠান্ডা করে দিতে পারে? সে রকম কেউ বা কিছু আদৌ আছেকি? তোমাদের চোখের পাতার শিহরণে আমি বেহুশ রোগাক্রান্ত হয়ে যাই; আর সানায়ার (দাঁতের) মধুমিশ্রিত পানিপান করে আবার জ্ঞানলোকে ফিরে আসি।"

কবি এখানে বলেন তিনি চোখদ্বারা মহান আল্লাহর সৃষ্টিনৈপুণ্য অবলোকন করে তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করেন। ফলে, এক পর্যায়ে তিনি বেহুশহয়ে যান। অতঃপর সানায়া তথা আল্লাহ তাআ'লার চারটি গুণবাচক নাম শ্রবণ করে অচৈতন্য কাটিয়ে উঠতে সক্ষমহন। কবি বিশ্বাস করেন সমগ্রসৃষ্টি তার মহান স্রষ্টা আল্লাহতাআ'লার দিকে ইশারা করছে। অর্থাৎ অস্তিত্বশীল যা কিছু আছে সবই মহানআল্লাহর সৃষ্টি আর এগুলো তাঁরই অস্তিত্ব ও সীমাহীন কুদরাতের কথাই জানান দিচ্ছে। একজনবুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর সৃষ্টিকারী আল্লাহর অস্তিত্বকে খুঁজেপান। এ সম্পর্কে কবি বলেন:[৪৫]

كَـعَــرُوْسٍ جُـلِـيَتْ فِـيْ حِـبَـرٍ   صُنْعِ صَنْعَـــاءَ وَدِيْبَـاجِ خُـوَىْ

دَارُخُلْـدٍ، لَـمْ يَـدُرْ فِىْ خَلَـدِىْ   أنَـــهُ مَنْ يَنْـأَعَنْـهَـا يَلْقَ غَـىْ

"সে ইয়ামেনের সান'আ নগরির তৈরী (মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট) চাদরে সজ্জিত ও প্রদর্শিত নবপরিণীতা বধুর ন্যায়, (আযারবাইযান-এর) খুওয়াই শহরের রেশমী ওড়নায় সজ্জিত। স্থায়ীত্বেরভবন, আমার ধারণা যারা তথায় পৌঁছায়; অলসতা কিছু থাকলেও তাদের বিতাড়ণের ভয় নেই।"

৯. নফসের সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ

কবি ইবনুল ফারিদ আল্লাহপ্রেমকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর দীওয়ানের প্রায়সর্বত্র এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। তিনি মনে করতেন একজন সাধকের জন্য আল্লাহপ্রেম অপরিহার্য। আল্লাহ প্রেমছাড়া পরিপূর্ণ মানুষ(আল-ইনসানুল-কামিল) হওয়া সম্ভব নয়। তিনি মনে করতেন আল্লাহপ্রেমই একজন সূফীসাধকের জন্য ইবাদতের শক্তি ও পরকালীন মুক্তি আনয়ন করে। কবি মনে করেন মানুষের ক'টিদেশ যেমন মানব শরীরের মাঝখানে অবস্থান করে তার উপর ভাগ অন্তর এবং নিম্নভাগ পাশবিক কেন্দ্রকে সংযোজিত করে, তেমনি নফস মানুষের সু ও কু প্রবৃত্তিকে সংযোজন করে রেখেছে। আর নফসের সাধারণগতি খারাপ দিকেই থাকে। এজন্য এটি যদি ক্ষীণ ও দুর্বল হয় ততই মঙ্গল। আর এজন্য মানব শরীরকে দুর্বল করে রাখাই বাঞ্ছনীয়। কেননা শারীরিক দুর্বলতা কুপ্রবৃত্তিকে জয় করে নিতেপারে।

কবি বলেন:[৪৬]

ذُوْ الـفَـقَـارِ الـلَّحـْـظُ مِـنـْهَـا، أبَـدًا، وَالـحَـشَـا مِـنِـيْ عَـمْـرٌو وَحـُيَـىْ

أنـحَـلـتْ جِـسْـمِىْ نُـحُـوْلًا خَـصْـرُهَـا مِـنْـهُ حَـالٍ فَـهُـوَ أبـْهَـى حُـلَـتَىْ

"তার দৃষ্টি সবসময় যু'লফিকারসদৃশ কর্তনকারী, আর আমার অসহায় অন্তর হলো 'আমর ও হুয়ায় দশা। সে আমার শরীরকে ধুয়েমুছে দুর্বল করে দিয়েছে, অথচ তার নিজের কোমর সুসজ্জিত, আর সেই দুর্বলতা আমার প্রিয় ভূষণ।"

কবি মনে করতেন আল্লাহপ্রেমের পথ মসৃণ নয় বরং কণ্ঠাকাকীর্ণ। এপথ সাধকের পথ, এপথ সংগ্রামের পথ, এপথ মুজাহিদার পথ। এ পথে পদে পদে বাধা উঁৎ পেতে থাকে। সুতরাং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এ পথ পাড়ি দিতে হয়। আর সাধনা ছাড়া সাধক হওয়া যায়না, আল্লাহ প্রেমিক হওয়া যায়না। কবি বলেন:[৪৭]

رُحْ مُـعَـافَىْ، وَأغـتَـنِـمْ نـُصْـحِـىْ، وَإنْ شِـئـْتَ أنْ تَـهْـوَى، فَـلِـلْـبَـلْـوَى تَـهَـىْ

وَبِسُـقْـمٍ هِـمْـتُ بِـالأجْـفَـانِ، أنْ زَانَـهَـا وَصْـفًـا بِـزَبْـنٍ وَبِـزِىْ

"আমার উপদেশ মনে রেখে জীবন পথে এগিয়ে যাও এবং আমার উপদেশ গ্রহণ করে ধন্য হও। প্রেম ফুলচয়ন করতে চাইলে তবে কাঁটার আঘাত খেতে হবে। কামনাপীড়িত নার্গিসি চোখ, তার টলমল আঁখি; ব্যাধি তাড়নার প্রণয়ে চারুশোভা উঁকিমারে।"

কবি তার কাজের বহুস্থানে আল্লাহর তাশবীব করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কবির বিশ্বাস ছিল আল্লাহ তা'আলার বাহ্যিক দর্শন লাভ করা কারোপক্ষে সম্ভব নয়। যে বা যারা মনে করে আল্লাহকে দিব্য দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করেছে তা সর্বৈব মিথ্যা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। এ সম্পর্কে কবি বলেন:[৪৮]

سَاعِدِىْ بِـالطَّـيْـفِ، إنْ عَزَتْ مُـنَـى قِـصَرٌ، عَنْ نَـيْـلِـهَـا، فِيْ سَاعِدَىْ

شَـأمَ مَـنْ سَامَ، بِـطَـرْفٍ سَاهِـرٍ، طَـيْـفَـكِ الصُبْـحَ بِـالْـحَـاظِ عُمْـى

"ওহে প্রিয়ে! তোমাকে ধরার শক্তি যদি আমার না-ই হয়; তোমার করুণা বশে স্বপনে আমাকে শীতলমিলিন দিও। জাগ্রত চোখে তোমাকে দেখা যার উম্মাদনা হয়, লোহিত উষাতে তার হারানোর দ্বার যেন অন্ধ হয়।"

১০. আল্লাহর গোলামীর প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালানো

মহানআল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর গোলামী করার জন্য। আল্লাহ বলেন, "আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জ ন্য সৃষ্টি করেছি।" কবি মহান আল্লঅহর এ অমিয় বাণীর উপর সুদৃঢ় ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন একজন মানুষ তখনই সত্যিকার মানুষ হিসেবে পরিগণিত হবে যখন সে সঠিকভাবে খোদার গোলামী করতে প্রানান্ত প্রচেষ্টা চালাবে।

কবি বলেন:[৪৯]

إنْ تَكُنْ عَبْدًا لَهَا، حَقًا، تَعُدْ   خَيْرُ حُرٍ، لَمْ يَشُبْ دَعْوَاهُ لَيْ

قُوتُ رُوْحِيْ ذِكْرُهَا، أَنَى تَحُوْ   رُعَنِ التَوْقِ لِذِكْرِىْ، هَيَ هَيْ

"তুমি অকপটে তার প্রকৃতদাস(বান্দা) হও, যদি তার পরিণাম ভাল হয়, নিঃসন্দেহে আযাদীর মুকুটে তোমার শীরভূষিত হবে। তার স্মরণ আমার প্রাণের খোরাক, তাকে ভুলা আমার আত্মহত্যার শামিল, কীভাবে তাকে ভুলতে পারি? তাই তাকে 'পিয়াপিয়া' বলে যপি।"

কবি বিশ্বাস করতেন, যদি কেউ আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত দাস হতে পারে তাহলে তার আর কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তাঁর জন্য রয়েছে শুধু সুসংবাদ। সে এমন মুকুট পরিধান করবে যা তাকে মুক্তি ও স্বাধীনতার পয়গাম পৌঁছে দিবে। আল্লাহর সত্যিকার দাস আখিরাতের সকল ঘাঁটি অতিক্রম করে পৌঁছে যাবে মনযিলে মাকসাদে তথা জান্নাতের সুশীতল ছায়া তলে।

১১. রাসূলুল্লাহ(স.)-এর বিনয়ী প্রশংসায় স্তুতিকাব্য

রাসূলুল্লাহ(স.)-এর প্রশংসায় ইবনুল ফারিদের কিছু স্তুতিকাব্য রয়েছে। তিনি প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ(স.)-এর প্রশংসায় ভিন্নভাবে কোন দীর্ঘ কাসীদা রচনা করেননি। স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর দীওয়ানে রাসূলুল্লাহ(স.)-এর প্রশংসায় কোন দীর্ঘ স্তুতিকাব্য কেন রচনা করেননি? উত্তরে ইবনুল ফারিদ বলেন:[৫০]

أرَى كُلَ مَدْحٍ فيْ النبيِ مُقَصراً   وإنْ بالَغَ المُثْنِيْ عَلَيْهِ وَكَثَرَا

إذَا اللهُ أثنَى بِالذِيْ هُوَ أهْلُهُ   عَلَيْهِ فَمَا مِقْدَارُ مَا يَمْدَحُ الْوَرَى

"রাসূলুল্লাহ(স.)-এর শানে যত প্রশংসাই করা হোকনা কেন, তা আমার দৃষ্টিতে অপ্রতুল, যদিও প্রশংসাকারীর প্রশংসা অনেক উঁচুস্তরে উপনীত হয়। তাঁর যোগ্য প্রশংসাকারী হলেন মহান আল্লাহ, যিনি তাঁর সম্পর্কে যা কিছ প্রশংসা করেছেন তার সমপরিমাণ প্রশংসা সৃষ্টিকূলের আর কারো দ্বারা সম্ভবপরনয়।" কেননা, রাসূল্লাহ(স.)-এর প্রশংসায় স্বয়ং মহান আল্লাহ বলেন:[৫১]

وَ إِنَكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

"(ওহেনবী!) নিশ্চয় আপনি (সর্বোৎকৃষ্ট) মহান চরিত্রের অধিকারী।" তবে, ইবনুল ফারিদ রাসূল্লাহ(স.)-এর পরোক্ষ প্রশংসায় তাঁর কাসীদা ফা(ف)অন্তমিল বর্ণের কাব্যে কয়েকটি চরণে যা বলেছেন তা অনেক উঁচু মানের রচনা; সাধারণত তা অন্য কোন কবি দ্বারা রচিত হওয়া সম্ভবপর হবেনা। ইবনুল ফারিদ নিম্নোও কবিতাচরণদ্বয় রচনা করে খুশিমনে বলেন, রাসূলুল্লাহ(স.) সম্পর্কে অনুরূপপ্রশংসা আর সম্ভব নয়:[৫২]

كَمُلَتْ مَحَاسِنُهُ، فَلَوْ أهْدَى السَنَا   لِلْبَدْرِ، عِنْدَ تَمَامِهِ، لَمْ يُخْسَفِ

وَعَلَى تَفَنُّنِ وَاصِفِيْهِ بِحُسْنِهِ، يَفْنَى الزَمَانُ، وَفِيْهِ مَا لَمْ يُوْصَفِ

"তাঁর (রাসূল্লাহ স.-এর) গুণাবলী এতই দীপ্তময় ও পরিপূর্ণ যে, পূর্ণচাঁদকে যদি তাঁর থেকে কিছু চমক প্রদান করা হয় তা হলে চাঁদের আর কখনো গ্রহণ হবেনা। তাঁর (রাসূলুল্লাহ স.এর) মহান সৌন্দর্য ও বহুমাত্রিক গুণাবলীর প্রশংসায় সর্বকালে বিভিন্ন শ্রেণীর বর্ণনাকারীর অব্যাহতপ্রচেষ্টা থাকলেও কালেরগতি শেষ হয়েযাবে, কিন্তু তাঁর প্রশংসা শেষ হবেনা।"

আলোচ্য চরণদ্বয় সম্পর্কে বলা হয়, এর আভ্যন্তরীণ ভাবার্থ সবই রাসূলুল্লাহ(স.)-এর প্রশংসায় পরিপূর্ণ। আর, কবির অধিকাংশ কবিতা এই মানের নয়।

১২. লোকগীতি ধাঁধাঁ ও প্রতীকী রচনা

সমকালীন কবিদের অনুকরণে প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও শৈল্পিকরূপ প্রদান করে কবি লোকগিতী (موالیات), দু'পদী

পালাক্রমী (دوبیتات), রহস্যাবৃত ধাঁধাঁ (ألغاز), প্রতীকী(رمز) কাসীদা, দীওয়ান, পৃ.১৮৪-২০৫ কবিতায় সমকালীন কবিদের অনুকরণে প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও শৈল্পিকরূপ ব্যবহার করেন। তিনি আয়ুবী সুলতানদেও শাসনামলে সুলতান সালাহুদ্দীনসহ তাঁর বংশের চারজন সুলতানের সময়ে কাব্য রচনা করেন। কবি ইবনুল ফারিদও এ ধারায় কবিতা রচনা করেছেন। তিনি দু'পদি পালাক্রমী (دوبیتات) কবিতা রচনায় চাঁদের প্রতি অনুগত হয়ে বলেন:[৫৩]

أهْوَيَ قَمَرًاً، لَهُ المَعَانِيْ رِقَ، مِنْ صُبْحِ جَبِيْنِهِ أضَاءَ الشَرْقُ

مَا بَيْنَ ثَنَايَاهُ وبَيْنِيْ فَرْقُ: تَدْرِيْ، باللهِ، مَا يَقوْلُ البَرْقُ

"চাঁদের প্রতি সে অনুগত, কারণ তার কতকগুলো অর্থবহ দায়িত্ব রয়েছে, তার ভোরের ললাটেপূর্বাঞ্চল আলেকিত হয়। আল্লাহর শপথ! বিজলি যা বলে তুমি কি তা জান: তার দুই দাঁতের মাঝে ও আমার মাঝে রয়েছে একটি পার্থক্য।"

কাতরাহ(قطر) শব্দের রহস্যাবৃতধাঁধাঁ (ألغاز)কবিতা রচনা করে তিনি বলেন:[৫৪]

مَا اِسْمُ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَا، نِصْفُهُ قَلْبُ نِصْفِهِ

وإذا رُخِمَ ، اقْتَضَي طِيْبُهُ حُسْنَ وَصْفِهِ

"প্রাণীজগতের এমন কোন বস্তুরনামের শব্দ রয়েছে যার প্রথম অর্দ্ধেকের অর্থ(قط) দ্বিতীয় অর্দ্ধেককে পাল্টালে(هر) পওয়া যাবে। আর দ্বিতীয় অর্দ্ধেকের শেষাংশ(ـه) লোপ পেলে উৎকৃষ্টতার চাহিদা হলো তার সুন্দর একটি গুণবাচকনাম(قِطْر) ।" কবি حلب শব্দের রহস্যাবৃতধাঁধাঁ(ألغاز) কবিতা রচনা করে আরো বলেন:[৫৫]

ما بلدةُ في الشأمِ، قلْبُ اسْمِهَا تَصْحِيفُهُ أخرَى، بأ رْضِ العجمْ

وُثُلْـثُـــهُ، إنْ زالَ مـنْ قـلْبـهِ،   وَجَـدْ تَـهُ طَـيْـراً، شـجِيَ الـنَـغَـمْ

"সিরিয়ার একটি শহরের নাম(حَـلـَب) পাল্টিয়ে তাকে তাসহীফ(بلَـخ) বা লেখায় বিকৃতি করলে পারস্যের ভূমিপাবে। আর, তার তৃতীয়াংশ পাল্টিয়ে তাকে বিলুপ্ত করলে সুরেলা এক প্রকারপাখি (بخ) পাবে।"

ইবনুল ফারিদ রচিত কাব্যের সাহিত্যিক মূল্যায়ন

কবি ইবনুল ফারিদ তাঁর কবিতাসংকলন দীওয়ান ইবনুল ফারিদ ব্যতিত আর কোন গ্রন্থ, মাকালা বা প্রবন্ধ রচনা করেননি। তাঁর রচিত দীওয়ান আরবী পদ্যসাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ। এর ভাষা, বিষয়বস্তু ও ভাব অতি চমৎকার। তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যুহদ(زهد) তথা দুনিয়াবিমুখতা। কবি যুহদিয়াত কবিতা রচনা করতেন এবং ব্যক্তি জীবনে এর উপর অনুশীলনও করতেন। কবির দুনিয়া বিমুখ জীবন ছিল অনাড়ম্বর ও সাদাসিধে। খোদাপ্রেমই ছিল তাঁর একমাত্র সূফীদর্শন। ইবনুলফারিদেও কবিতায় পুনরাবৃত্তি, অস্পষ্টতা, বিচ্ছিন্নতা, শাব্দিক ও আর্থিক শিল্পরূপের আধিক্য পাওয়া গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাতে মননশীলতা ও রুচিশীলতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। তবে তাতে পর্যাপ্ত রমযিয়্যাহ বা প্রতীকীর ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। যেমন: শৈল্পিকরূপ প্রদান করে কবি লোকগিতী, দু'পদী পালাক্রমী, রহস্যাবৃত ধাঁধাঁ ও প্রতীকী ব্যবহার করে কাব্য রচনা করে তিনি বলেন:[৫৬]

مَـــا اِسْـــمُ شَـيْءٍ مِـــنَ الْحَيَـــا،   نِـصْـفُـــهُ قَـلْـبُ نِـصْـفِـــهِ

وإذا رُخِـــــمَ ، اقْـــتــضَـــي   طِـيْـبُـــهُ حُسْنَ وَصْـفِـــهِ

"প্রাণীজগতের এমন কোন বস্তুরনামের শব্দ রয়েছে যার প্রথম অর্দ্ধেকের অর্থ(قط) দ্বিতীয় অর্দ্ধেককে পাল্টালে(هر) পওয়া যাবে। আর দ্বিতীয় অর্দ্ধেকের শেষাংশ(ـه) লোপ পেলে উৎকৃষ্টতার চাহিদা হলো তার সুন্দর একটি গুণবাচকনাম(قِطْره)।"

কবি حلب শব্দের রহস্যাবৃতধাঁধাঁ(ألغاز) কবিতা রচনা করে আরো বলেন:[৫৭]

مـا بـلـدةٌ فـي الشـأمِ، قـلـبُ اسْمِـهَـا   تَـصْحِيفُـهُ أخـرَى، بـأ رْضِ العـجـمْ

وُثُلْـثُـــهُ، إنْ زالَ مـنْ قـلْبـهِ،   وَجَـدْ تَـهُ طَـيْـراً، شـجِيَ الـنَـغَـمْ

"সিরিয়ার একটি শহরের নাম(حَـلـَب) পাল্টিয়ে তাকে তাসহীফ(بلَـخ) বা লেখায় বিকৃতি করলে পারস্যের ভূমিপাবে। আর, তার তৃতীয়াংশ পাল্টিয়ে তাকে বিলুপ্ত করলে সুরেলা এক প্রকারপাখি (بخ) পাবে।" আরবী সূফী কবি ইবনুল ফারিদের স্থান ফার্সী সূফী কবি জালালুদ্দীন রূমীর(মৃ.৬৭২/১২৭৩) পর দ্বিতীয়স্থানে।

'উমর ফার্‌রূখ বলেন:[৫৮]

"وَمَعَ أنَ شِعْرَ ابنِ الفارضِ يَنُوء بضَعْفٍ كَثِيرٍ مِنَ التكْرارِ والغمُوْضِ والتخلْخُلِ، ومِنَ الإسْرَافِ فيْ الصِنَاعَة المعْنوِيةِ والصِناعةِ اللفظيةِ، فإنهُ شِعْرٌ عَذبٌ أنيقٌ فيْ أكثرِ الأحْيَان. والرمْزِ فيهِ غايةٌ فيْ البرَاعَةِ وحُسْنِ الإشارةِ."

মহান আল্লাহ-প্রেমকে উপজীব্য করে ইবনুল ফারিদ নির্মাণ করেছেন কালজয়ী আরবী কাব্যমালা, যা বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনায় পরিগণিতহয়। তাঁর দীওয়ানের "তাইয়্যাহ কুবরা" কাসীদা-এর বেশ কয়েকজন পণ্ডিত, যেমন: সিরাজ হিন্দী হানাফী, শামস বিস্তামী মালিকী, জালাল কাযভীনী শাফি'ঈ, ফারগানী, কাশানী, কায়সারী প্রমুখ কর্তৃক বিভিন্নভাষায় ব্যাখ্য ও টীকা-টিপ্পনির কারণে আরব সূফীসাহিত্যাঙ্গণে

ইবনুল ফারিদের মর্যাদা অনেকবৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর "খামরিয়্যাহ" কাসীদাটির ব্যাখ্যায় অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যাক্তি এগিয়ে এসেছেন। তাঁর দীওয়ানের উপর বিভিন্নভাষায় প্রচুর গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হিলমী "ইবনুল ফারিদ ওয়াল-হুব্বুল ইলাহী" শিরোনামে ও প্রফেসর ড. ফাদার জোসেফ স্কাতুলীন "ইবনুল ফারিদ ওয়া শি'রুহুস-সূফী" শিরোনামে পিএইচ.ডি. গবেষণা পরিচালনা করেছেন। ড. শাওকী দায়ফ ইবনুল ফারিদের কবিতা ও কাব্যগ্রন্থের মূল্যায়ন করে বলেন:[৫৯]

وَدِيْوَانُه كُلُه ُمِنْ هَذاَ الطِرَازِ انْتِشَاءٌ وَسُكْرً وَحُبٌ وَوَجْدٌ وَوَلْهٌ وَالنِيَاعُ.

"তাঁর দীওয়ানের সবকটি কবিতা একই ধরণের নেশা, মাদকতা, ভালবাসা, প্রফুল্লতা, আকৃষ্টতা ও রকমারিতায় পরিপূর্ণ।"

ইবনুল ফারিদের রচনাশৈলী ও কাব্যালংকার বর্ণনা করে জর্জ নিকোলাস আল-হ্যাগ বলেন:[৬০]

"The poet's style is attractive and extremely stimulating. His easy flow of versification is unmistakeable; his playing with ideas and images, and his intelligent use of figures of speech to serve his meaning, and to reach his goal, shows his mastery of the Arabic language. It is equally conspicuous to assume that with the exception of 'the Kamriyya' and 'The Poem of the Way', the bulk of Ibn al-Farid's Diwan should be read simply as love poetry void of any mystical and spiritual overtones."

ইবনুল ফারিদের মর্যাদা ও তাঁর সূফী কবিতার শৈল্পিকমূল্যায়ন করে জর্জ নিকোলাস আরো বলেন:[৬১]

"Here, I think, lies one of the important points which contribute to the poet's fame and endurance, for he could, at the same time, satisfy both

critics; those who recognize him purly as a mystical poet, and those who see him as a great love poet, perhaps the greatest 'Sultan al-Ashiqin'. No two critics would disagree that 'The Odes' retain the form, conventions, topics, and images of ordinary love poetry. Ibn al-Farid's Diwan may well be considered 'a miracle of literary accomplishments."

ইবনুল ফাদির রচনাশৈলী ও কবিতার বৈশিস্ট্যঃ

ইবনুল ফারিদ মিসরের এমন এক যুগে ও এমন এক পরিবেশে বেড়ে উঠেন, যে সময়টি ছিল যথারীতি গল্প এবং কবিতা আবৃত্তির দিক থেকে সর্ব শিখর সময় কাল, যে সময়টি হচ্ছে, ইবনুস-সা'আতী , ইমাদুদ্দীন আল-ইসপাহানী, ইবন সানা' আল-মালিক, ইবনুন নাবীহ আল-মিসরী প্রভৃতি কবিগণের কাব্য রচনার সময়। তখনকার কাব্যে ও গল্পে নতুন শব্দের সৃষ্টি, সংযোজন ইত্যাদির বেশ প্রভাব ছিল। কবিদের কবিতার পদ্ধতিই

ছিল এভাবের। সূফী কবি ইবনুল ফারিদের কবিতায় জড়বাদী ধর্মবাদী উভয়দিকের ইঙ্গিত রয়েছে। তাসাওফের মজলিসে এশকে ইলাহী বিষয়ক, প্রেমাস্পদ আলোচনা, মদ্য, প্রেম, বিরহ ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে। তাঁর দীওয়ান বিরাট না হলেও সঙ্গতভাবেই প্রাচ্য ও পাশ্চত্য পন্ডিতগণ কর্তৃক প্রশংসিত। তাঁর এ দীওয়ার বিশেষভাবে অধ্যয়ন এবং তদসম্পর্কে আলোচনামূলক নিবদ্ধ প্রকাশ করেছেন তিনজন পন্ডিত ব্যক্তি- Von Hammer, Nallino, Nicholson. এ তিন পন্ডিতের আলোচনা প্রধানত তাঁর নাজমুস সুলুক নামক কাসীদার সাথে সম্পর্কিত। এ কাসীদাটি "তাইয়্যাতুল কুবরা" নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। এতে ৭৬১টি শ্লোক কবির যাবতীয় মরমী অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে।[৬২]

ইবনুল ফারিদের চারিত্রিক গুণাবলি

ইবনুল ফারিদ শুধু দুনিয়াবিমুখ কবিই ছিলেন না, তিনি দুনিয়াবিমুখ যুহ্দকবি ও আধ্যাত্মিকসাধক ছিলেন। তিনি শুধু যুহদ কবিতাই রচনা করেননি, তিনি তাঁর বাস্তবজীবনেও এর প্রতিফলন ঘটান। তিনি দুনিয়ায় বিখ্যাত হওয়ার কোন চেষ্টা করেননি, বরং তিনি বহুবছর লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিলেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বাসনায় তিনি স্বেচ্ছায় আত্মার সাথে সংগ্রাম করে নিজেকে তারই পথে উৎসর্গ করেছেন। লোকালয় ছেড়ে পাহাড়ে, পর্বতে, উষ্ণ মরু অঞ্চলে তিনি মহান স্রষ্টার রহস্য উদঘাটনে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি অতি সাধারণ ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। একজন মুসাফির যে ভাবে চলে তিনিও গোটা জীবন একজন মুসাফিরের মতো কাটিয়েছেন। বিনয় ও নম্রতা তাঁর ব্যক্তিত্বকে আরো সুশোভিত করেছে। তিনি পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করতেন এবং সর্বদা

পরিপাটি পোশাক পরিধান করতেন। লোকালয়, ক্ষমতা ও ক্ষমতাশীল ব্যক্তিবর্গকে তিনি এড়িয়ে চলতেন। মিসরের আয়্যুবী সুলতান আল-কামিল ইবনুল ফারিদের কাব্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁর ভক্তে পরিণত হন। তিনি কবির সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। প্রথমে তিনি তাঁকে রাজদরবারে নিয়ে আসতে চাইলেন এবং এক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ উপঢৌকনের প্রস্তাব দিলেন। সূফী কবি সুলতানের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। পরে সুলতান নিজেই কবির দরবারে আগমন করতে চাইলেন, কিন্তু কবি তাতেও সম্মতি দেননি। তিনি কবির জন্য রাজকীয় নমুনায় মাযার নির্মাণ করে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। কবি এতেও সম্মতিদেননি। কবির দরবারে সর্বদা হাজারো মানুষের সমাগম হতো। তিনি তাদের কথা শুনতেন ও পরামর্শ দিতেন। তাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করতেন। শারীরিক গঠনে তিনি দুর্বল হলেও কবিতায় প্রতীকীঅর্থ ব্যবহারে ও আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান তিনি একজন উঁচুমানের ব্যতিক্রমধর্মী কবি ছিলেন। যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ইবনুল ফারিদ তাঁর এই ধীশক্তি সপ্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত নিম্নের কবিতাচরণ দুটোতে প্রকাশ করেছেন:[৬৩]

وَحَـيَــاةِ أَشْـوَاقِـيْ إِلَيْــكَ   وَتُـرْبَـةِ الصَبْـرِ الجَـمِـيْـلِ
مَــا اسْتَحْسَنْتُ عَيْنِي سِوَا كَ   وَلاَ صَبَــوْتُ إِلَــى خَلِـيْــلِ

"তোমার প্রতি আমার জীবন্ত ঐচ্ছিক কামনা ও পবিত্র মাটির(মাকবারা) ধৈর্যের শপথ! তুমি ছাড়া আমার নয়ন কাউকে সুন্দর মনে করেনা এবং বন্ধু বলে কাউকে কামনা করে না"।

ইবনুল ফারিদে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মহত্ত্বের আকর্ষণে দেশের আলিম, সুফী, উযীর, সুলতান, বাদশাহ ইত্যাদি ব্যাক্তিবর্গ তাঁর দরবারে আসতেন। তিনি আগত সকলের জন্যই খাবারের ব্যবস্থা করতেন। আবার কাউকে তিনি দানও করতেন। খ্যাতির পেছনে তিনি ছুটে বেড়াননি। দুনিয়ার চাকচিক্য তাঁকে বিমোহিত করতে পারেনি। তিনি সর্বদা আল্লাহর প্রেমেই মগ্ন থাকতেন। ইবাদত আর আত্ম সংযমের (মুজাহিদার) প্রতিই ছিল তাঁর প্রধান আকর্ষণ। আধ্যাত্মিকসাধনা করতে প্রায়শই তিনি নির্জনস্থানে চলে যেতেন। তিনি অহরহ আল্লাহপ্রেমের কবিতা রচনা করতেন। কেউ এই ধরনের কবিতা আবৃত্তি করে শুনালে তিনি অচেতন হয়ে পড়তেন। তিনি যখন শহরে বেরহতেন লোকেরা তাঁর করমর্দন ও কদম্বুসী করতে চাইলে বিনয়ী কবি কর মর্দনের অনুমতি দিতেন, কিন্তু কদমবুসী করতে অনুমতি দিতেননা। তিনি রাতদিন আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। একাধারে ৪০ দিন ধরে রোযা রাখতেন। এসময় রাতে ঘুমাতেননা। সারা রাত ইবাদাতে মগথাকতেন। তাঁর সারা জীবন ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রেমে নিবেদিত। তিনি কখনো কোন রাজন্যবর্গের স্তুতিকাব্য রচনা করেননি এবং তাঁদের দবারেও যাননি। তিনি সর্বদা আল্লাহপ্রেমের অতল গহীনে অবস্থান করতেন। তাঁর

জীবনাচার ও কবিতায় সমান্তরালভাবে দুনিয়াবিমুখ জীবনের প্রতিফলনই আমরা দেখতে পাই। তিনি সুলতানুল আশিকীন বা প্রেমিক সূফীকবিদের সম্রাট উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।[৬৪]

এই সম্পর্কে তিনি বলেন:[৬৫]

فُقْتَ أهْلَ الْجَمَالِ، حُسْنًا وَحُسْنَى،   فَبِهِمْ فَاقَةٌ إلَى مَعْنَاكَا

يُحْشَرُ العَا شِقُوْنَ تَحْتَ لِوَائِيْ،   وَجَمِيْعُ الْمِلاَحِ تَحْتَ لِوَاكَا

“তুমি সৌন্দর্য ও মহানুভবতায় নান্দনিক জনতাকে অতিক্রম করেছ; সুতরাং তোমার সুপ্তসত্য ও গুণের প্রতি তাদের অতিব প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সকল আল্লাহপ্রেমিক শেষ বিচারেরদিন আমার(আত্মার)পতাকা তলে একত্রিত হবে এবং সকল সুন্দর জনতা তোমার (রব্বানী তাজাল্লীয়াতের) পতাকা তলে একত্রিত হবে।”

কবি ইবনুল ফারিদের সমসাময়িক কবিগণ

কবি ইবনুল ফারিদ মিসরে আয়্যূবী সুলতানদের শাসনামলে জীবন অতিবাহিত কওে কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর রচিত আরবী কবিতার গুরূত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে গিয়ে আব্বাসী যুগের শেষ সময়ের স্পেন ও বাগদাদের কবিতাগুলোর বিষয়বস্তু এবং আয়্যূবী যুগের রচিত আরবী কবিতার বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, স্বরূপ ও প্রকৃতি আলোচনা-পর্যালোচনায় আনা হয়েছে। পরিচালিত এই গবেষণা কর্মটি পাঠক, গবেষক ও সাহিত্যামোদীদের প্রভূত উপকার সাধনকলেপ যুগের প্রতিনিধিত্বকারী প্রায় অর্ধশত কবির জীবন ও কাব্য প্রতিভা মূল্যায়ন এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। আয়্যূবী রাজবংশের সুলতানদের শাসনামলে তথা ইবনুল ফারিদের সমসাময়িক মিসর ও সিরিয়ার উল্লেখযোগ্য কয়েকজন আরবী কবির বিশেষ করে সূফী কবিদের কবিতার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। এ গবেষণাকর্মে ইবনুল ফারিদের সমকালীন মিসর ও সিরিয়ার আয়্যূবী রাজবংশের সুলতানদের শাসনামলে রচিত আরবী কবিতার বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, গঠনপ্রকৃতির স্বরূপ বা বাস্তবরূপ এবং উলেখযোগ্য কয়েকজন কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁদের কবিতার গঠনপ্রকৃতি ও বিষয়বস্তুর স্বরূপ এখানে তুলে ধরা হলো।[৬৬]

১. ইবনুত তা‘আবীযী (মৃ.৫৮৪/১১৮৮)

কবি ইবনুত-তা‘আবীযীর পূর্ণনাম আবুল ফাতাহ্ মুহাম্মদ ইবন ‘উবায়দিলাহ ইবন আবদিল্লাহ। তাঁকে সিবত ইবনুত-তা‘আবীযী ও বলা হয়। আয়্যূবী শাসনামলের একজন সরকারী কর্মকর্তা এবং বাগদাদের প্রসিদ্ধ আরব কবি। তিনি মিসরের কবি ইবনুল ফারিদের সমসাময়িক ইরাকের একজন প্রতিভাবান কবি ও লেখক ছিলেন। তিনি **১১২৫**খ্রি. সালে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং **১১৮৮** খ্রি. সালে ইরাকে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দীওয়ানুল মুকাতি‘আত-এর কাতিব ছিলেন। ইবন খাল্লিকান

পূর্বের দুইশত বৎসরের কবিদের মধ্যে ইবনুত-তা'আবীযীর কবিতার সাবলীলতা ও শব্দের সূক্ষ্ম প্রয়োগ কৌশলের প্রশংসা করেছেন। কথিত আছে যে, অন্য

কবিগণ তাঁর কবিতা নকল করে নিজেদের নামে প্রচার করতো। তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় দুঃখজনক ঘটনা ছিল যে, তিনিযৌবনকালেই দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। এজন্য তিনি গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকগাঁথা রচনা করেছেন। তিনি দৃষ্টিশক্তি হারানোর পূর্বেই তাঁর দীওয়ান সংকলন করেছেন। পরবর্তীকালের রচিত কবিতাগুলো "আয-যিয়াদাত" নামে তাঁর দীওয়ানে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। তিনি আব্বাসীয় প্রাচীন কবিদের অনুসরণ করে কবিতা রচনা করেছেন। বিশেষ করে মুতানাব্বীর বৈপরীত্য(মু'আরাদাহ) ধারায় কাসীদা রচনা করেছেন। তিনি সালাহ উদ্দীন আবুল-মুজাফ্ফ এর দানের প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন:[৬৭]

سربُ مَهَا أمْ دُمى مَحارِيبِ أمْ فُتياتُ الحَيِ الأعَارِيْبِ

هيهاتَ أين الْمَهَا إذا اتصَفَ الحُسْنُ مِن الْخُرِدِ الرعَابيْبِ

"বন্য গাভীর দল নাকি প্রতিযোগী যোদ্ধাদের রক্ত, নাকি বেদুঈন গোত্রের যুবতী মহিলাগণ?" অনুরূপভাবে তিনি 'মু'আরাদা'-এর আদলে সালাহ উদ্দীনের প্রশংসায় বাগদাদ থেকে ৩টি কাসীদা লিখে সিরিয়ায় পাঠান, যার দুটো উৎকৃষ্ট কবিতাচরণ হলো:[৬৮]

إن كان دينك فى الصبابة دينى فقف المطى برملتي

بِبَرِيْن

وَاَلْثِمْ ثَرَي لوْ شارفتْ بيْ هُضبَهُ أيْديْ المَطِي لثُمْتُهُ بجُفُوْنِيْ

" আমার আর আপনার কাংঙ্খিত ধর্ম (শাফি'ঈ মাজহাব) যদি এক হয়, তাহলে আমার রামাল্লা অঞ্চলে আপনার বাহন থামিয়ে নিরাপদে অপেক্ষা করুন; রামাল্লার মাটি স্পর্শ করুন যদি আপনার বাহনের কদম পাহাড়ের টিলায় আমার সাক্ষাৎ করে তা হলে আমার চোখের পাতা তাকে অবলোকন করবে"।

২. ইবনুল মাম্মাতী (মৃ.৬০৮/১২১১)

ইবন মাম্মাতী আস'আদ ইবন আল-খাতীর। তিনি মিসরের কিবতী পরিবারের বিখ্যাত কবি ছিলেন। বংশের সর্বাপেক্ষা খ্যতিমান ব্যক্তি যে দীওয়ানুল-জায়শের প্রধানরূপে তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং রবর্তীকালে সালাহ উদ্দীন(হি.৫৬৪-৮৯/খ্রি.১১৬৯-৯৩) ও আল-আযীয উসমান ইবন সালাহ উদ্দীন(হি.৫৯৮-৫৯৫/খ্রি.১১৯৩-১১৯৮)উভয়ের শাসনামলে সকল দপ্তরে সচিব পদে উন্নীত হন। লেখক ও কবি হিসাবে তাঁর সাহিত্যিক সৃজনশীলতা প্রশংসীয় ছিল। তিনি প্রথমে ফাতিমীদের এবং পরে আয়্যুবীদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তাতারীদের যুদ্ধে, বারবারদের যুদ্ধে, ক্রুসেডের

যুদ্ধেও সালাহুদ্দীনের সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন। তাঁর পিতা শেরকূহের হাতে এবং তিনি সালাহ উদ্দীন আয়্যূবীর হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রশংসায় অনেক কবিতা রচনা করেন। তিনি সালাহ উদ্দীনের দাপ্তরিক কাজ করতেন। তিনি কালীলা ও দীমনাকে কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন এবং সালাহউদ্দীন আয়্যূবী জীবন-রচিত কাব্য রচনা করেছেন। আল-আস'আদ ইবন মাম্মাতীর সর্বাপেক্ষা স্থায়ী অবদান 'কিতাবু কাওয়ানীনিদ-দাওয়াবীন' শীর্ষক গ্রন্থখানি। যা আল মাকরীযীর মতে সুলতান আল-আযীয উসমান ইবন সালাহ উদ্দীনের (মৃ.৫৯৮/১১৯৩) জন্য চার খন্ডে রচিত হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে। তাঁর কবিতা সংকলনের একটি দীওয়ানও রয়েছে। আয়ূবী সুলতান আল-মালিকুল 'আযীয উসমান এর কাছে তাঁর উযীর নাজমুদ্দীন ইবন ইব্রাহীম এর উদ্দেশ্যে একজন দাসীর সম্পর্কে শৈল্পিক রূপ দিয়ে প্রণয় কবিতা বা গযল রচনার জন্য বলা হয়েছিল, যা তার মুখমন্ডলকে সর্প এবং বিচ্ছুরূপে মিসকাম্বর (কস্তুরী) দিয়ে বর্ণিত হবে। তারপর নাজমুদ্দীন অনেকগুলো খন্ড কবিতা রচনা করেন। তারপর অনুরূপ কবিতা রচনা করার জন্য জনগণকে নির্দেশ দেন। তারা সবাই কবিতা রচনা করলেও ইবনুল মাম্মাতী এ সম্পর্কে অতি উৎকৃষ্ট মানের ২০টিরও অধিক কবিতা রচনা করে তিনি বলেন:[৬৯]

نَـقَـشْـتُ حَـيّـةً عـلـى   وَرَدِ خَـــدٍّ مُزَخَّـرَفٍ
فَـبَـــدَتْ آيَــةُ الـكـَلـيـــ   ـم عـلـى وَجْـهِ يُـوسُفَ

"আমি একটি সাজানো গোলাপের মুখমন্ডলে একটি সর্প চিত্রিত করেছি; অতঃপর ইউসূফের চেহারায় মুসা কালীমূলাহর নিদর্শন প্রতিবর্ণিত হয়েছে।"

অনুরূপভাবে তিনি শৈল্পিক রূপে আরেকটি প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করে বলেন:[৭০]

قُلتُ للَّيلِ عِنـدَماَ زاَرَنِـى البـَدْ   رُ، وأو جَسَتُ خِيفَـةً للـرَّواحِ
أنــتَ يـاَ لَـيــلُ بِـرَدِّ دَارِحَـبِيبِـي   فَتَـأَهَّـبْ لِدَفِـعِ صَـدْرِ الصَّبَـاحِ

"যখন পূর্ণিমার চাঁদ আমার সাথে সাক্ষাত করতে আগমন করলো এবং আমি তাঁর প্রস্থানের ভয়ে শংকিত হলাম; তখন আমি বললাম, হে রজনী হে রাত! আমার প্রেয়সীর ঘর ফিরিয়ে দাও এবং সকাল বেলার আবির্ভাব প্রতিহত করার প্রস্তুতি নাও।"

৩. ইবনুস সা'আতী (মৃ.৬০৬/১২০৯

তাঁর পূর্ণনাম ফাখরুদ্দীন রিদওয়ান ইবন মুহাম্মদ ইবন 'আলী ইবন রুস্তম ইবন খারদুয আল-খুরাসানী। তিনি দামিশকের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা খুরাসানের অধিবাসী ও দামিশকে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। তাঁর পিতা একজন দক্ষ ঘড়ি প্রস্তুতকারক ছিলেন। তাছাড়া তিনি জ্যেতিবিদ্যা সম্পর্কেও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ইবনুস সা'আতী একজন চিকিৎসক ও সুদক্ষ

সাহিত্য বিশারদ ছিলেন। যুক্তিবিদ্যা এবং অন্যান্য দার্শনিক বিষয়েও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি মালিকুল 'ফাইয ইবনুল মালিক আল-আদিল মুহাম্মদ ইবন আয়্যুব (সালাহউদ্দীনের ভাগিনা) এর উযীর ছিলেন। অতঃপর তাঁর ভ্রাতা আল-মালিকুল মু'আজজাম ইবনুল মালিক আল-'আদিল (মৃ.১২২৭খ্রি.)-এর উযীর ও ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। তিনি দামিশকে ৬২৭/১২৩০ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁর কবিতায় আব্বাসী যুগের মুতানাব্বীর রচিত কবিতার প্রাণ প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি খোরাসানী হওয়ার গৌরব তাঁর কবিতায় লিপিবদ্ধ করেছেন এবং গৌরব, গযল, বর্ণনা এসব তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু ছিলো। তিনি আবু নুওয়াস, বুহতুরী, মুসলিম ইবন ওলীদ, ইবনুর রূমী রচিত কবিতার গযলের ন্যায় তিনি গযল(প্রেমকাব্য) রচনা কওে বলেন:[৭১]

وإنا لَمِن قومٍ مواقع جودهم مواقع جود الغيث في البلد القَفْرِ
وَرَثْتُ الخرا سانى حلما ونائلاً فلا قلق البقيا ولاحرج الصدر

"অতঃপর আমরা এমন গোত্রের লোক, যাদের বদান্যতার অবস্থান অনাবাদী শহরে মেঘের বদান্যতার অবস্থানের ন্যায়; সহিষ্ণুতা ও অনুদান হিসাবে আমি খোরাসানের বংশদ্ভুত, ফলে আমার অন্তরের মাঝে কোন যন্ত্রণা অবশিষ্টনেই এবং কোন সংকীর্ণতাও নেই।"

বায়তুল মুকাদ্দাস মুক্ত করার সময় কবি সুলতান সালাহ উদ্দীনের সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁর এই বিজয়ের প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন:[৭২]

جلتْ عزماتُك الفتحُ المُبينا فقد قرت عيونُ المسلمينا
رددتَ أخيذة الإسلام لما غدا صرف القضاء بها ضمينا

"আপনার দৃঢ় সংকল্পসমূহ প্রকাশ্য বিজয়ের মাধ্যমে গৌরবান্বীত হয়েছে, অতঃপর মুসলিমদের নয়ন প্রশান্তি লাভ করেছে; ইসলামের লুণ্ঠিত মাল আপনি ফিরিয়ে এনেছেন যখন বিগত দিনে তা নিয়তীর ক্ষমতার তত্ত্বাবধানে চলে যায়।"

৪. ইব্ন সানা' আল-মুলক(মৃ.৬০৮/১২১১)

ইবন সানা' আল-মুলক, হিবাতুল্লাহ ইবন সানা' আল-মালিক তাঁর উপাধি ছিল কাজী সায়্যিদ। তিনি মিসরের নেতৃস্থানীয় কবিদেন একজন ছিলেন। তিনি শী'আ সম্প্রদায়ের বলে অপবাদ রয়েছে, তবে তিনি সুন্নী মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁর কবিতার লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো বর্ণনা ও পুরুষ সম্পর্কিত গযল (পুরুষ-প্রেমকাব্য) রচনা। তাঁর কবিতায় সুক্ষতার সাথে শিল্পরূপও বিরাজ করছে যা পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হয়। তবে তাঁর স্তুতি কবিতা ইরাক ও সিরিয়ার অন্যান্য কবিদের তুলনায় তত শক্তিশালী

ছিল না। তিনি সালাহউদ্দীন আয়্যূবীর প্রধানমন্ত্রী আল-কাদী আল-ফাদিল ও লিপিশৈলিকার ইমাদ আল-কাতিব-এর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল।

তারই ফলশ্রুতিতে তিনি সাম্রাজ্যের অধীক মর্যাদার আসনে সমাহীত হয়েছেন। তাঁর সমকালীন মিসরের কবিদের একটি দল যাদেরকে সাহিত্য রুচির ক্ষেত্রে একই সুতায় গাঁথা যায় তাদের মধ্যে তিনি ও একজন। কাব্যের ক্ষেত্রে এবং গল্পকাহিনী বলার আসরে তিনি একটি বড় আসন অলংকৃত করতেন। তিনি মৌলিকত্ব ছাড়াই গতানুগতিক পদ্ধতিতে কাব্য রচনা করেন। তাঁর একটি দীওয়ান হায়দরাবাদ থেকে (দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, নতুন সিরিজ, নং১২) ১৯৫৮খ্রি. মুহাম্মদ 'আব্দুল-হাক্ক কর্তৃক বিস্তারিত জীবনীসহ প্রকাশিত এবং ফুসূসুল ফুসুল ওয়া 'উকূদুল-'উকুল' নামক নিজস্ব গদ্য ও পদ্য রচনা সংকলনের প্রণেতা।[৭৩]

তবে তাঁর গুরুত্বের প্রধান কারণ এই যে, প্রাচ্যে তিনিই প্রথম মুওয়াশশাহাত (কখনও কখনও ফারসী শব্দসম্বলিত 'খারজা:সহকারে) রচয়িতা এবং তাঁর নিকট লভ্য আন্দালুসী ও মাগরিবী নমুনা সমূহের রীতি থেকে সিদ্ধান্তে আসার পদ্ধতি তার আয়ত্বে ছিল। দারুত-তিরায ফী 'আমালিল-মুওয়াশশাহাত, জাওদাত রিকাবী কর্তৃক ১৩৬৮/১৯৪৯সালে দামিশক থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটির জন্য তিনি আয়্যূবী যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। গ্রন্থটি মুওয়াশ-শাহাত রীতিতে রচিত। যার ফলে মুওয়াশ্শাহাত-এর গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব। গ্রন্থটিতে ৩৪টি নির্বাচিত আন্দালুসী ও মাগরিবী মুওয়াশশাহাত এবং লেখকের নিজস্ব রচনার ৩৫টি নমুনা রয়েছে। এগুলির শুরুতে একটি দীর্ঘ ভূমিকা স্থান পেয়েছে, যেখানে ইবন সারা আল-মূলক এই কাব্য পদ্ধতির গঠন ও ছন্দ প্রকরণ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব আলোচনা করেছেন। প্রাচ্যের কবিদের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম মুওয়াশশাহাত কবিতা রচনার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন এবং তাতে তিনি পরিপূর্ণতা সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া সুলতান সালাহ উদ্দীন আয়্যূবীর প্রশংসায় তিনি কবিতা রচনা করে বলেন:[৭৪]

أمجلسَ لهوى ليس لى عنك مجلس   لأوحشت لماغاب لى عنك م

وإنىْ لِىْ البشرى وإن فَراستى   تصح لأنى مُؤمن أتفرس

"আমার বিনোদনের কোন আসর, আপনার পক্ষ থেকে আমার জন্য কোন আসর নয় কী? আপনার পক্ষ্য থেকে আমার জন্য কোন বন্ধু আসরে অনুপস্থিত থাকলে, আমি শূণ্যতা অনুভব করি; আমার জন্য সুসংবাদ কোথায়? অথচ আমার বিচক্ষণা যথার্থ কারণ, আমি একজন অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন মুমিন ব্যক্তি।"

৫. আশ-শিহাব আশ-শাগুরী(মৃ.৬১৫/১২১৮)

আশ-শিহাব আশ-শাগুরী, আবু মুহাম্মদ ফিতয়ান দামিশকের অধিবাসী ছিলেন। তিনি আয়্যুবী সুলতানদের প্রশংসায় অনেক কবিতা রচনা করেন এবং উৎকৃষ্ট কাসীদার মাধ্যমে তাঁদের বন্দনা রচনা করেছেন। তাঁর রচিত কবিতা সংকলনের একটি দীওয়ানও রয়েছে। সেটি রুবাইয়াত ও দুবায়াত ছন্দে রচিত। তিনি কবিতা রচনার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় প্রাচীন পন্থীদের প্রেমোদ্দীপক ভূমিকায় গ্রহণ করেছেন। তিনি মদের প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেছেন। তিনি সুলতান নাসির সালাহউদ্দীনের প্রশংসা করে ১০০টি কবিতা রচনা কওে বলেন:[৭৫]

يا ناصر الإسلام فزت بمورد حسن النشأ في العالمين ومصدر

أنشات ملحمة تمل مقاتل الفرسان بالعدد الذي لم يحصر

"হে ইসলামের সাহায্যকারী (সুলতান) আপনি পৃথিবীর বুকে কল্যাণের বার্তা নিয়ে বিজয় বেশে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করেছেন এবং বিজয়ী হয়ে ফিরে এসেছেন; আপনি বীরত্বপূর্ণ (ক্রুসেডের যুদ্ধে) যুদ্ধের মাধ্যমে মহাকাব্যের যুদ্ধ সৃষ্টি করেছেন যা শত্রুবাহিনীর (খৃষ্টান বাহিনী) অগণিত অশ্বারোহী যোদ্ধাদেরকে ক্লান্ত করে দিয়েছে।"

৬. ইবনুন-নাবীহ আল-মিসরী (মৃ.৬১৯/১২২২)

ইবন আন-নাবীহ আল-মিসরী, কামালউদ্দীন আলী ইবন মুহাম্মদ। তিনি মিসরের একজন কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি আয়্যুবীদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর রচিত কবিতা সংকলনের একটি দীওয়ানও রয়েছে। তিনি সাধারণ জীবন যপন করতেন ও শান্তস্বভাবের ছিলেন। তিনি তদানিন্তন রাজনৈতিক যুদ্ধের মঞ্চে নিজেকে অর্ন্তভূক্ত করেন নি। যতদিন পর্যন্ত মিসরে ছিলেন ততদিন তিনি আয়্যুবী বংশের প্রশংসার মধ্যে তার কাব্য রচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। জাজিরা ও খালাত অঞ্চলের গর্ভণর তথা শাসক আর-মালিকুল আশরাফ মুসার দরবারে পৌঁছে তাঁর নিজস্ব মুন্সী তথা লেখক পদে যোগদান করেন। এবং তার চাকুরী করা অবস্থায় নাসিবাইন এলাকায় বসবাস করতে থাকেন এবং সেখানে ৬১৯/১২২২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর কবিতা ছিল মান সম্পন্ন এবং কব্যের বাক্যগুলো হৃদয়গ্রাহী ছিল। তিনি লেখার স্টাইল-এর প্রবর্তক ছিলেন এবং স্বভাবত অলংকারিক জনিত লিখা লিখতেন এবং শাব্দিক সৌন্দর্য্য ও প্রভাবকে অনেন্বষণ করে কাব্যে স্থান দিতেন। তিনি কবিতাকে শিল্প এবং সঠিক জায়গায় পরিপূর্ণভাবে নিয়ে এসেছেন। সেই যুগে তাঁর মত আলংকারিক ভাষায় কাব্য রচনায় পারদর্শী কোন কবি ছিলনা। তাঁর কাব্য শিল্প শক্তিশালী, প্রাণবন্ধ এবং বিভিন্ন রঙ্গে ও আঙ্গিকে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি আয়্যুবী শাসকদের প্রশংসায় নিম্নের কবিতাটি রচনা করেন:[৭৬]

فَحَرِيق جمرة سَيْفِهَ لِلمُعتَدِى ورحفَقُ خَمْرَةِ سَيْبِهِ لِلمحَتفِى

يـاَبـدرُ !تَـزَعَـمُ أن تُـقَـاسَ بـوَجْـهِـهِ وعلى جَبِينِك كَلْفَةُ المتَكَلِّفِ؟

يـاغـيْـمُ !تَـطْـمَـعُ أن تلـوَن ككـفـه كَـلاَّوَأنـت مـن الـجَـهَامِ المُـخَـلَّفِ

"প্রশংসিত ব্যক্তির তরবারী বিদ্রুহীদের জন্য আগুন এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্বরূপ। তাঁর বদান্যতা ও অনুদান প্রার্থনাকারীদের জন্য বিশুদ্ধ মদ বা পানীয় বস্তু সদৃশ; হে পরিপূর্ণ (১৪ তারিখের) পূর্ণিমার চাঁদ! তুমি কি এই ধারণায় লিপ্ত আছ যে, আমার প্রশংসিত ব্যক্তির সামনা সামনি মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে, অথচ তোমার ললাটে কৃত্তিমতা প্রদর্শনকারীদের চিহ্ন রয়েছে; হে আকাশের মেঘরাশি! তুমি কি এই আশা করছ যে, আমার প্রশংসিত ব্যক্তির হাতের বদান্যতার ন্যায় বদান্যতা করতে পারবে, তা মোটেই নয়। তুমিতো মাঝে মাঝে বৃষ্টির আশা দিয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করো না।"

আব্বাসী খলীফা নাসির বিল্লাহর ছেলের মৃত্যুতে কবি ইবনুন নাবীহ আল-মিসরী একটি শোকগাঁথা রচনা করেন, যার প্রথম দুটি লাইন হলো:[৭৭]

الـنـاس لـلـمـوت كـخـيـل الـطـراد فـالـسـابـق الـسـابـق مـنـهـا الـجـواد

والـلـــه لايـــدعـــوإلـى داره إلا مــن اسـتـصـلـح مــن ذى الـعـبـــاد

"মানুষের মৃত্যুর অবস্থা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াদের ন্যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম এবং বিজয়ী সেই ঘোড়াটি যে সবার আগে অগ্রগামী হতে পারে; মহান আল্লাহ তাঁর নিকট সেই বান্দাকে ডেকে নেন, যাকে তিনি তাঁর কাছের যোগ্য ও উপযোগী মনে করেন।"

কবিতটি দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি তাঁর কবিতা রচনা তিনটি বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, আর তা হলো: ১. প্রশংসা: তাঁর প্রশংসাজনিত কবিতাগুলো দু'একটি কাসীদা আব্বাসীয় খলিফা নাসির-এর জন্য রচনা করে বাকী সব কাসীদা আয়্যূবী পরিবারের লোকদের প্রশংসায় রচনা করেছেন। ২. প্রণয় কবিতা এবং ৩. বর্ণনামূলক কবিতা। তিনি এ দুটুকে প্রশংসামূলক কবিতার ভূমিকায় আনয়ন করে থাকেন, যাতে প্রশংসীত ব্যক্তির প্রভাব, প্রতিপত্তি, বিজয়, দান ইত্যাদির উল্লেখ থাকে।

৭. ইবনু 'উনায়ন (মৃ.৬৩১/১২৩৩)

ইবন 'উনায়ন আবুল মাহাসিন মুহাম্মদ ইবন নসর। তিনি দামিশকে ১১৫ খ্রি.সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানকার অধিবাসী ও কুৎসা রচনাকারী একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি দামিশকের প্রধান শিক্ষকগণের নিকট সনাতনী শিক্ষা লাভের পর কিছুদিন ইরাকে অতিবাহিত করেন। তিনি শীঘ্রই তাঁর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ আক্রমণ শুরু করেন। তাঁর এই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন প্রকৃতির বহু লোক। তিনি সুলতান সালাহ উদ্দীনকেও রেহাই দেননি। সুলতান সালাহুদ্দীন এই সময় (৫৭০/১১৭৪) কেবল নগরীর অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং এই আক্রমণের জন্য শীঘ্রই ইবন 'উনায়ন নির্বাসিত

হন। তিনি বাণিজ্যিক ব্যাপারে বিভিন্ন দেশ পরিভ্রম করে ইয়ামান প্রত্যাবর্তন করেন এবং সালাহ উদ্দীনের ভ্রাতা তুগতাকীম এর পরিষদে কিছুকাল থাকেন অতপর

মিসরে গিয়ে তাঁর নিজ শহরের স্মৃতির তাড়নায় তিনি আল-মালিকুল 'আদিল-এর নিকট এক ছন্দে ঐ শহরে প্রত্যাবর্তন করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁর উপহাস, শেষ ও বিদ্রূপের ব্যঙ্গরাজ্যে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে কাদী, ফুকাহা এবং ধর্ম প্রচারকের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে হেয় প্রতীয়মান করতেন। এর ফলে তাকে সিনদিক রূপে অভিযুক্ত করা হয়। তাঁর নিজের, তাঁর পিতা এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ এমনকি সুলতান সালাহউদ্দীনের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য করা তাঁর হিজাসমূহ ছিল অত্যন্ত তীব্র ও দুষ্ট মনোভঙ্গিপূর্ণ। তাঁর পৃষ্ঠ-পোষকদের উদ্দেশ্যে লিখিত স্তুতিকাব্যগুলি সুলিখিত হলেও তাঁর ব্যঙ্গ কবিতাগুলি দ্বন্দ্ববাদী অভিব্যক্তিপূর্ণ। তিনি ধাঁধাঁ জাতীয় ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন এবং এই সমস্ত কবিতায় প্রায় সকল প্রকার ব্যক্তিগত ও ঐতিহাসিক ঘটনা স্থান পেয়েছে। পরবর্তী যুগে তিনি সালাহ উদ্দীন আয়্যুবীর সন্তান ও ভাই ভাতিজাদের প্রশংসায়ও অনেক কবিতা রচনা করেছেন যা তাঁর দীওয়ানের সাতটি অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। তিনি মালিক আল- মু'আজ্জাম আল-আয়্যুবীর উজীর ছিলেন। ইবন 'উনায়ন দামিশক্-এর সর্বস্তরের জনগণের কুৎসা রটনা করেদীর্ঘ ৫০০ চরণের একটি শোকগাঁথা কাসীদা রচনা করেন। যার নাম হল 'মিকরাদুল আ'রাদ'। এই কবিতায় তিনি তদানিন্তন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁর এই কুৎসার পরিণতি থেকে দামিশকের কেউ রেহাই পায়নি। সালাহ উদ্দীন ও তাঁর রাজ প্রাসাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীও তাঁর কুৎসা থেকে রেহাই পায়নি। তিনি বলেন:[৭৮]

قد أصبح الرّزق مالهُ سببٌ في الناس إلا البغاءُ والكذبُ
سلطاننا أعرج وكاتبهُ ذوعمش والوزيرُ منحدبُ
وصاحبُ الأمر خلقهُ شرس وعارضُ الجيش داؤه عجبُ
عيوبُ قوم لوأنها جمعت في فلك ما سرت به شهبُ

"পতিতাবৃত্তি ও মিথ্যাচারিতা ব্যতীত সমাজের লোকের মাঝে জীবিকার্জন উপায়হীন হয়ে পড়েছে; আমাদের সুলতান (সালাহ উদ্দীন) খুঁড়া, তাঁর সচিব হলো অন্ধ, এবং তাঁর প্রধানমন্ত্রী হলো কুঁজো; নীতি নির্ধারক বা আদেশদাতার চরিত্র হলো কলহ প্রিয়, আর তাঁর সেনাপতির ব্যাধি হলো অহংকার; জাতির দোষ-ত্রুটি যদি আকাশে একত্রিত করা হয় তাহলে সেখানে(আকাশে) তারকারাজি চলাচল করতে বাধাপ্রাপ্ত হবে"।

৮. ইবন মাতরূহ (মৃ.৬৫০/১২৫২)

জামালুদ্দীন নজম ইবন মাতরূহ ৫৯২/১১৯৬ সালে মিসরের আসয়ূত অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি জন্মস্থান ত্যাগ করে কূস-এ গমন করেন। কূস সেই সময়ে মিসরের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল এবং সেখানেই ইবন মাতরূহ শিক্ষা জীবন শুরু করেন। সেখানে কবি বাহাউদ্দীন যুহায়র-এর সাথে সাক্ষাত লাভ করেন, এবং তাঁর সাথে বন্ধুত্ব শুরু করেন। তিনি কূস-এর শাসনকর্তা মাজদুদ্দীন আল-লামাতীর সঙ্গেও পরিচিত হন। মিশরের বাদশাহ আল-মালিক সালিহ নাজমুদ্দীন আয়্যূবের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। অধিকতর সুবিধাজনক পরিবেশের সন্ধানে বের হয়ে ইবন মাতরূহ ৬১৭/১২২৯ সালে কায়রোতে পৌঁছে সেখানে তিনি আস-সালিহ আয়্যূব-এর সম্মূখে উপস্থিত হবার সুযোগ লাভ করেন। আল-মালিক আস-সালিহ নাজমুদ্দীন তখন পিতা আল-মালিক আল-কামিল-১ ইবন আয়্যূব এর প্রতিনিধিরূপে মিসর শাসন করছিলেন। ৬২৯/১২৩১ সালে তাঁর পিতা কর্তৃক সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হয়ে মেসোপটেমিয়ায় মঙ্গোলদের ও খাওয়ারীজদের দমনে অবিযানের সময় মাতরূহও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি সর্বদা যুদ্ধে ও রাজনৈতিক বর্মকান্ডে তাঁর সাথে অংশ গ্রহণ করেন এবং সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় বিজিত শহরগুলিতে ভ্রমন করেন। আল-মালিক আল-কামিল (মৃ.১২৩৮ খ্রি.) এর মৃত্যুর পর আয়্যূবী শাসকগণের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেড়ে যায়। ইবন মাতরূহ তাতে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন। আস-সালিহ আয়্যূব তাঁকে সেনাবাহিনীর সেক্টর জেনারেল নিযুক্ত করেছিলেন। নিজের বিষয় তুলে ধরার জন্য এবং আয়্যূবী রাজ পুরুষগণের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার জন্য 'আব্বাসী খলীফার দূত ইবনুল জাওযীর (১১২৬-১২০০খ্রি.) সঙ্গে ১২৩৯খ্রি. সালে কায়রো গমন করেন এবং স্বল্পকাল পর আবার তিনি সিরিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন।[৭৯]

১২৪৫খ্রি. সালে ইবন মাতরূহ পুনরায় মিসরে ফিরে যান। আস-সালিহ আয়্যূব কায়রো সুলতান হয়ে তাকে শহরের কোষাধক্ষ নিযুক্ত করেন। এই নিযুক্তি সুলতানের দরবারে তার একের পর এক উচ্চ সরকারী পদ লাভের সূচনা হয়। ১২৪৫ খ্রি. সালে আস-সালিহ আয়্যূব দামেশকের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করলে ইবন মাতরূহকেসেই শহরের উযীর নিযুক্ত করেন। এই সময় কবি বিপুল সমৃদ্ধি এবং নিজ অনুগামিগণের অশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করেন। কিন্তু আস-সালিহ আয়্যূব ১২৪৮ খ্রি. সালে দামিশ্ক গিয়ে তাঁকে সেই পদ থেকে অব্যাহতি দেন এবং সেনাবাহিনীর সাথে হিমস-এ পাঠান। এই সেনাবাহিনী হিমস-এ গিয়ে পৌঁছতে না পৌছঁতেই তাঁকে মিসওে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। খৃষ্টান ক্রুসেড বাহিনী মিসরের একটি উল্লেখযোগ্য শহর দিম্য়াতে অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। স্বয়ং আস-সালিহ আয়্যূব এই সময় গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় মিসর প্রত্যাবর্তন করেন তখন ইবন মাতরূহও তাঁর সাথে ছিলেন। আস-সালিহ আয়্যূবের মৃত্যুর পর ১২৪৯সালে কবি রাজকার্য থেকে অবসর নিয়ে স্বগৃহে ফিরে

আসেন। অবশেষে ১২৫১ খ্রি. সালে কায়রোতে মারা যান। ইবন মাতরূহ এর দীওয়ান ১২৯৮খ্রি. সালে ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর কবিতা প্রধানত প্রশংসা ও প্রণয়মূলক। সেগুলি তেমন উচ্চমানের রচনা নয়। বলা হয়ে থাকে যে, রাজনৈতিক এবং চাকুরী সংক্রান্ত দায়িত্বভার পুরাপুরিভাবে সাহিত্য ও কাব্য শিল্প সৃষ্টির প্রতি তাঁর মনোনিবেশের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। তথাপিও কোন কোন শ্রেষ্ঠ রচনায় কবি হিসাবে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর বর্তমান রয়েছে। আল-মালিকুন-নাসির সালাহ উদ্দীন ইউসূফ কর্তৃক প্রথমবার খৃষ্টানদের হাত থেকে এবং আয়্যূবী সুলতান আন-নাসির দাউদ ইবন ইসা কর্তৃক দ্বিতীয়বার বায়তুল মুকাদ্দাস খৃষ্টানদের হাত থেকে মুক্ত হলে তিনি উভয়ের প্রশংসা করে নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করেন:[৮০]

المسجد الأقصى له عـادَةٌ سارت فصارت مثلاً سائرا
إذا غدا للكفر مستوطناً أن يبعث الله له ناصرا
فناصر طهره أولا وناصر طهره آخرا

"জেরুজালেমে অবস্থিত বায়তুল মুকাদ্দাস মসজীদটি সাধারণভাবে সকলের নিকট একটি প্রচলিত উদাহরণ হিসেবে রূপান্তরিত হয়ে আছে; বিগত দিনে এই মসজীদটি খৃষ্টান কাফেরদের আভাসভূমি ছিল। অতঃপর মহান আল্লাহ এর সাহায্য করার জন্য আয়্যূবী সুলতান উভয় নাসিরকে পাঠিয়েছেন; প্রথম নাসির বায়তুল মুকাদ্দাসকে খৃষ্টানদের থেকে মুক্ত করে পবিত্র করেছেন এবং দ্বিতীয় নাসির তাঁকে মুক্ত করে পবিত্র করেছেন।"

৯. বাহা উদ্দীন যুহায়র (হি.৫৮১-৬৫৬/খ্রি.১১৬৯-১২৫৮)

তিনি 'আরবের সুবিখ্যাত কবি ছিলেন। ৫৮১/১১৮৬ সালে মক্কার নিকটবর্তী ওয়াদীউল-নাখলা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন ও মিসরের কূসে (قوص) লালিত-পালিত হন। তাঁর প্রকৃত নাম আবুল ফাদল যুহায়র ইবন মুহাম্মদ আল মুহালাবী আল-আযদী আল-বাহা যুহায়র তবে বাহা যুহায়র নামে বেশী প্রসিদ্ধ ছিলেন। আয়্যূবী যুগের নামকরা কবিদের মধ্যে একজন, তিনি আয়্যূবী পরিবারের প্রশংসায় কবিতা রচনা করে। তিনি আল- মালিক আল-সালিহ আয়্যূবের নেতৃত্বে মিশরে ফরাসীদের বিরূদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধের এবং তাঁর ছেলে মাহদী ইবন আল-কামিলের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন। শিক্ষার প্রতি অসম্ভব আগ্রহ ও ঝোঁক ছিল। ১২২৭খ্রি. তিনি কায়রোতে বসবাস করতে থাকেন। কর্ম জীবনে তিনি সুলতান আল-কামিলের পুত্র শাহজাদা সালিহ সিংহাসনে আরোহন করে কবিকে উযির পদে নিযুক্ত করেন এবং বহুবিধ সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করেন।

১২৫৮খ্রি. ক্রুসেড অভিযানকালে মানসূরাতে তাঁর পৃষ্ঠপোষক সুলতানের সঙ্গেই ছিলেন। পরবর্তীকালে কোন এক ঘটনায় ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হওয়ায় তিনি সুলতানের কুদৃষ্টিতে পতিত হন। ১২৩২খ্রি. সিরিয়া ও উত্তর ইরাকে অভিযানকালে কবি সুলতানের সাথে ছিলেন, রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করে শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি এভাবেই কাটান। অতঃপর সুলতানের মৃত্যু হলে কবি সিরিয়াতে গমন

করেন। শেষ বয়সে অর্থভাবে কষ্টপেয়ে ৬৫৬/১২৫৮ সালে ইনতিকাল করেন। তিনি তাঁর সর্বত্তোম কবিতা নিবেদিত করেন দামিস্কের অধিপতি আল-নাসির ইউসূফের প্রশংসায়। তাঁর দীওয়ান থেকে প্রতিভাত হয় যে, কবি হিসাবে তিনি অকপট এবং তাঁর কবিতা যথার্থ সংগীতময়, তাঁর শব্দ নির্বাচন, আঙ্গিক বিচার, রুচিবোধ, ছন্দ ও ধ্বনি মাধূর্যের প্রভাব এবং সুরলালিত্য সকল কিছুই তাঁর পরিণত রুচিবোধের পরিচয়। কবি তাঁর সমকালীন কাব্যনীতি অনুসরণ করলেও তাঁর কাব্যের মধ্যে কদাচিৎ কৃত্রিমতাপূর্ণ ভাব ও ভাষা দেখা যায়। তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তিনি সহজ সরল শব্দ সংযোজনে কবিতা রচনা করতেন। ভাবের অতিরঞ্জন, কল্পনা ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তিনি কখনোও কবিতা রচনা করেন নি। তার কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল: প্রণয়কাব্য(গযল), তিরস্কার ('ইতাব), বর্ণনা (ওয়াসফ), রসিকতা বা কৌতুক (মিযাহ.)। কবির স্বভাব ছিল অত্যন্ত কোমল, মিষ্টভাষী, সেজন্য তাঁর কবিতা ও সে ধরণের সহজবোধ্য, সাজানো ছন্দে আবৃত্তি করেছেন। ঘটমান অবস্থার প্রতি বিরক্ত হয়ে যুগকে যারা অপবাদ দেয় তাদের প্রতি উপদেশ প্রদান করে তিনি বলেন:[৮১]

لاتعتب الدهر في خطب رماك به ان إسترد ففدمًا طالما وهجا

حاسب زمانك في حالىْ تصرفه تجده أعطاك اضعاف الذى سلبا

"যুগের আবর্তনে যখন তোমার উপর কোন বিপদাপদ আপতিত হয় তখন তুমি যুগের প্রতি অভিযোগ প্রকাশ করো না। কেননা যদিও সে তোমার কোন ক্ষতি সাধন করেছে তথাপিও সে তোমাকে অনেক প্রদান করেছে। যুগের ভালো-মন্দ উভয়দিককে তুমি বিচার কর। তুমি দেখবে সে তোমার থেকে যা কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে তার অনেক বেশী তোমাকে প্রদানও করেছে।"

১০. আশ-শারফুল আনস.ারী (মৃ.৬৬২/১২৬৩)

আশ-শারফুল আনসারী, আবু মুহাম্মদ আবদুল আযীয তিনি দামিশকের হামাতের অধিবাসী ছিলেন এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মদীনার আওস গোত্রের ছিলেন। তিনি আয়্যূবী সুলতানদের ও পরবর্তীতে মামলূক সুলতানদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু সম সময়িক ঘটনাবলীর বর্ণনা করা, সুলতান ও শাসকদের প্রশংসা করা, প্রণয় কবিতা এবং আধ্যাত্মিক কবিতা রচনা করেছেন। আয়্যূবী সুলতান আল-মালিকুল মানসূর-এর যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীরত্বের প্রশংসা করেছেন, তাঁর শিকারের প্রশংসা করেছেন এবং আননাদঘন পরিবেশ ও ব্যায়ামের প্রশংসা করেছেন। নিম্নে তার প্রশংসামূলক কবিতার একটি উদ্বৃত্তি দেয়া হলো:[৮২]

أكملتَ كلَّ المنَاقبْ ياخيرَ ماشٍ وراكِبِ

كالجنَائب تخالهُ حتى الوحش تُسابقُ

"হে উৎকৃষ্ট পথযাত্রী ও অশ্বারোহী! আপনি মহৎ কার্যাবলীর সকল বিষয় পরিপূর্ণ করেছেন" আপনি বন্যপশুদের গতিকেও প্রতিযোগিতায় অতিক্রম করেছেন, ফলে আপনি তাকে (বন্য পশুকে) অনুগত প্রাণীরূপে করে নিয়েছেন।"

১১. শিহাব উদ্দীন আত-তালা'ফারী(মৃ.৬৭৬/১২৭৭)

আত-তালা'ফারী **১১৯৮**খ্রি. সালে ইরাকের আল-মুসিলে জন্ম করেন এবং **১২৭৭**খ্রি. সালে হামাতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আয়ূবী সুলতানদের রাজকবি ছিলেন। তাঁর রচিত কবিতার একটি দীওয়ান রয়েছে। তিনি হামাতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দ্বিতীয় আল-মানসূর সায়ফুদ্দিন মুহাম্মদ এর প্রশংসা করেন এবং নিজের অর্ন্তজালার অভিযোগটি ব্যক্ত করে নিম্নের কবিতাটি রচনা করেন:[৮৩]

وفكـــر قلـق كلّـــهُ نـهـــاري   وذِكــــرُ أرُقٌ كلـــّهُ وليلى

فــأمرُهمــا لـحتـفي مُستـمرٌ   يـقسمـنـي الـهـوى كـمـداً وحـزنـــاً

"আমার সারাদিন অতিবাহিত হয় উৎকণ্ঠায় ও উৎবিগ্নে, আর সারারাত বিনিদ্রায় ও স্মৃতিচারণে; কামনা-বাসনা আমাকে বিষন্ন ও শোকাহত অবস্থায় বিভাজন করে দিয়েছে, অতপর উভয়ের কাজ হলো আমাকে আমার মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত রাখা।"

১২.'আরকালা আদ-দিমাশকী (হি.৪৮৬-৫৬৭/খ্রি.১০৮৩-১১৭১)

খ্রিষ্টীয় দাদশ শতকের এই কবির পূর্ণ নাম আবূন-নাদী হাস্‌সান ইবন নুমায়র 'আরকালা আল-কালবী আদ-দিমাশকী। তিনি সিরিয়ার দামিশক নগরীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি স্বভাবজাত, ইন্দ্রীয়পরায়ণ ও চঞ্চল কবি ছিলেন। তাঁর কবিতা জটিলতা ও কৃত্রিমতা বিবর্জিত ছিল এবং কোমলাতা ও সুক্ষতায় পরিপূর্ণ ছিল, যা আয়ূবী সুলতানদের যুগের অধিকাংশ কবিদের মধ্যে পাওয়া যায় না। আয়্যূবী বংশ মিসরের শাসনভার গ্রহণ করার পূর্বে কবির সাথে সেই বংশের আমীর, শাসক ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। বিশেষ কওে সুলতান সালাহ উদ্দীন তাঁর বন্ধু ছিলেন এবং কবির সুক্ষ্ণ কাব্য প্রতিভার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তাঁর কবিতার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু ছিল:[৮৪]

ক. কবির ভ্রমণ (রিহলাতুশ শা'ইর)। কবি দামিশক ত্যাগ করে আল-মুসেল ও বাগদাদে চলে যান পূণরায় দামিশক থেকে প্রর্বাবর্তন করে সর্বশেষ কায়রো গিয়ে অবস্থান করেন। কবি তাঁর এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত অত্যান্ত নিপুণ ছন্দে কবিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন। তাঁর এই ভ্রমণকালে যে সব মহান ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করেছেন তাঁদের কথা কাসীদার মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

খ. আয়ূবী সুলতানদের প্রশংসা(মাদহুল আয়্যুবীয়ীন)। তিনি সালাহ উদ্দীন আয়্যুবীর বন্ধু ছিলেন তাঁর প্রশংসায় তিনি অনেক কবিতা রচনা করেছেন। সুলতান সালাহ উদ্দীন যখন নুরুদ্দীনের অধীনে আমীর ছিলেন তখন দামিশকে থাকাকালীন সময়ে কবিকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি যদি মিসরের

সুলতান হন তাহলে কবিকে এক হাজার দীনার দান করবেন। যখন সালাহউদ্দীন মিসরের সুলতান হলেন তখন কবি 'আরকালা তাঁর কাছে ঐ দীনার চেয়ে কবিতা লিখে পাঠান:[৮৫]

قُل للصلاح معينى عند إعسارى ياألف مولاي أين الألف دينار
أخشى من الأمر إن وافيتَ أرضكم وما تفي جنة الفردوس من نار

"আমার আর্থিক অস্বচ্ছলতার সময় আমার সাহায্যকারী সালাহ উদ্দীনকে বল, হে আমার পরিচিত বন্ধু কোঁথায় আমার সেই এক হাজার দীনার ? আমি এই বিষয়ে ভয় পাচ্ছি যে, আপনি যদি এই প্রথিবী থেকে বিদায় নেন, আপনার জান্নাতুল ফেরদাউস আগুন থেকে মুক্তি পাবে না।"

সুলতান সালাহ উদ্দীন এই কবিতা পেয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে তাঁর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন ও কবিকে মিসরে ডেকে বিশ হাজার দীনার প্রদান করেন। সে সময় আয়্যুবী পরিবারের মুসেলের উযীর জামালুদ্দীন (মৃ.৫৫৯/১১৬৩) এবং মিসরের উযীর সালিহ ইবন রূযায়ক (মৃ.৫৫৯/১১৬৩) এর মৃত্যুতে তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে শোকগাঁথা রচনা করে বলেন: [৮৬]

لاخير فى الدنيا ولاأهلها بعد جمال الدين والصالح
بحران لولادمع بكيهما ما كان ماء البحر با لمالح

"জামালউদ্দীন ও সালিহ ইবন রূযায়েক-এর মৃত্যুর পর পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীর কোন কল্যাণ থাকল না; তাঁরা দুজন এমন দুটো সমুদ্র ছিল, তাঁদের শোক প্রকাশকারীদের অশ্রু যদি না ঝরতো তাহলে সমুদ্রের কোন পানি লবণাক্ত হতো না।" আরকালার কবিতার বিষয়বস্তুতে আব্বাসী যুগের কবি আবূ নুওয়াস ও আবূ তাম্মামের কবিতার প্রাণবন্ততার স্বরূপ ও ছাপ ফুটে উঠেছে।

পাদটীকা ও তথ্য-নির্দেশিকা

১ ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বালী, শাযরাত আয-যাহাবী (বৈরূত,১৪০৬/১৯৮৬), খ. ৭, পৃ. ২৬১-৬৮; ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুববুল ইলাহী(কায়রো:দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ.৭৮-৮১; R A Nicholson, "Ibn al-Farid", Encyclopaedia of Islam(Leiedn: E J Brill, 1986), v.iii, pp.763-4; আহমদ হাসান আয-যায়্যাত,তারিখুল-আদাবিল'আরাবী(কায়রো:দারুন-নাহদা,২০১খ্রি.), পৃ, ৩৫৩-৫৫; ড.আলী মুহাম্মদ আস-সালাবী(আল-আয়্যুবিয়্যুন বা'দা সালাহুদ্দীস(কায়রো:দার ইবনুল জাওযী, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১২৭-৬৩; ড. 'আবদুল-লতীফ হামযা, আল-আদাবুল মিসরী মিন কিয়ামিদ-দাওলাতিল আয়্যুবিয়্যা ইলা মাজিয়্যিল-হামলাতিল-ফ্রান্সিয়্যা(কায়রো:আল-হায়্যাতুল-মিসরিয়্যা আল-'আম্মা, ২০০০ খ্রি.),পৃ.৪৮-১০২।

২ ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ.২৬২-৮।

৩ ড. শাওকী দায়ফ, তারিখুল আদাবিল 'আরাবী (মিসর: দারুল-মা'আরিফ, ১৯৯০ খ্রি.), ক.৭, ৩৫৭-৬১।

৪ ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বালী, শাযরাতুয-যাহাব, খ.৭, পৃ.২৬১-৮; ইবনুল ফারিদ,দীওয়ান (বৈরূত: দারসাদির, ১৮৮৭ খ্রি.),পৃ.১৪০; (কায়রো: মাকতাবাতুল কাহিরা, ১২৭০/১৯৫১), পৃ. ৮২।

৫ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ.৮২-১০২; Dr. Suleman Derin, From Rabi'a to Ibn al-Farid:Towards Some Paradigms of the Sufi Conceptions of Love(London:The University of Leeds press, 1999 AD), pp. 250-53.

৬ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ.৩৪-৩৫; ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বালী, শাযরাতুয-যাহাব, খ.৭, পৃ. ২৬৩।

৭ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ.৩৫-৩৬।

৮ রশীদ বিন গালিব আদ-দাহদাহ, শরহু দীওয়ান ইবনিল ফারিদ, দীবাজাতুত-দীওয়ান লিশ-শায়খ 'আলী সিবতুশ-শা'ইর(বৈরূত:দারুল-কুতুবলি-'ইলমিয়্যা, ২০০৩ খ্রি.), পৃ.১৪

৯ ইবনুল-ফারিদ, দীওয়ান, পৃ.১৮২।

১০ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ,৪৭-৪৮; শামসুদ্দীন আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন নাসির উদ্দীন ইবনুয-যায়্যাত, আল-কাওয়াকিবুস-সায়্যারা ফী তারতীবিয়-য়িয়ারা (বাগদাদ: মাকতাবাতুল-মুছান্না, তা বি), পৃ. ২৯৬-৩০০।

১১ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ, ৪৮।

১২ Thomas Emil Homerin, From Arab Poet to Muslim Saint: Ibn al-Farid, His Verse and His Shrine (Columbia: University of South Carolina Press, 1994). P.22.

১৩ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান (বৈরূত: দার সাদির, তা বি), পৃ.১৮২; ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান (কায়রো: মাকতাবা আল-কাহিরা, ১৩৭০/১৯৫১), পৃ.৮৪

১৪ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল-হুব্বুল ইলাহী, পৃ. ২১-৫৪।

১৫ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ.৪৪।

১৬ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান (বৈরূত: দার সাদির, তা বি), পৃ.১৪২; ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান (কায়রো: মাকতাবা আল-কাহিরা, ১৩৭০/১৯৫১), পৃ.৮৪

১৭ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল-ফারিদ ওয়াল-হুব্বুলইলাহী, পৃ. ২৮-৩৬; ইবনুল 'ইমাদ, শায়রাত, খ.৭, পৃ.২৬১-৬৮।

১৮ ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাত, খ. ৭, পৃ. ২৬২-৩; সিরাজুদ্দীন আল-মিসরী, তাবাকাতুল-আওলীয়া (কায়ও া: মাকতাবাতুল-খানজি, ১৩৯৩/১৯৭৩),পৃ. ৪৬৪-৫।

১৯ ড. মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল-হুব্বুল ইলাহী, পৃ. ৫৬-৭৮; আহমদ আমীন, জুহুরুল ইলাম (কায়রো, ২০১২খ্রি.), খ.৪, পৃ.৮৩৯-৪০।

২০ ড. জোসেফ স্কাটুলীন, "'উমার ইবনুল ফারিদ ওয়া হায়াতুহুস-সূফীয়্যাহ", আল-মাজমা'উল-'ইলমী আল-মিসরী আন্তর্জাকি সম্মেলন, মিসর, ১৯৯৯খ্রি, পৃ. ১-৩৪৩।

২১ ড.মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল-হুব্বুল ইলাহী, পৃ.৪৭-৫৪; শামসুদ্দীন আয-যায়্যাত, আল-কাওয়া কিবুস-সায়্যারা ফী তারতিবিয-যিয়ারা (বাগদাদ: মাকতাবা আল-মুছান্না, ত. বি.), পৃ. ২৯০-৭।

২২ আহমদ সুবহী মানসূর, আত-তামহীদ লি কিতাব আত-তাসাওফ ওয়াল হায়াত আদ-দীনিয়্যাহ ফি মিস্‌র আল-মামলূকী(কায়রো,২০১৪খ্রি.), পৃ.৪-৮

২৩ ড. মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল-হুব্বুল ইলাহী, পৃ. ৩০-৫৪।

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৬০; www: intelligentia.tn Feb., 26, 2016, pp. 1-11.

২৫ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ.২০।

২৬ ড. জোসেফ স্কাটুলীন, "'উমার ইবনুল-ফারিদ ওয়া হায়াতুহুস-সূফীয়্যাহ", পৃ.১-৩৪; তাহা আব্দুল--বাকী সুরূর, মুহীউদ্দীন ইবনুল 'আরাবী (কায়রো, ২০১২খ্রি.), পৃ.১-১৬।

২৭ ড. আহমদ আব্দুল 'আযীয, "আকীদাদুস-সূফিয়্যাহ ওয়াহদাতুল ওয়াজূদ(রিয়াদ,১৪২৪/২০০৩), পৃ.২৭-৫৭; ড. 'আলী আল-সালাবী, আল-আয়্যুবীয়ূন বা'দা সালাহ উদ্দীন (কায়রো: দার ইবনুল জাওযী, ২০০৮খ্রি.), পৃ.২৭-১৬৩।

২৮ আহমদ বিন আব্দুল আযীয, আকীদাতুস-সূফীয়্যা (রিয়াদ, ১৪২৪/২০৩.), পৃ. ৫৯-৬৩; ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ২০।

২৯ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ২৬।

৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

৩২ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ৭।

৩৩ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ২৬।

৩৪ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ১১৭।

৩৫ হাদীস কুদসীটি সহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, হাদীস নং ১৪০; ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ৩৩।

৩৬ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ৩৬।

৩৭ ড. খালিদ আলী ইদ্রীস, "রমযিয়্যাতুল-খামর ফিশ-শি'রিস-সূফী", International Journal of Academic Research Studies, Abu Dhabi University, United Arab Emirate, June, 1019, No.2, pp.102-114; ইবনুলফারিদ, দীওয়ান, পৃ.৪৬।

৩৮ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ১১৩; ড. মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল-হুব্বুল ইলাহী, পৃ. ৮৭।

৩৯ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ৭; ড. শাওকী দায়ফ, তারিখুল-আদাবিল আরাবী, খ.৭, পৃ. ৩৬১; ইবনুল ইমাদ, শাযরাতুয-য়াহাব, খ.৭, পৃ. ২৬৮।

৪০ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ.৫২; ড. মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল-হুব্বুল ইলাহী, পৃ. ৭; 'Ali Akbar, "Ibn 'Arabi's Notion of Wahdat al- Wujud", Journal of Islamic Studies Culture, (Online) June 26, 2016, vol. 4, No, 1, pp.45-51

৪১ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ১৪০; ড. খালিদ আলী ইদ্রীস, "রমযিয়্যাতুল-খামর ফিশ-শি'রিস-সূফী", pp.102-114.

৪২ উমার ফররূখ, তারিখুল আদাবিল 'আরাবী (বৈরূত: দারুল ইলম, ১৯৮৯খ্রি.), খ.৩, পৃ. ৫২১-২; সারা সালিহ, "আর-রময ফি শি'রি ইবনি'ল ফারিদ" (ইরান:কাদসিয়্যা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪৩৮/২০১৭) পৃ. ৫-৯; জোসেফ স্কাটুলীন, পৃ. ৩০-৩; ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ১৪২; ড. খালিদ আলী ইদ্রীস, "রমযিয়্যাতুল-খামর ফিশ-শি'রিস-সূফী", IJAR Studies, June 2019, pp.102

৪৩ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ৭।

৪৪ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ.১০।

৪৫ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ১৫।

৪৬ 'উমার ফর্‌রুখ, তারিখুল অদাবিল 'আরাবী, খ.৩, পৃ.৫২১।

৪৭ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ১৮।

৪৮ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ১০।

৪৯ 'উমার ফররূখ, তারিখুল আদাবিল 'আরাবী, খ.৩, পৃ. ৫২১; ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ১৫।

৫০ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ১৪।

৫১ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ১৮।

৫২ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ১৯।

৫৩ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ১৮।

৫৪ ড. মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ, পৃ.১৭৭-৮০; আলী মুহাম্মদ আস-সালাবী, আল-আয়্যূবীয়ূন বা'দা সালাহুদ্দীন, পৃ.১৬৩।

৫৫ আল-কুর'আন, ৬৮:০৪ ।

৫৬ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ১৫৪।

৫৭ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ১৮৫।

৫৮ ড. ‘উমার ফুর্‌রূখ, তারিখুল আদাবিল ‘আরাবী (বৈরূত: দারুল ইলমি লিল মালা‘ঈন, ১৪০১/১৯৮১), খ.৩, ৫২১।

৫৯ ড. শাওকী দায়ফ, তারিখুল-আদাবিল-‘আরাবী, খ.৭, পৃ.৩৬০।

৬০ George Nicholas El-Hage,"Ibn al-Farid's Khamriyyah or Ode on Wine", The Journal of Arabic Language, Literature and Culture, Columbia University press, December,13, 2016, pp.120-6.

৬১ Ibid, p. 120-6

৬২ Nicholson J. Pedersen,"Ibn al-Farid", Encyclopaedia of Islam, V.3, pp. 263-4. ইবনুল ফারিদদ, দীওয়ান, পৃ. ২০০।

৬৩ দ্র. প্রবন্ধের কবিতার বিষয়বস্তু ১২ তে উল্লেখিত কবিতার চরণগুলো পৃ. ১২-১৩।

৬৪ উমার ফর্‌রূখ, তারিখুল-আদাবিল ‘আরাবী, খ. ৩, পৃ. ৫২১

৬৫ ড. শাওকী দায়ফ, তারিখুল আদাবিল আরাবী, ‘অসরুদ-দুওয়াল ওয়াল ইমারাত, মিসর (কায়রো: দারুলমা‘আরিফ, ১৯৯০খ্রি.), সং.২, খ.৭, পৃ.৩৬০

৬৬ মুহাম্মদ যাগলূল সাল্লাম, আল-আদব ফীল-‘আসরিল-আয়্যূবী(কায়রো:মানশাআতু ল-মা‘আরিফ, ১৯৬৭খ্রি.), পৃ.৪১৫-৫০।

৬৭ ইবনুত-তা‘আবীযী, দীওয়ান (কায়রো: মাতবা‘আতুল-মুকতাতাফ, ১৯০৩খ্রি.), পৃ.৩৭।

৬৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৯।

৬৯ মুহাম্মদ যাগলূল সাল্লাম, আল-আদব ফীল-‘আসরিল-আয়্যূবী, পৃ.৪১৫-২২।

৭০ প্রগুক্ত, পৃ.৬৪৯-৫৮।

৭১ ড. ‘উমর মূসা পাশা, আল-আদব ফী বিলাদিশ শাম(কায়রো:মাতবা‘আ মুকতাতাফ, ১৯০৩খ্রি.,পৃ.২৬৬-৭; ইবনুস-সা‘আতী, দীওয়ান (বৈরূত:মাতবা‘আ আমিরকানিয়া, ১৯৩৮খ্রি.), খ. ১, ২৯২-৪।

৭২ ইবনুস-সা‘আতী, দীওয়ান, খ.২, পৃ.৪০৬-৮।

৭৩ ড. মুহাম্মদ যগলুল সাল্লাম, আল-আদব ফীল-‘আসরিল আয়্যূবী, পৃ.৪০০৪-৭; ইবন সানা’ আল-মুলক, দীওয়ান (কায়রো: মাকতাবা ‘আরাবীয়্যা, ১৩৮৭/১৯৬৭), খ.২, পৃ.১৭২-৭৫।

৭৪ ‘উমর মূসা পাশা, আল-আদব ফী বিলাদিশ-শাম, পৃ.২৯৬।

৭৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬-৭।

৭৬ মুহাম্মদ যগলুল সাল্লাম, আল-আদব ফীল-‘আসরিল-আয়্যূবী, পৃ. ৪২৩-৪৭; ইবনুন-নাবীহ আল-মিসরী, দীওয়ান (দামিশক: দারুল ফিকর, ১৯৬৯ খ্রি.), পৃ. ১৩০-৩১।

৭৭ ইবনুন-নাবীহ আল-মিসরী, দীওয়ান, পৃ.১৩০-৩১; আমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারিখুল আদাবিল ‘আরাবী (বৈরূত: দারুল-মা‘রিফা, ১৪১৮/১৯৯৭), পৃ.২৫২-৩।

৭৮ ‘উমর মূসা পাশা, আল-আদব ফী বিলাদ আশ-শাম, পৃ.৩৪৪-৭১; ড. মুহাম্মদ যাগলূল সাল্লাম, আল-আদব ফিল-‘আসরিল আয়্যূবী, পৃ.৩৮৩-৯০; ইবন ‘উনায়ন, দীওয়ান (দামিশক: মাজমা‘ ‘ইলমী আল-‘আরাবী, ১৩৬৫/১৯৪৬, পৃ.২১০-১১।

৭৯ ড. মুহাম্মদ যগলূল সাল্লাম, আল-আদব ফীল-‘আসরিল-আয়্যূবী, পৃ.৫২৯-৪০।

৮০ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩২-৩৩।

৮১ আবদুল ফাত্তাহ আল-শালবী, আল-বাহা যুহায়র (কায়রো: দারুল-মা‘আরিফ, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৫-১২৪।

৮২ ‘উমর মূসা পাশা, আল-আদব ফী বিলাদ আশ-শাম, পৃ. ৩২৩-৩৮।

৮৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬-৬০।

৮৪ ড. মুহাম্মদ যাগলুল সাল্লাম, আল-আদব ফীল-‘আসরিল-আয়্যূবী, পৃ.২২০-৩৮; ড. ‘উমর মূসা পাশা, আল-আদব ফী বিলাদিশ-শাম, পৃ.২২০-৩১।

৮৫ প্রাগুক্ত, পৃ.২৩০-৩১; ড. ‘উমর মূসা পাশা, আল-আদব ফী বিলাদিশ-শাম, পৃ. ২২০-৩১; ইবন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াকুল-ওফায়াত, সম্পা. ড. ইহসান ‘আব্বাস (বৈরূত : দার সাদিব, ১৯৭৩খ্রি.), খ.১, পৃ.৩১৩-৮।

৮৬ ড. মুহাম্মদ যাগলুল সাল্লাম, আল-আদব ফীল-‘আসরিল-আয়্যূবী, পৃ. ৩৭৯।

পঞ্চম অধ্যায়
আবুল ‘আতাহিয়্যাহ ও ইনুল ফারিদ বিরচিত কবিতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

আবুল আতাহিয়্যার যুহ্দ কবিতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

আবুল ‘আতাহিয়্যা বিরচিত যুহ্দ কবিতা রচনার বহুবিদ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মূল্যায়ন করা যেতে পারে। তিনি কবিতা রচনার মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন ও সম্পদ অর্জনের প্রত্যাশি ছিলেন। তিনি দরিদ্র পরিবারে জন্মে ছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার্জন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি জীবন ও জগৎ থেকে ব্যাপক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। দারিদ্রের কাছে তিনি হার মানেননি। তাঁর ছিল অনন্য সাধারণ কাব্যপ্রতিভা। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। অফুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্য ও নিরলস সাধনার মাধ্যমে তিনি তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌঁছিতে সামর্থ হন এবং কাব্যপ্রতিভার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হন। বহু ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে স্বীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ করার লক্ষ্যে সমকালীন রাজন্যবর্গের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে তুলেন। তখন ছিল আব্বাসী খিলাফতের যুগ। খলীফা মাহদী, হাদী ও হারুনুর রশীদ তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি হয়ে উঠেন হারুনুর রশীদের দরবারী কবি। খলীফাদের সুদৃষ্টি তাঁকে বিশাল সম্পদের অধিকারী করেছে। তবে তিনি জাগতিক ভোগ বিলাসে গা ভাসিয়ে দেননি। জীবন ও জগতে ছড়িয়ে থাকা অসঙ্গতি ও অভিজাত শ্রেণির ভোগবাদী চরিত্র তাঁকে দুনিয়া বিমুখ করে তুলে। তিনি নির্মাণ করতে থাকেন অসাধারণ সব যুহ্দ বা তাপস-মরমী কবিতা। এক সময় তিনি হয়ে উঠেন যুহ্দ কবিতার প্রতীক।[১]

আবুল ‘আতাহিয়্যা ‘আব্বাসী খলীফা মাহদী, হাদী ও হারিুনুর রশীদের প্রশংসা করে ও দরবারী কবি হয়ে প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে স্বীয় উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জন করেন। প্রথম জীবনে তিনি সু‘দা নামক এক নারীর প্রেমে পড়ে ব্যার্থপ্রেমিক হয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি খলীফা মাহদীর দাসী ‘উতবাকে ভালো বেসে তার প্রশংসায় প্রচুর কবিতা রচনা করেন। কিন্তু তিনি তাঁর প্রেমে ব্যার্থ হয়ে গযল বা প্রেম কাব্য রচনা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু খলীফা হারুনুর রশীদের নির্দেশে তিনি পুনরায় প্রেমবাব্য রচনায় ব্রতী হলেও পরিশেষে তিনি যুহ্দ কবিতা রচনায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। তিনি যুহদীয়াত কবিতা রচনা করে জনগণের কবি হিসেবে আত্ম প্রকাশ করেন। তঁর যুহ্দ কবিতা সম্পূর্ণ জটিলতামুক্ত সহজ-সরল শব্দ ও বাক্য দ্বারা রচিত কবিতা। কাব্য রচনায় অনুসরণীয় প্রাচীন ছন্দ ও মাত্রা থেকে বের হয়ে আবুল ‘আতাহিয়্যার নতুন ছন্দ ও মাত্রার আবিষ্কার করেছেন। কাব্য রচনায় কবি আবুল অতাহিয়্যা ও বাশ্শার বিন বুরদ সর্বপ্রথম অনুসরণীয় ছন্দ ও মাত্রার নীতি ভঙ্গ ও পরিহার করেছেন শ্রুতাদেরকে সতর্ক অথবা ক্লান্তিমুক্ত করার উদ্দেশ্যে আবুল ‘আতাহিয়্যা কর্তৃক উপদেশ প্রদানকারী

বক্তৃতায় কাব্যশৈলীর পুনরাবৃতি করা হয়। আবুল 'আতাহিয়্যা কর্তৃক সম্মোধন, বিস্ময়,অনুসন্ধান,অদেশ-নিষেধ সতর্কতার মারপেঁচ, শ্রোতাদেরকে উৎসাহ প্রদান ইত্যাদির সমর্থনে ও আঁধারে অধিক সৃজনশীল বাচনশৈলীর ব্যবহার হয়। মানুষের পার্থিব জীবন, চারিত্রক গণাবলী ও মানবতার বিষয়গুলো আবুল 'আতাহিয়্যারচিত কবিতায় আরোপিত একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ দার্শনিক ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রকৃত আধ্যাত্মিক কল্যাণকর জীবনের প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করা এবং পার্থিব অকল্যাণকর বিষয়গুলো থেকে বিরত রাখাই ছিলো আবুল 'আতাহিয়্যা বিরচিত যুহ্দ কবিতার মুখ্য উদ্দেশ্য।[২]

আবুল 'আতাহিয়্যাহ বলেন:[৩]

رَغِيفُ خُبْـزٍ يَـابِسٍ، تَـأْكُلُـهُ فِي زَاوِيَـــهْ وَكُـــوزُ مَـاءٍ بَـارِدٍ، تَشْرَبُـهُ مِنْ صَافِيَـــهْ
وَغُـرْفَـةٌ ضَيِّقَـةٌ، نَـفْسُكَ فِيهَـا خَـالِيَـــهْ أَوْ مَسْجِدٌ بِمَعْـزِلٍ ،عَنِ الـوَرَى، فِي نَـاحِيَـهْ

"প্রকৃত যুহ্দ হলোএকটি সুকনো রুটির টুকরো কোনো নিরব কোণে বসে অহার করা এবং এক মগ বিশুদ্ধ ঠাণ্ডাপানি পান করা; কোনো সংকির্ণ নির্জন কুটিরে নিজকে একা আবদ্ধ রাখা, অথবা নির্জনে একটি মসজিদে, লোকালয় হতে দূরে অবস্থান করা"।

যুহ্দ কবিতা রচনাকারী সমসাময়িক কবিগণ

আবুল 'আতাহিয়্যা যুহ্দ কবিতার উৎকর্ষের পর্যায়ে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সমসাময়িক যুহ্দ কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন-'আলী বিন ইসমা'ঈল আল-কুরেশী, যিনি তালীতাল উপাধীতে ভূষিত। অবূ ইসহাক আল-ইলবী আবুল আতাহিয়্যা ইবন আবী যামানায়ন। আবুল 'আতাহিয়্যা কর্তৃক যুহ্দ কবিতার ব্যাপক প্রসারের এক পর্যায়ে আরবী সূফী কবিতার আত্ম প্রকাশ ঘটে। অনুরূপভাবে রাসূলপ্রসস্তি এবং ইব্রাহীম আদহাম, সুফয়ান আছ-ছাওরী,দাউদ আত-তা'ই, রাবি'আ আল-'আদবিয়্যা, আল-ফুদাইল ইবন ই'য়াদ, শাফীক আল-বালখী প্রমুখ যুহ্দ কবিদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। যুহ্দ কবিতা ও নসীহত সম্পর্কিত কাব্য বিকাশের এক বিশেষ পর্যায়ে সূফী কবিতা বিকাশ লাভ করে।[৪]

ইবনুল ফারিদের সূফী কবিতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ইবনুল ফারিদ ছিলেন একজন আল্লাহপ্রেমিক সূফীকবি বা মরমিকবি। হুব্বুল ইলাহী বা মহান আল্লাহর প্রতি প্রেমই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহর প্রতি মানুষের ভালবাসা এবং মানুষের মহান আল্লাহর ভালবাসা ছিলো তাঁর আল্লাপ্রেমের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এ প্রেমই তাঁকে তাঁর লক্ষ্যপথে তাড়িত করেছে। তাঁকে বলা হয় সুলতানুল আশিকীন বা প্রেমিকদের কবিসম্রাট। তিনি একাধারে আলিম, ধর্মতত্ত্ববিদ, ফিকহশাস্ত্রবিদ,ফকীহ, সূফীসাধক,

সূফীকবি, সূফীতাত্ত্বিক, আরব মরমিকবি ও আশিকে ইলাহী। যুহুদ বা দুনিয়াবিমুখতা ছিল তাঁর কাব্যের প্রধান উপজিব্য এবং চিরন্তনবাস্তবতা। মহান আল্লাহ প্রেম প্রাপ্তির লক্ষ্যে তিনি দিনে সিয়ামসাধনা এবং রাতজেগে সালাত আদায় করা ছিল তাঁর নিত্য নৈমত্তিক ইবাদত। তিনি দিনের পর দিন পাহাড়-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে, উষ্ণ মরুপ্রান্তরে দীনহীন ফকীরের ন্যায় মহান আল্লাহর অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আল্লাহপ্রেম তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও একই স্থানে স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। তিনি তাঁর প্রভুর ভালোবাসায় ঘর ছেড়েছেন, আবার তাঁরই ভালোবাসায় ঘরে ফিরেছেন। তাঁর যুগে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ যুহুদকবি, সূফীসাধক ও সূফীকবি। ইবনুল ফারিদ ঐক্যসংযুক্তির ইত্তিহাদ(وحدة الشهود) তত্ত্বের প্রতি যা তাঁর সূফীকাব্যদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে পরিগণিত। কবি ইনুল ফারিদ তাঁর শিক্ষক মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ সূফীতত্ত্ব দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হননি। থোমাস এমিল হোমারিনের মতে, তখন মিসরে শুধু ইবনুল ফারিদই(১১৮১-১২৩৫খ্রি.) সাড়ে সাতশত বছরের সূফী কবির ভাগ্যাকাশ অলংকৃত করতে পেরেছেন। নোবেল বিজয়ী নাজীব মাহফুজসহ সমকালীন মিসরের কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁদের রচনায় এই সূফীকবির কবিতা তাঁদের লেখনির যথাযথাস্থানে উদ্ধৃত করেছেন।[৫]

একদা ইবনুল ফারিদ মিসরের জামি‘ মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করতে প্রবেশ করে দেখেন যে, খতীব খুতবা দিচ্ছেন, আর নাম না জানা একজন-লোককে মসজিদের ভেতর গান গাইতে দেখেন। তিনি লোকটিঅেতি সংগোপনে আদবের সাথে দূরে সরিয়ে দিলেন। নামাজ শেষে সকল মুসল্লী প্রস্থান করলে ইবনুল ফারিদ মসজিদ থেকে বের হয়ে দেখেন যে, গায়ক লোকটি তাঁর সামনে এসে নিম্নের কবিতাটি রচনা করেন:[৬]

قسم الإلـه الأمـر بين عبـاده فـالصمت ينشد والخلي يُسَبح

ولعمري التسبيح خير عبادة للناسكين وذا لقوم يُصْلح

“আল্লাহ বান্দাদের মাঝে তাঁর নির্দেশ(হুকুম) ভাগাভাগি কওে দিয়েছেন। অতএব, তাঁর অনুরক্ত বান্দা কবিতা রচনা করে । আর তাঁর রিক্ত হস্ত বান্দা তাসবীহ পড়েন; আমার জীবনের শপথ! সঠিক পথ অনুসরণকারী (নাসিক, যাহিদ) ও জাতীর সংমস্কারকদের(মুসলিহ) জন্য তাসবীহ উৎকৃষ্ট”। কবিতাটি শুনে ইবনুল ফারিদ যুহ্দ বা আধ্যাত্মিকতার প্রতি যারপরনাই অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং আল্লাহরপ্রেম রচিতকবিতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর মতে আখিরাতের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ । আখিরাতের সফলতাই প্রকৃত সফলতা। তিনি সকল কিছুর উপর আল্লাহর প্রেমকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। শারীরিক ওবাহ্যিক প্রেমের পরিবর্তে তিনি আত্মিক ও আধ্যাত্মিক প্রেমকে বেছে নিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করে আল্লাহপ্রেমইমানুষসৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য ও প্রধান ইবাদত। পার্থিব খ্যাতি অর্জনের

পেছনে তিনি কখনো প্রতিযোগী হননি, বরং খ্যাতিই তাঁর পেছনে দৌঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। কোনো-শাসক সুলতান অথবা কোনো রাজা-বাদশাহর দরবারে তিনি কখনো গমন করেননি এবং তাদেরকে ভালো বাসেননি। এমনকি তিনি তাঁদের কারো প্রশংসায় স্তুতিকবিতাও রচনা করেননি। রাজা-বাদশাহগণ তাঁর দরবারে আসতে চাইলেও তিনি অনুমতি দেননি।[৭]

কবি ইবনুল ফারিদ রচিত কবিতায় শৈশব ও কিশোরকালের চিত্র, নানারঙ্গ ও বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ রয়েছে। তাঁর কাব্যে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রেমাধিক্য ব্যাপক স্থান পেয়েছে। ইবনুল ফারিদের যুহদ ও সুফীতত্ত্বেরক্ষেত্রে অবদান হিসাবে শুধু তাঁর রচিত একটি কবিতা সংকলনগ্রন্থ তথা দীওয়ান ইবনুল ফারিদ রয়েছে। তাতে তাঁর বাল্যকালে ইবনুল ফারিদ পিতার তত্ত্বাবধানে বড় হতে থাকেন। ধর্ম-কর্ম পালনে, পবিত্রতায়, যুহ্দিয়াত বা দুনিয়া-বিমুখতায় তিনি অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদ ও অল্পেতুষ্টির কারণে তিনি দুনিয়া বিমুখতার প্রবাদপুরুষে পরিণত হন। ইবনুল ফারিদ সুন্নী মতাবলম্বী শাফি'ঈ আইন ও হাদীসে রাসূলুল্লাহ(স.) ব্যাপক অধ্যয়ন করেন। বুরহানুদ্দীন আল-জা'বিরী(মৃ.৬৮৭/১২৮৮),শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ আল-কিমী (মৃ.৬৮৫/১২৮৬), শিহাবুদ্দীন আস-সোহরাওয়ার্দী (মৃ.৬৩২/১২৩৪) ও যাকীউদ্দীন আব্দুল আজীম আল-মুনযিরী (মৃ.৬৫৬/১২৫৮) প্রমূখ সমকালীন প্রখ্যাত আলিমগণের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। 'যাকী উদ্দীন আব্দুল 'আজীম আল-মুনযিরী (মৃ.৬৫৬/১২৫৮) ছিলেন সমকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ। ইবনুল ফারিদ তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তিনি ইবনুল 'আসাকির আদ-দিমাশকী (মৃ.৬০০/১২০৩)-এর কাছ থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। এক পর্যায়ে সূফীদর্শন ও সূফীতত্ত্বের প্রতি তাঁর প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠে এবং যুহ্দিয়াত বা দুনিয়াবিমুখিতা নিঃসঙ্গ সূফী জীবনকেই তিনি বেছে নেন। তিনি জীবনের শেষ চারবছর মাতৃভূমি মিশরেই অবস্থান করে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনী বক্তৃতা করতেন। আধ্যাত্মিক জগতের এই রাজপুত্র ২রা জুমাদীল উলা, ৬৩২/১২৮৪ কায়রোতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর অন্তিমউপদেশ অনুযায়ী পরদিন কায়রোর মুকাত্তাম পাহাড়ের পাদদেশে 'আল-'আরিদ' নামক স্থানে তাঁর নির্মিত মসজিদেও পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। এখনও তাঁর মাযারে ভ্রমণকারীদের ভিড় লেগে আছে। তাঁর জানাযার নামাযে বিপুল সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যাক্তি ও মুসুল্লী উপস্থিত ছিলেন।[৮]

ইবনুল ফারিদ ছিলেন তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আরব সূফী কবি বা 'আরব মরমী কবি (শা'ইর সূফী আল-'আরাবী), সূফীসাধক ও আল্লাহ-প্রেমিক ('আশিকে ইলাহী) এবং সুলতানুল 'আশিকীন(আল্লাহ-প্রেমিকদের সম্রাট। আল্লাহপ্রেমের সত্যিকার প্রেমিক হিসেবে তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছেন। সূফীতাত্ত্বিকগণ তাঁকে সুলতানুল 'আশিকীন বলেও অভিহিত করেছেন। ফার্সীকবি মাওলানা

জালালুদ্দীন রুমীর(মৃ.৬৭২/১২৭৩) পরেই আরবী কবি ইবনুল ফারিদ যুহ্‌দ তথা সুফী কবির মর্যাদার আসন অলংকৃত করেছেন। তাঁর কবিতার চরণগুলোতে মহান আল্লাহর গুণাগুণ প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর কাব্যে মহান আল্লাহর প্রতি তাঁর হৃদয়নিংড়ানো ভালোবাসার ছাপ ফুটে উঠেছে। তাঁর রচিত কাব্যমালার সবকটি কবিতার বিষয়বস্তু হলো মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা(গযল)। বিশেষ করে তাঁর রচিত মদের প্রতীকীকবিতা(খামরিয়্যাহ) ও সূফী তরীকার কবিতা(নাজমুস সুলূক) সূফী কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিরল প্রতিভাসংযোজন। ইবনুল ফারিদ সুফীদর্শন গ্রহণ করার পর কঠোর আধ্যাত্বিক সাধনায় লিপ্তহন। তাঁর ইবাদত বন্দিগীর মধ্যে বহুমাত্রিক আধ্যাত্মিক চেতনা লক্ষণীয়। বহু বৎসর নির্জন উপাসনায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। মহান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির নৈপুণ্য অবলোকন করার তীব্র বাসনা তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। তিনি সূফী-দর্শন ও তত্ত্ব অন্বেষণে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করেন। কখনো কায়রোর পাহাড়-পর্বতে, কখনো মরুভূমির নির্জন প্রান্তরে, কখনো বনে-জঙ্গলে পশুদের সাথে অবস্থান করেছেন।[৯]

একদা ইনুল ফারিদ হিজাযের উদ্দেশে সফর করেন এবং সেখানে ১৫ বছর যাবৎ নিঃসঙ্গ সূফীসাধকের ন্যায় জীবনযাপন করেন। মিসরে অবস্থানকালে ইবনুল ফারিদ কঠোর ত্যাগ ও সাধানায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে ও মরুভূমিতে অবস্থান করেও তাঁর হৃদয়ের অর্গল খুলেনি এবং তাঁর আত্মার প্রশান্তি অর্জিত হয়নি। একদিন ব্যথিত হৃদয়ে কবি মাদরাসা-ই সুফিয়ায় প্রবেশ করেন। একজন সবজি-বিক্রেতাকে সালাত আদায়ের জন্য এলোমেলো ভাবে অজু করতে দেখে কবি তাঁকে মৃদু তিরস্কার করলেন। সবজি বিক্রেতা তাঁর তিরস্কারে কর্ণপাত নাকরে বললেন মিসরে তোমার হৃদয়দ্বার খুলবেনা; তুমি এখনই পবিত্র মক্কায় গমন কর। সেখানে তোমার অন্তরের পর্দা তিরোহিত হবে। অজানা দীনহীন এই সবজি বিক্রেতার কথাশুনে কবি যারপরনাই বিস্মিত হলেন। তিনি অনুধাবন করলেন, তরকারি বিক্রেতা ছদ্মবেশী একজন ওলী ব্যতীত অন্য কেউ নন। কবি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং বিনয়ের সাথে তাঁকে বললেন, শায়খ! পবিত্র মক্কায় যাওয়ার পাথেয় বলতে আমার নিকট কিছুই নেই, আমি কীভাবে সেখানে গমন করবো? ছদ্মবেশী ওলী তখন তাঁকে বললেন, এদিকে এসো, এই দেখ পবিত্র মক্কা তোমার সম্মুখে। কবি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখলেন সত্যিই তাঁর সম্মুখে মক্কার কা'বা শরীফ অবস্থিত। অতঃপর, তিনি তাতে গমন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কবির হৃদয়ের অর্গল খুলে গেল, অশান্ত আত্মা প্রশান্ত হলো, তাঁর সারাজীবনের সাধনা পূর্ণতা লাভ করল।[১০]

কবির বয়স যখন ৩৫ বছর তখন তিনি শায়ক আবুল হাসান মুহাম্মদ 'আলী আল-বাক্কাল নামক এক রহস্যময় সূফী সবজী বিক্রেতাকে এলোমেলো ওজু করা অবস্থায় সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি কবিকে বলেন যে, তিনি শুধু পবিত্র মক্কা গমন করে তাঁর কাঙ্খিত মনের স্বর্গীয় অর্গল খুলতে পারবে। সবজী বিক্রেতার কল্যাণে তিনি মক্কায় গমন করেন এবং সেখানে ১৫ বছর অবস্থান করার মাধ্যমে তিনি তাঁর কাঙ্খিত মনের অর্গল খুলতে সামর্থ্য হন।[১১]

ইবনুল ফারিদ বলেন:[১২]

"…as I entered it[Makka] enlightenment came to me wave after wave and has never left".

তারপর তিনি নিম্মের কবিতাটি রচনা করেন:[১৩]

يـــا سـمـيـري روح بـمكـــة روحـي شـاديـــا إن رغـبـت فـي إسـعـــادي
كـــان فـيـهـــا أنسي ومـعـراج قدسي ومـقـــامي الـمـقـــام والـفـتـح بـــاد

"ওহে আমার রাতের সঙ্গী! যদি তুমি আমার মনকে পুলকিত করতে চাও, তাহলে পবিত্র মক্কার গুণাগুণ বর্ণনা করার মাধ্যমে তুমি আমার আত্মাকে উজ্জীবিত কর; তাতে(পবিত্র মক্কায়) রয়েছে আমার অন্তরঙ্গতা, আমার ধর্মপ্রাণতার সমুত্থান, মকামে ইব্রাহীমে আমার অবস্থান এবং পরিষ্কার আলোক-সম্পাত"।

কবি ইবনুল ফারিদের মত একজন বিশিষ্ট আরব সূফী কবি সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে থোমাস এ্যমিল হোমারিন তাঁর সম্পর্কে অভিমত প্রদান করে বলেন:[১৪]

"Contemporary religious singers and writers, including Nobel laureate Naguib Mahfouz, continue to cite the poet's verse. Using biographies, polemics, legal rulings, histories, and novels, Homerin traces the course of Ibn al-Farid's saintly reputation. He relates the rise and fall of Ibn al-Farid's popularity to Egypt changing religious, cultural, and political environment Homerin's historical narrative reveals the dierent ষবহংবং through which people have read Ibn al-Farid's writings, the influence such readings have had on the practice and literature of Islam, and the varying viewpoints individuals have held regarding the importance of this holy man."

কবির পিতা আল-ফারিদ সিরিয়ার হামাত নগরীর এক ধণাঢ্য মুসলিম পরিবারের অধিবাসী ছিলেন। হামাত ত্যাগ করে তিনি পরে মিসরের কায়রো নগরীতে চলে আসেন। কায়রোর এই ধনাঢ্য মুসলিম পরিবারে ৫৭৭/১১৮১সালে ইবনুল ফারিদ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্মসাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। 'ইব্ন খাল্লিকানের মতে তিনি ৫৭৬/১১৮০ মিসরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইব্ন ইয়াসিরের বরাতে ড. মুস্তফা হিলমী বলেন, তিনি ৫৭৭/১১৮১সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনুল ইমাদের মতে তিনি ৫৭৭/১১৮১ জন্মগ্রহণ করেন। প্রফেসর ড. ফাদার জোসেফ স্কাতূলীূনের গবেষণালব্ধ অভিমত হলো, তাঁর সঠিক জন্মতারিখ ৫৬৭/১১৮১। বাল্যকালে ইবনুল ফারিদ পিতার তত্ত্বাবধানে বড় হতে থাকেন। আরবী কাব্য চর্চায়, ধর্ম-কর্ম পালনে, পবিত্রতায়, যুহ্দিয়াত বা দুনিয়া বিমুখতায় তিনি অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদ ও অল্পেতুষ্টির কারণে তিনি দুনিয়া বিমুখতার প্রবাদপুরুষে পরিণত হন।[১৫]

لايكاد يتصل بالناس إلا حين كان يأتي إلي الحرم الشريف معطوفا به، مصليا، فيه.

ইবনুল ফারিদ সুন্নী মতাবলম্বী শাফি'ঈ আইন ও রাসূলুল্লাহ(স.)এর হাদীসে ব্যাপক অধ্যয়ন করেন। বুরহানুদ্দীন আল-জা'বিরী (মৃ.হি.৬৮৭/খ্রি.১২৮৮), শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ আল-কিমী (মৃ.হি.৬৮৫/ খ্রি.১২৮৬), শিহাবুদ্দীন আস-সোহরাওয়ার্দী(মৃ.হি.৬৩২/খ্রি.১২৩৪)ও যাকীউদ্দীন আব্দুল আজীম আল-মুনযিরী(মৃ.হি.৬৫৬/খ্রি.১২৫৮) প্রমূখ সমকালীন প্রখ্যাত আলিমগণের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। 'যাকী উদ্দীন 'আব্দুল 'আজীম আল-মুনযিরী (মৃ.৬৫৬/১২৫৮) ছিলেন সমকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ। ইবনুল ফারিদ তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তিনি ইবনুল 'আসাকির আদ-দিমাশকী(মৃ.৬০০/১২০৩)-এর কাছ থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। এক পর্যায়ে সূফীদর্শন ও সূফীতত্ত্বের প্রতি তাঁর প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠে এবং যুহ্দিয়াত বা দুনিয়াবিমুখিতা নিঃসঙ্গ জীবনকেই তিনি বেছে নেন। তিনি জীবনের শেষ চারবছর মাতৃভূমি মিশরেই অবস্থান করে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনী বক্তৃতা করতেন এবং আরবী কবিতার প্রশিক্ষণ দিতেন। আধ্যাত্মিক জগতের এই রাজপুত্র ২রা জুমাদীল উলা, ৬৩২/১২৮৪ সালে কায়রোতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর অন্তিমউপদেশ অনুযায়ী কায়রোর মুকাত্তাম পাহাড়ের পাদদেশে 'আল-'আরীদ' নামক স্থানে পরদিন তাঁর নির্মিত মসজিদের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর জানাযার নামাজে বিপুলসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মুসল্লী উপস্থিত ছিলেন। এখনও তাঁর মাযারে যিয়ারতকারী ও ভ্রমণকারীদের ভিড় লেগেই আছে।[১৬]

দীর্ঘ পনেরো বছর ইবনুল ফারিদ পবিত্র মক্কায় অবস্থান করেন। সেখানে তিনি নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করে আল্লাহপ্রেমের উচ্চ মাকামে পৌঁছে যান। ত্যাগ-তিতিক্ষা আর সাধনার প্রতিটি মাকামে তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। যখন তিনি হারাম শরীফে আসতেন তখনই লোকেরা তাঁকে দেখতে

পেত। মক্কা মুকার্‌রামায় পনের বছর অবস্থানকালে তিনি পবিত্র কা'বা যিয়ারত ও সালাতে ব্যস্ত থাকতেন। এক সময় মিশরের সবজি বিক্রেতা বুযুর্গ অন্তিমশয্যায় ছিলেন বিধায় তিনি মিশরে ফিরে আসেন। কবি প্রিয় বুযুর্গের সাথে সাক্ষাৎ করেন। একজন আরেক জনকে চিরদিনের জন্য বিদায় সম্ভাষণ জানান। সবজি বিক্রেতা মহান সাধক মৃত্যুবরণ করেন। এই সবজি বিক্রেতা ছদ্মবেশী ওলীর নাম জানা যায় তাঁর মাযারে কবির উৎকীর্ণ লিপি থেকে। সেখানে কবির পরিচয়ের শেষ লাইনে লেখা আছে, শায়খ আবুল হাসান 'আলী আল-বাক্কাল-এর ছাত্র। কবি স্বীয় শিক্ষকের জানাযার নামায পড়ান এবং তাঁর নির্মিত মসজিদের পার্শ্বে আল-মুকাত্তাম পাহাড়ের পাদদেশে 'আল-আরিদ' নামক স্থানে তাঁকে সমাহিত করেন।[১৭]

ইবনুল ফারিদের সূফী কাব্য রচনার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তেমন ছিলো যেমন ছিলো ফার্সী সূফীকবি মাওলানা জালালুদ্দীন রূমীর(হি.৬০৪-৬৭২/খ্রি.১২০৭-১৩৭৩)। ইবনুল ফারিদের প্রকাশিত ২২০ পৃষ্ঠার আরবী কবিতাসংকলন দীওয়ানের ২০টি কাসীদায় সর্বমোট ১৬৪৪ টি চরণ মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রকৃত প্রেমনিবেদক পরিপূর্ণ গযল(প্রেমকাব্য) এবং সূফীতত্ত্বনির্ভর হিসেবে চিহ্নিত। তাঁর রচিত নাজমুস সুলূক বা আধ্যাত্মিক সাধনার কবিতা বা তা'ইয়্যাহ কুবরা শিরোনামের কবিতাকুঞ্জটিতে রয়েছে ৭৬১টি চরণ। নাজমুস সুলূক আরবী কাসীদার ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ কাসীদা। দৈর্ঘ্যে দীওয়ানের বাকী অংশের প্রায় সমান এ সুবিখ্যাত কাসীদাটিতে ইবনুল ফারিদ আধ্যাত্মিকতার সকল অভিজ্ঞতার এক মর্মস্পর্শী মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ চিত্রায়িত করেছেন। ফলে, কাসীদাটি এক অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অবদান ও আধ্যাত্মিক শিক্ষামূরক কাব্যরচনা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এতে আধ্যাত্মবাদীর অভিজ্ঞতা মুসলিম জাতির বাস্তব প্রকাশরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। সূফী সমাজে তাঁর অমর রচিত নাজমুস সুলূক ও খামরিয়্যা কাসীদাদ্বয় এক অতি উঁচু মানের রচনা বলে বিশ্ব সূফী কাব্য সাহিত্যে এক বিরল স্থান দখল করে আছে এবং তা পৃথিবী অনেক ভাষায় অনূদীত হয়েছে। তাঁর রচিত মদের বর্ণনাসম্বকলিত খামরিয়্যা কবিতায় রয়েছে আল্লাহ-প্রেমের 'সুরা' হতে উৎপন্ন 'মত্ততা' -এর প্রতীকী বর্ণনা রয়েছে। প্রেমনেশাযুক্ত আল-খারিয়্যাহ মীমিয়্যা কাসীদায় ৪১টি কবিতাচরণ স্থান পেয়েছে। অবশিষ্ট ১৮টি কাসীদায় আরো ৮৪২ টি কবিতা চরণ মহান আল্লাহ ও তঁর রাসূলের প্রতি নিবেদিত প্রেমকাব্য বা গযল উদ্দেশ্যে রচিত ছিলো।[১৮]

ইবনুল ফারিদের কবিতাকে ইসলামী সূফীকাব্য হিসাবে সর্বজন গৃহীত। ইবনুল ফারিদ তাঁর রচিত কাব্য গ্রন্থে প্রকৃতি, মদের প্রতীকী, নারীর প্রতীকী, প্রেমকাব্য, লোকগীতি, ধাঁধাঁ ইত্যাদি নামে বারটি বিষয়বস্তু নির্বাচনের উদ্দেশ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইবনুল ফারিদ বিরচিত সূফী কবিতার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর প্রেমর প্রাপ্তি। ইবনুল ফারিদকে সূফী কবি ও প্রেমিক কবিদের

সম্রাট তথা সুলতানুল আশিকীন বলা হতো, যেমন তাঁর উস্তাদ মুহীউদ্দীন ইবনুল 'আরাবী কে সুলতানুল আরিফীন বা আধ্যাত্মিকদের সম্রাট বলা হতো। ফার্সী সূফী কবি জালাল উদ্দীন রূমী যেমন প্রথম সূফী কবি সম্রাট ছিলেন, তেমনি আরবী সূফী কবি ইবনুল ফারিদ দ্বিতীয় সূফী সম্রাট ছিলেন। মহান আল্লাহর প্রতি প্রেম যেমন সূফী কাব্যের একটি প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য, তেমনি এখানে রয়েছে যুহ্দ, প্রজ্ঞা, দু'আ, তাসবীহ, মুনাজাত, সূফী প্রেমকাব্য, উপদেশবলী, রাসূলপ্রসস্তি ইত্যাদি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী। ইবনুল ফারিদের দীওয়ান আকারে ছোট হলেও এটা 'আরবী সাহিত্যের অত্যন্ত মৌলিক কাব্যগুলোর অন্যতম। তাঁর অপ্রধান কবিতাগুলো রচনা রীতির উৎকর্ষে ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এবং অলংকারশাস্ত্রে ও রচনাকৌশলে বিস্তর প্রয়োগ সমৃদ্ধ। এসব কবিতা সূফী সমাবেশে সুরসহকারে গীত হওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত। এ সব কবিতার বাহ্য ও গুঢ় অর্থসমূহ এমনভাবে সংমিশ্রিত যে, সেগুলোকে প্রেমের কবিতা অথবা আধ্যাত্মিক স্তবগান-উভয়রূপেই পাঠ করা যেতে পারে।[১৯]

যুহ্দ কবিতা ও নসীহত সমর্কিত কবিতা বিকাশ লাভ করার পর সূফী কবিতা বিকাশ লাভ করে। অনুরূপভাবে, ইব্রাহীম আদহাম, সুফয়ান আছ-ছাওরী,দাউদ আত-তা'ই, রাবি'আ আল-'আদবিয়্যা, আল-ফুদাইল ইবন ই'য়াদ, শাফীক আল-বালখী প্রমুখ আলিম, সাহিত্যিক, ফকীহ ও মুহাদ্দিস সমাজে রচিত কাব্যে রাসূলপ্রসস্তি, তাপশ্চর্যা, আল্লাহভিরুতা ও তাকওয়া প্রসার লাভ করার পর সূফী কবিতা আত্ম প্রকাশ করে। যুহ্দ কবিতা ও নসীহত সম্পর্কিত কাব্য বিকাশের এক বিশেষ পর্যায়ে সূফী কবিতা বিকাশ লাভ করে। আর, যুন-নুন আল- মিসরী(মৃ.২৪৫/৮৬০) তাসাওফ নীতিমালার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মহান আল্লাহপ্রেমকে উপজীব্য করে করে ইবনুল ফারিদ(হি.৫৭৭-৬৩২/খ্রি.১১৮১-১২৩৪) কাব্য রচনার মাধ্যমে তাঁর পূর্ব ও সমসাময়িক সূফীদের উপর এক নতুন ধরণের প্রেমকাব্য রচনা করে তিনি সূফী সম্রাট উপধীতে ভূষিত হয়েছেন। ইবনুল ফারিদ তাঁর কাঙ্খিত লক্ষ্যে উপনী হয়ে সূফী ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। আবুল 'আলা-আল-'আফীফী তাঁর প্রশংসা করে বছেন:[২০]

عمر بن الفارض أحد أقطاب العاشقين وأعظم شاعر صوفي في اللغة العربية علي الإطلاق

"উমর ইবুল ফারিদ সাধারণত প্রেমিকদের একজন কুতুব এবং আরবী ভাষার একজন মহান সূফী কবি"।

ইবনুল ফারিদ নিজের সত্ত্বাকে সূফী স্তরের প্রেমিকদের ইমামের আসনে উপনিত করেছেন। মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের বিষয়ে তিনি বলেন:[২১]

زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحمْ حشى بلظى هواكَ تسعرَا
وَإذا سألتُكَ أنْ أراكَ حقيقةً، فاسمَحْ، ولا تجعلْ جوابيْ: لنْ ترَ

"হে আল্লাহ! তোমার প্রেমে আমি দিশাহারা, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা আরো বাড়িয়ে দাও, আমার সত্বার উপররহম কর যা তোমার আবেগ দহনে প্রজ্বলিত; তোমাকে প্রকৃতরূপে দেখার আবেদন করলে আমাকে ক্ষমা কর, আর আমার প্রতি উত্তর 'কখনো আমাকে দেখতে পারবেনা' যেন নাহয়"।

তিনি মহান আল্লাহর প্রচুর ভালোবাসা পাওয়ার প্রার্থনা করে আরো বলেন:[২২]

وَلَقَدْ خَلَوْتُ مع الحبيب، وبيننا سرٌ أرقٌ من النسيم إذا سرى

وَأَباحَ طَرْفِيْ نظرةً أملتُها، فغدوْتُ معروفاً، وكنْتُ منكر

"আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধুর সাথে আমি অনেক সময় নির্জনে অবস্থান করেছি, আমাদের মাঝে এমন এক গোপন রহস্য প্রতিভাত হয়েছিলো যা সকালের প্রবাহিত মৃদুমন্দ বায়ুর চেয়েও সূক্ষ্ম ও মধুর ছিলো; বন্ধু আমার এক নজর কাঙ্খিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে অনুমতি দিলো এবং আমি তাঁর অস্বীকৃতি সত্বেও সকালে তাঁর অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়েছি"। ইবনুল ফারিদ মহান আল্লাহ-প্রেমের মর্যাদায় মহান আল্লার দর্শন প্রাপ্তির নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিলেন।

এক্ষেত্রে তিনি পূর্বের ও সমসাময়িক সূফীদেরকে অতিক্রম করেছেন।

এক্ষেত্রে তিনি আরো বলেন:[২৩]

قل للذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى لأشجاني يري

عني خذوا، وبي اقتدوا، ولي اسمحوا، وتحدثوا بصبابتي بين الورى

"আমার পূর্বসুরী, উত্তরসুরী এবং যারা সব সময় আমাকে বিষণ্ব দেখতে চায়, তাদেরকে বলুন, তারা যেনো আমার কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে, আমার অনুসরণ করে, আমার প্রতি সহৃদয় হয় এবং সৃস্টিজগত দ্বারে আমার প্রেমানুরাগ সম্পর্কে আলোচনা করে"।

ইবনুল ফারিদ আল্লা-প্রেমে সকল সূফীর উপর মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছেন এবং তিনি মনে করেন সূফীরহস্য সম্পর্কে গবেষণা করতে হলে তাঁর মাধ্যমে করতে হবে। এইবলে তিনি সবাইকে আহ্বান করেন:[২৪]

كُل من في حماك يهواك لكن أنا وحدي بكل من في حماكا

فيك معنى حلاك في عينٍ عقلي، وبه ناظري معني حلاكا

"যারা তোমার আশ্রয়ে বসবাস করছে তারা তোমার কামনা অবশ্যই করবে, কিন্তু তার পরেও তোমার সকল আশ্রিতদের মধ্যে আমি সম্পূর্ণ একা; এটা সত্য যে তোমার মাঝে অবস্থান করা আমার কারণ-চক্ষুকে সৌন্দর্য মন্ডিত করেছে, সেখানে আমার দৃষ্টি তোমার সৌন্দর্য অবলোকনে ব্যস্ত রয়েছে"।

ইবনুল ফারিদ সর্বদা আল্লাহপ্রেমের অতল গহীনে অবস্থান করতেন। তাঁর জীবনাচার ও কবিতায় সমান্তরালভাবে দুনিয়াবিমুখ জীবনের প্রতিফলনই আমরা দেখতে পাই। তিনি সুলতানুল আশিকীন বা প্রেমিক সূফীকবিদের সম্রাট উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তিনি আরো বলেন:[২৫]

فقت أهل الجمال، حسناً وحسني، فبهم فاقة إلي معناكا

يحشر العاشقون تحت لوائي وجميع الملاح تحت لواكا

"তুমি সৌন্দর্য ও মহানুভবতায় নান্দনিক জনতাকে অতিক্রম করেছ। সুতরাং তোমার সুপ্তসত্য ও গুণের প্রতি তাদের অতীব প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সকল আল্লাহ-প্রেমিক শেষ বিচারের দিন আমার (আত্মার) পতাকাতলে একত্রিত হবে এবং সকল সুন্দর জনতা তোমার(রাব্বানী তাজাল্লিয়াতের) পতাকাতলে একত্রিত হবে"।

ইবনুল ফারিদের মধ্যে মহান আল্লাহর ভালবাসা প্রাপ্তির অন্বেষণের ক্ষেত্রে কখনো দুনিয়া প্রাপ্তির উদ্দেশ্য ছিলোনা। তাই তিনি বলেন:[২৬]

تقربتُ بالنفس احتساباً لها، ولم أكن راجيا عنها ثواباً، فأدنتِ

وقدمتُ مالي في مُآلي، عاجلاً، وما إن عساها أن تكون مُنيلتيْ

"প্রতিদান স্বরূপ আমি আমার আত্মা তাঁর জন্য উৎসর্গ করে তাঁর নৈকট্য লাভের কামনা করেছি, যা তাঁর থেকে অন্য কোনো বিনিময় পাওয়ার আশায় ছিলোনা, সুতরা তিনি আমাকে কাছে টেনে নিয়েছেন; আমি সানন্দে তাঁকে আমার প্রতিশ্রুত আগত পৃথিবীর পরমসুখ নিবেদন করলাম এবং তিনি আমাকে যথাক্রমে তাঁর করুণা দান করেছেন"।

সূফী কবি হিসাবে ইবনুল ফারিদের কাঙ্খিত সূফীকাব্যে অবস্থান

ইবনুল ফারিদ সূফী কবিতার সোনালী যুগের বিখ্যাত মরমী কবি ছিলেন। সূফী কবিতার তিনটি স্তর যথাক্রমে- ইসলামের আগমন থেকে দ্বিতীয় হিজরী শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত, দ্বিতীয় হিজরী শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে চতুর্থ হিজরী শতক পর্যন্ত, ৫ম হিজরী শতক থেকে ৭ম হিজরী শতক শেষ এবং ৮ম হিজরী শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। এই তৃতীয় যুগটি সূফী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ হিসাবে খ্যাত। এ যুগে স্পেনের মুহি উদ্দীন 'আরবী, 'আরবের ইবনুল ফারিদ ও পারস্যের জালালুদ্দীন রূমীর বিকাশ হয়। ইবনুল ফারিদ সূফী সাহিত্যের ইতিহাসে সূফী কবি ও সূফী কবি সম্রাট হিসাবে খ্যাত ছিলেন। ফার্সী কবি জালালুদ্দীন রূমীর পরেই তিনি এক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছেন। ইবনুল ফারিদ বিশ্বাস করতেন যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক প্রেমিকের প্রেমের মধ্যে অবস্থান করছেন। সুতরাং লায়লী ও মজনুন মহান আল্লাহকে ভালবেসেছে লায়লীরূপে, অনুরূপভাবে লায়লী মহান আল্লাহকে ভালবেসেছে কায়সরূপে। আর,কায়স যদি শুধু আল্লাহকে ভাল নাবাসতো

তাহলে সে লায়লীকে ভাল বাসতোনা, অনুরূপভাবে লায়লী যদি মহান আল্লাহকে ভাল না বাসতো তা হলে সে কায়সকে ভাল বাসতোনা। আর, ইবনুল ফারিদ মহান আল্লাহর-প্রেমে অপ্রতিদ্বন্দ্বি সূফী কবি ছিলেন।[২৭]

ইবনুল ফারিদ মিসরে অবস্থানকালীন সময়ে অধ্যাত্মিক জ্ঞানসাধনা করেছেন। বহু সময় নির্জন-বাসের জন্য জংগলে চলে যেতেন। কিন্তু তাতে তাঁর হৃদয়-দ্বার খুলেনি। একদিন তিনি ব্যথিত অন্তরে মাদ্রাসায়ে সূফীয়ায় প্রবেশ কওে একজন সবজি বিক্রেতা বাক্কালের সাক্ষাত পেলেন। বাক্কাল সালাত আদায়ের জন্য এলোমেলোভাবে ওযু করতে ছিলেন। ইবনুল ফারিদ তা দেখে বাক্কালকে কিঞ্চিত বিরস্কার করলেন। কিন্তু বাক্কাল তাঁর তিরস্কারের প্রতি কর্ণপাত না করে বলে উঠলেন, "ওহে ইবনুল ফারিদ! মিসরে তোমার হৃদয়ের দ্বার খুলবেনা; তুমি এখনই মক্কাশরীফ গমন কর, সেখানে তোমার কাঙ্খিত অন্তরের পর্দা তিরোহিত হবে"। সবজি বিক্রেতা বাক্কালের কথা শুনে ইবনুল ফারিদ তাঁকে একজন ছদ্মবেশী আধ্যাত্মিক সাধক ওলী বলে পরিষ্কার বুঝতে পারলেন। তিনি নিজের ধৃষ্ঠতা অনুধাবন কওে সবিনয় জিজ্ঞেস করলেন, "শায়খ! যানবাহন বা পাথেয় কিছুই নেই, আমি কি করে মক্কা শরীফ যাব?" প্রতিউত্তরে সবজি বিক্রেতা বললেন, "এ দিকে এসো, এই দেখ মক্কা শরীফ তোমার সামনে আছে"। কবি ইবনুল ফারিদ সামনের দিকে অবলোকন করে নিশ্চিত মক্কাশরীফ দেখে তাতে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কবি ইবনুল ফারিদের হৃদয়-দ্বার খুলে গেল। এরই মাধ্যমে কবি ইবনুল ফারিদের আজীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আধ্যাত্মিক সাধনা সফল হলো।[২৮]

সুদীর্ঘ পনেরো বছর ইবনুল ফারিদ পবিত্র মক্কায় অবস্থান করেন। সেখানে তিনি নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করে আল্লাহপ্রেমের উচ্চ মাকামে পৌঁছে যান। ত্যাগ-তিতিক্ষা আর সাধনার প্রতিটি মাকামে তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। যখন তিনি হারাম শরীফে আসতেন তখনই লোকেরা তাঁকে দেখতে পেত। তিনি পবিত্র কা'বা যিয়ারত ও সালাতে ব্যস্ত থাকতেন। এক সময় মিসরের সবজি বিক্রেতা ইনুল ফারিদের আধ্যাত্মিক সেই শিক্ষক অন্তিমশয্যায় ছিলেন বিধায় তিনি মিসরে ফিরে আসেন। কবি তাঁর প্রিয় শিক্ষকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। একজন আরেক জনকে চিরদিনের জন্য বিদায় জানান। সবজি বিক্রেতা মহান সাধক মৃত্যুবরণ করেন। এই সবজি বিক্রেতা ছদ্দবেশী ওলীর নাম জানা যায় তাঁর মাযারে কবির উৎকীর্ণ লিপি থেকে। সেখানে কবির পরিচয়ের শেষ লাইনে লেখা আছে, 'শায়খ আবুল হাসান আলী আল-বাক্কাল-এর ছাত্র'। কবি স্বীয় শিক্ষকের জানাযার নামায পড়ান এবং তাঁর নির্মিত মসজিদের পার্শ্বে 'আল-আরিদ' পাহাড়ের পাদদেশে তাঁকে সমাহিত করেন। ইবনুল ফারিদ ছিলেন তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরব সূফীকবি বা আরব মরমি কবি (শা'ইর সূফী আল-'আরাবী), সুফীসাধক ও আল্লাহ-প্রেমিক(আশিকে ইলাহী)। আল্লাহ প্রেমের সত্যিকার প্রেমিক হিসেবে তিনি

ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। সূফীতাত্ত্বিকগণ তাঁকে সুলতানুল আশিকীন বলেও অভিহিত করেছেন, যা তিনি তাঁর লক্ষ্যানুসারে তাঁর রচিত নাজমুস-সুলূক কাসীদায় প্রকাশ করেছেন। ফার্সী কবি জালালুদ্দীন রুমীর (মৃ.৬৭২/ ১২৭৩) পরেই আরবী কবি ইবনুল ফারিদ যুহ্দ ও সুফী কবির মর্যাদার আসন অলংকৃত করেছেন।[২৯]

ইবনুল ফারিদ বিরচিত সব কটি কবিতার চরণে মহান আল্লাহর গুণাগুণ প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর সব কাব্যে মহান আল্লাহর প্রতি তাঁর হৃদয়নিংড়ানো ভালোবাসার চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর রচিত কাব্যমালার সবকটি কবিতার উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা(গযল বা প্রেমকাব্য)। বিশেষ করে তাঁর রচিত ৪১ চরণের মদের প্রতীকী কবিতা(খামরিয়্যাহ) ও ৭৬১ চরণের সূফী তরীকার কবিতা(নাজমুস সুলূক) সূফী কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিরল সংযোজন। ইবনুল ফারিদ তাঁর কাঙ্খিত সুফীদর্শন গ্রহণ করার পর কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্তহন। তাঁর ইবাদত বন্দিগীর মধ্যে বহুমাত্রিক আধ্যাত্মিক চেতনা লক্ষণীয়। বহু বৎসর নির্জন উপাসনায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। মহান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির নৈপুণ্য অবলোকন করার তীব্র বাসনা তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। তিনি সূফী-দর্শন ও তত্ত্ব অন্বেষণে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করেন।[৩০]

কখনো কায়রোর পাহাড়-পর্বতে, কখনো মরুভূমির নির্জন প্রান্তরে, কখনো বনে-জঙ্গলে পশুদের সাথে অবস্থান করেছেন। তাঁর সময় মিসরে শুধু তিনিই সাড়ে সাতশত বছরের সূফী-কবির ভাগ্যাকাশ অলংকৃত করতে পেরেছেন। নোবেল বিজয়ী নাজীব মাহফুজসহ সমকালীন মিসরের কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁদের রচনায় এই সূফীকবির কবিতা তাঁদের লেখনিতে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি তাঁর অধ্যাত্মিক শিক্ষক মুহিউদ্দীন ইবনুল 'আরাবীর সর্বেশ্বরবাদী(وحدة الوجود) তথা "আল্লাহ সব কিছুতেই আছেন এবং সব কিছুই আল্লাহ" এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না; বরং ঐক্য সংযুক্তিরইত্তিহাদ(وحدة الشهود) তথা 'সব কিছুর মধ্যে আল্লাহকে দেখা' তত্ত্বটি তাঁর সূফীকাব্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো। ইবনুল ফারিদের বিরচিত কবিতাকে ইসলামী সূফীকাব্য(الشعر الصوفي), প্রেমকাব্য (غزل), নারীর প্রতীক(رمز المرأة), মদের প্রতীক(رمزالخمرة) এবং প্রকৃতির প্রতীক(رمز الطبيعة), লোকগীতি, ধাঁধাঁ (আল-আলগায) ইত্যাদি বারটি লক্ষ্যবস্তুতে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৩১]

ইবনুল ফারিদের রচিত ধাঁধাঁ(আল-আলগায) কতিার শৈল্পিকরূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে:[৩২]

"The most important technical features of poetics puzzlements(al-Algaz) of Ibn al-Farid goes through four axes: artistry construction, language and style, and rhythm, and artistic photography." কবি ইবনুল ফারিদ তাঁর

কবিতাসংকলন দীওয়ান ইবনুল ফারিদ ব্যতিত আর কোন গ্রন্থ, মাকালা বা প্রবন্ধ রচনাকরেননি। তাঁর রচিত দীওয়ান আরবী পদ্যসাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর কবিতার আলংকারিক ভাষা, তাত্ত্বিকরূপ, রচনা শৈলী, বিষয়বস্তু, শব্দচয়ন, প্রতীকী ও রহস্যাবৃত ভাবের সংযোজন অতি চমৎকার। তাঁর রচিত সূফী কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যুহ্দ তথা দুনিয়াবিমুখতা। কবি যুহদিয়াত কবিতা রচনা করতেন এবং ব্যক্তি জীবনে এর উপর অনুশীলনও করতেন। কবির দুনিয়া বিমুখ জীবন ছিল অনাড়ম্বর ও সাদাসিধে। আল্লাহ-প্রেম ছিলো তাঁর একমাত্র সূফীদর্শন। তাঁর রচিত কবিতায় পুনরাবৃত্তি, অস্পষ্টতা, বিচ্ছিন্নতা, শাব্দিক ও আর্থিক শিল্পরূপের আধিক্য পাওয়া গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাতে মননশীলতা ও রুচিশীলতার ছাপ রয়েছে। তবে তাতে পর্যাপ্ত রমযিয়্যাহ বা প্রতীকীর ব্যবহার দেখা যাচ্ছে।[৩৩]

কবি ইবনুল ফারিদ তাঁর কবিতাসংকলন দীওয়ান ইবনুল ফারিদ ব্যতিত আর কোন গ্রন্থ, মাকালা বা প্রবন্ধ রচনা করেননি। তাঁর রচিত দীওয়ান আরবী পদ্যসাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর কবিতার আলংকারিক ভাষা,, তাত্ত্বিকরূপ, রচনা শৈলী, বিষয়বস্তু, শব্দচয়ন, প্রতীকী ও রহস্যাবৃতভাবের সংযোজন অতি চমৎকার। তাঁর রচিত সূফী কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যুহ্দ(زهد) তথা দুনিয়াবিমুখতা। কবি যুহদিয়াত কবিতা রচনা করতেন এবং ব্যক্তি জীবনে এর উপর অনুশীলনও করতেন। কবির দুনিয়া বিমুখ জীবন ছিল অনাড়ম্বর ও সাদাসিধে। খোদাপ্রেমই ছিল তাঁর একমাত্র সূফীদর্শন। ইবনুল ফারিদের কবিতায় পুনরাবৃত্তি, অস্পষ্টতা, বিচ্ছিন্নতা, শাব্দিক ও আর্থিক শিল্পরূপের আধিক্য পাওয়া গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাতে মননশীলতা ও রুচিশীলতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। তবে তাতে পর্যাপ্ত রমযিয়্যাহ বা প্রতীকীর ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। যেমন: শৈল্পিকরূপ প্রদান করে কবি লোকগিতী, দু'পদী পালাক্রমী, রহস্যাবৃত ধাঁধাঁ ও প্রতীকী ব্যবহার করে কাব্য রচনা করেন। আরবী সূফী কবি ইবনুল ফারিদের স্থান ফার্সী সূফী কবি জালালুদ্দীন রূমীর(মৃ.৬৭২/১২৭৩) পর দ্বিতীয় স্থানে। ইবনুল ফারিদ হাকীকতে মুহাম্মদী ও মাকামাতে মুহাম্মাদীর মাধ্যমেই মহান আল্লাহকে চিনতে পেরেছেন।[৩৪]

'উমর ফর্‌রূখ বলেন:[৩৫]

"وَمَعَ أَنَ شِعْرَ ابنِ الفارضِ يَنُوء بضَعْفِ كَثِيرٍ مِنَ التكْرارِ والغمُوْضِ والتخلْخُلِ، ومِنَ الإِسْرَافِ فيْ الصِنَاعَة المعْنوِيةِ والصناعةِ اللفظيةِ، فإنهُ شِعْرٌ عَذبٌ أنيقٌ فيْ أكثرِ الأحْيَان والرمْزِ فيهِ غايةٌ فيْ البرَاعَةِ وحُسْنِ الإشارةِ."

শাওকী দায়ফ ইবনুল ফারিদের রচিত সূফী কাব্যে অনুসৃত প্রতীকী ব্যবহার সম্পর্কে বলেন:[৩৬]

"إنه لا يزال سارياً طوال الليل يبحث عن نار الذات الإلهية وقال إنه يتخذ النار رمزاً للمنازل علي عادة الشعراء الغزليين"

মহান আল্লাহ-প্রেমকে উপজীব্য করে ইবনুল ফারিদ নির্মাণ করেছেন কালজয়ী আরবী কাব্যমালা, যা বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনায় পরিগণিতহয়। তাঁর দীওয়ানের "তাইয়্যাহ কুবরা" কাসীদা-এর বেশ কয়েকজন পণ্ডিত, যেমন: সিরাজ হিন্দী হানাফী, শামস বিস্তামী মালিকী, জালাল কাযভীনী শাফি'ঈ, ফারগানী, কাশানী, কায়সারী প্রমুখ কর্তৃক বিভিন্নভাষায় ব্যাখ্য ও টীকা-টিপ্পনির কারণে আরব সূফীসাহিত্যাঙ্গণে ইবনুল ফারিদের মর্যাদা অনেকবৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর "খামরিয়্যাহ" কাসীদাটির ব্যাখ্যায় অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যাক্তি এগিয়ে এসেছেন। তাঁর দীওয়ানের উপর বিভিন্নভাষায় প্রচুর গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হিলমী "ইবনুল ফারিদ ওয়াল-হুব্বুল ইলাহী" শিরোনামে ও প্রফেসর ড. ফাদার জোসেফ স্কাতুলীন "ইবনুল ফারিদ শি'রুহুস-সূফী" শিরোনামে পিএইচ.ডি. গবেষণা পরিচালনা করেছেন।[৩৭]

ড. শাওকী দায়ফ ইবনুল ফারিদের কবিতা ও কাব্যগ্রন্থের মূল্যায়ন করে বলেন:[৩৮]

وديوانه كله من هذا الطراز انتشاءٌ وسكرٌ وحبٌ ووجدٌ وولهٌ والنياع

"তাঁর দীওয়ানের সবকটি কবিতা একই ধরণের নেশা, মাদকতা, ভালবাসা, প্রফুল্লতা, আকৃষ্টতা ও রকমারিতায় পরিপূর্ণ।"

ইবনুল ফারিদের রচনাশৈলী ও কাব্যালংকার বর্ণনা করে বলা হয়েছে:[৩৯]

"The poet's style is attractive and extremely stimulating. His easy flow of versification is unmistakeable; his playing with ideas and images, and his intelligent use of figures of speech to serve his meaning, and to reach his goal, shows his mastery of the Arabic language. It is equally conspicuous to assume that with the exception of 'The Khamriyya' and 'The Poem of the Way', the bulk of Ibn al-Farid's Diwan should be read simply as love poetry void of any mystical and spiritual overtones".

ইবনুল ফারিদের মর্যাদা ও তাঁর সূফী কবিতার শৈল্পিকমূল্যায়ন করে জর্জ নিকোলাস আরো বলেন:[৪০]

"Here, I think, lies one of the important points which contribute to the poet's fame and endurance, for he could, at the same time, satisfy both critics; those who recognize him purly as a mystical poet, and those who see him as a great love poet, perhaps the greatest 'Sultan al-Ashiqin'. No

two critics would disagree that 'The Odes' retain the form, conventions, topics, and images of ordinary love poetry. Ibn al-Farid's Diwan may well be considered 'a miracle of literary accomplishments' ".

ইবনুল ফারিদ গবেষক বিশিষ্ট প্রাচ্যভাষাবিদ, লেবানন-আমেরিকান কবি প্রফেসর ড. ফাদার জোসেফ স্কাতুলীন (জ.১৯৫২খ্রি.) তাঁর মিসরের আন্তর্জাতিক সেমিনারে উপস্থাপিত

عمر بن الفارض وحياته الصوفية من خلال قصيدته التئية الكبرى: دراسة تحليلية بلاعية

শিরোনামের প্রবন্ধে ইবনুল ফারিদের কবিতার স্টাইল ও তাঁর কাব্য প্রতিভা উল্লেখ কওের বলেন:[৪১]

"فنحن لا نعتقد أن ابن الفارض كان تلميذاً لإبن العربي أو تأثر به تأثراً مباشراً، ولكن أرجح احتمال عندنا أن كليهما استلهما أفكارهما من تراث صوفي سابق مشتؤك ومنتشر في الأوساط الصوفية في القرن السابع الهجري المقابل للقرن الثالث عشر الميردي. إلا أن كليهما صوغا ذلك التراث حسب معاناتهما السخصية وأسلوبهما الخاص. فبني ابن العربي صرحاً ضخماً من الأفكار والتأملات الفلسفية الصوفية في حين نظم ابن الفارض قصيدة فريدة نسج فيها بين عمق المعاناة الصوفية وروعة الأداء الفني."

ইবনুল ফারিদের সমকালীন মিসরের আয়্যুবী সুলতান কামিল একজন বিদ্বান ব্যক্তি ও কবি-সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর দরবারে বহু কবি ও সাত্যিকের সমাবেশ হতো। তাঁরা কবিতা ও সাহিত্যের যথাযথ আলোচনা ও পর্যালোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। একদিন সুলতান কামিল কবিদের উদ্দেশ্যে বললেন, "আরবী কবিতায় দ্বিতীয় পদের অন্তে 'ইয়া' এর ব্যবহার বড় কঠিন। আপনাদের মাঝে এমন কারো এরূপ কবিতা মুখস্ত থাকলে আবৃত্তি করুন।" এটা শুনে দরবারের লোকদের অনেকেই ঐরূপ কবিতা অবৃত্তি করলেন বটে কিন্তু কেউ দশটি শ্লোকের অধিক মুখস্ত বলতে পারলেননা। সুলতান কামিল সভা-কক্ষকে পুলকিত করে ঐরূপ পঞ্চাশটি কবিতা চরণ মুখস্ত শুনিয়ে দিলেন। পরক্ষণেই সুলতানের প্রাইভেট সেক্রেটারী কাযী শরফ বলে উঠেন,"আমি ঐরূপ দেড়শত শ্লোক মুখস্ত শোনাতে পারি। তা শুনে সুলতান তাঁকে কবিতা শোনাতে বললেন। কাযী শরফ এপর্যায়ে ইবনুল ফারিদের রচিত 'ইয়া' অন্ত্যমিলযুক্ত কবিতাগুলো শোনালেন। সুলতান বিস্ময়সহকারে বললেন, "জাহিলী ও ইসলামী উভয়যুগের কবিতাসমূহ আমার নোট বইতে রক্ষিত আছে। কিন্তু এমনটিতো আর কখনো শুনিনি"। তিনি কাযী শরফকে ঐকবিতাগুলো কার রচিত জিজ্ঞাসা করলে কাযী বলেন," মহান সুলতান! তিনি আপনার রাজ্যের একজন নাগরিক। প্রথমে কিছু দিন হিজাযে বাস করেছিলেন। বর্তমানে জামি'উল অযহারের পাশে বসবাস করছেন।" সুলতান আল-কামিল ইবনুল ফারিদের কাব্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁর ভক্তে পরিণত হন। তিনি কবির সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। প্রথমে তিনি

তাঁকে রাজদরবারে নিয়ে আসতে চাইলেন এবং এক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ উপঢৌকনের প্রস্তাব দিলেন। সূফী কবি সুলতানের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। পরে সুলতান নিজেই কবির দরবারে আগমন করতে চাইলেন, কিন্তু কবি তাতেও সম্মতি দেননি। তিনি কবির জন্য রাজকীয় নমুনায় মাযার নির্মাণ করে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। কবি এতেও সম্মতি দেননি। কবির দরবারে সর্বদা হাজারো মানুষের সমাগম হতো। তিনি তাদের কথা শুনতেন ও পরামর্শ দিতেন। তাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করতেন।[৪২]

ড. 'উমার ফুর্‌রূখ ইবনুল ফারিদের সূফী কবিতা রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে যথার্থ বলেছেন:[৪৩]

" وتدورُ أغراضُ ابن الفارض على الحب الإلهي الذي يقوم على الاتحاد، أي الاعتقاد بأن جميع مظاهر الوجود متساويةٌ في الشرف والقيمة لأنها في الحقيقة تمثلُ جوانبَ من الألوهية : إن البحر والجبل والإنسان والطير والمسجد والكنيسة وبيتَ الأصنام والنار كلها تمثلُ الألوهية في جانب دون جانب. فشاربُ الخمر في الحانة والمتعبد في بيت عبادته يفعلان فعلاً واحداً في مظهرين مختلفين.

ড. 'উমার ফুর্‌রূখ ইবনুল ফারিদেi সূফী কবিতা রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে আরো বলেছেন:[৪৪]

"والله يتبدي لكل محب في محبوبه: فإن مجنونَ ليلي قد أحب الله في صورة ليلى، كما أن ليلى قد أحبت الله في صورة قيس. وبما أن قيساً لم يحب الا الله لمَا أحب ليلى، وكما أن ليلى لم تحب إلا الله لما أحبتْ قيساً، فإن قساً قد أحب في الحقيقة".

ইবনুল ফারিদ ৬৩২/১২৩৪ সালে মিসরে ইন্তিকাল করেন তিনি জীবনের শেষ চারবছর মাতৃভূমি মিশরেই অবস্থান করে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনী বক্তৃতা করতেন। আধ্যাত্মিক জগতের এই রাজপুত্র ২রা জুমাদীল উলা, ৬৩২/১২৩৪ কায়রোতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর অন্তিম উপদেশ অনুযায়ী পরদিন কায়রোর মুকাত্তাম পাহাড়ের পাদদেশে 'আরীদ" নামক স্থানে তাঁর নির্মিত মসজিদের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। এখনও তাঁর মাযারে ভ্রমণকারীদের ভিড় লেগে আছে। তাঁর জানাযার নামাযে বিপুলসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মুসল্লী উপস্থিত ছিলেন।[৪৫]

ইবনুল ফারিদ তাঁর মৃত্যুতে তাঁর দৌহিত্র শায়খ 'আলী শোক গাঁথা রচনা করে বলেন:[৪৬]

جُزْ بالقرافة تحتَ ذيل العارض وقلِ السلامَ عليكَ يا ابن الفارض
أبرزتَ في نظم السلوك عجائبا وكشفتَ عن سر مصونٍ غامض
وشربتَ من بحر المحبة والولا فرويتَ من بحر محيط فائض

"তুমি আল-'আরিদ পাহাড়ের নীচে কবরস্থানে পরিতৃপ্ত হও এবং বল ওহে ইবনুল ফারিদ! তোমার প্রতি নিবেদিত; তুমি নাজমুস-সুলূক (তা'ইয়্যা কুবরা) কাসীদায় বিস্ময়কর বস্তু পেশ করেছ এবং সুরক্ষিত রহস্যময়গোপনীয়তা প্রকাশ করেছ; তুমি মহান আল্লাহ-প্রেম ও তাঁর বন্ধুত্বের সমুদ্র থেকে পান করেছ এবং তাঁর প্রশংসায়প্রবহমান বিশাল সমুদ্র থেকে পান করে পরিতৃপ্ত হয়েছ।"

পাদটীকা ও তথ্যনির্দেশিকা

১ আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী (কায়রো : দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, ১৩৬৯/১৯৫০), খ. ৪, পৃ. ১-১১২; আবদুল হক ফরীদী, "আবুল 'আতাহিয়্যঅ", সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা :ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রি.), খ. ২ ,পৃ. ১০৮-১২।

২ ড. শুকরী ফায়সাল, আবুল 'আতাহিয়্যা অশ'আরুহু ওয়া আখবারুহু (দামিশক: মাতবা'আতু জামি'আ দামিশক,
১৩৮৪/১৯৬৫), পৃ. ।

৩ আবুল 'আতাহিয়্যা, দীওয়ান, করম আল-বুস্তানী (বৈরূত: দারু বৈরূত, ১৪০৬/১৯৮৬), পৃ. ৪৮৮।

৪ ড. যকী মুবারক, আত-তাসাওউফুল ইসলামী ফিল আদব ওয়াল আখলাক (কায়রো : মু'আস সাসাতু হান্দাভী, ২০১২ খ্রি.),
পৃ. ৬৯-১১১

৫ ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৫৬-৮১; ফাদার জোসেফ স্কাতুলীন, "উমর ইবনুল ফারিদ ওয়া হায়াতুহুস সূফীয়্যা", আল-মাজমাউল 'ইলিমী আল-মিসরী, ১৯৯২খ্রি., পৃ. ১-৩৪।

৬ ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ. ৪৩-৫০।

৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৪২।

৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৫৪; ফাদার জোসেফ স্কাতুলীন, "উমর ইবনুল ফারিদ ওয়া হায়াতুহুস সূফীয়্যা", পৃ. ৫-৭।

৯ ফাদার জোসেফ স্কাতুলীন, "উমর ইবনুল ফারিদ ওয়া হায়াতুহুস সূফীয়্যা", পৃ. ১-৩৪।

১০ ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ. পৃ. ৪৬-৪৯।

১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮।

১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯।

14 Thomas Emil Homerin *Umar Ibn alFariḍ; Sufi Verse, Saintly Life* (New York : Paulist
Press, 2011 A D), pp. 23-50; Thomas Emil Homerin, From Arab Poet to Muslim Saint: Ibn al-Farid, His Shrine(Columbia: University of South Carolina Press,1994), PP. 38-58

১৫ ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ. ৪৬-৫২।

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৫।

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫।

১৮ ফাদার জোসেফ স্কাতুলীন, "উমর ইবনুল ফারিদ ওয়া হায়াতুহুস সূফীয়্যা", পৃ. ১-৩৪।

১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-৩৪।

২০ আবুল 'আলা আল-'আফীফী, আত-তাসাওফ আছ-ছাওরাতুল রুহিয়্যা ফিল ইসলাম বৈরূত: দারুশ শা'ব, ১৯৬৩ খ্রি.), পৃ.২১৯।

২১ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান পৃ. ১৬৯।

২২ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ১৬৯।

২৩ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ১৬৯।

২৪ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ১৫৮-৯।

২৫ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ১৫৯।

২৬ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ৬২।

২৭ 'উমর ফুর্‌রূখ, তারিখুল আদাবিল 'আরাবী বৈরূত: দারুল 'ইল লিল মালাদঈন, ১৩৯২/১৯৭২), খ. ৩, পৃ. ৫২১; ড. সোলায়মান ডেরীন, ফরম রাবি'আ টু ইবনুল ফারিদ (লন্ডন: লীডস ইউনিভার্সিটি, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ.২৫০-৯৯।

২৮ ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ. ৪৫-৪৯।

২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫৫।

৩০ ফাদার জোসেফ স্কাতুলীন, "উমর ইবনুল ফারিদ ওয়া হায়াতুহুস সূফীয়্যা", পৃ. ১-৩৪।

৩১ ড. 'উমর মূসা পাশা, আল-আদব ফী বিলাদিশ শাম(বৈরূত: দারুল ফিকর আল-মু'আসির, ১৪০৯/১৯৮৯), পৃ. ১৫৫-৬৫৬; মুহাম্মদ যাগলূল সাল্লাম, আল-আদব ফিল 'আসরিল আয়্যূবী (কায়রো: মানশা'আতুল ম"আরিফ, ১৯৬৭ খ্রি.),
পৃ.৩৩২-৪০০।

৩২ ড. 'উমর মূসা পাশা, আল-আদব ফী বিলাদিশ শাম, পৃ. ৫৯০-৬৪১।

৩৩ ফাদার জোসেফ স্কাতুলীন, "উমর ইবনুল ফারিদ ওয়া হায়াতুহুস সূফীয়্যা", পৃ. ১-৩৪।

৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৩৪।

৩৫ 'উমর ফুর্‌রূখ, তারিখুল আদাবিল 'আরাবী, খ. ৩, পৃ. ৫২১-২।

৩৬ ড. শাওকী দায়ফ, তারিখুল আদাবিল 'আরাবী (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৩৬০

৩৭ ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ. ৮২-১০২।

৩৮ ড. শাওকী দায়ফ, তারিখুল আদাবিল 'আরাবী, খ. ৭, পৃ. ৩৬০-১।

৩৯ প্রাগুক্ত।

৪০ George Nicholas El-Hage, "Ibn al-Farid's Khamriyy or Ode on Wine", The Journal of Arabe Language, Literature, Culture, Columbia University press,
Decemder 13, 2016.

৪১ ফাদার জোসেফ স্কাতুলীন, 'উমার ইবনুল ফারিদ ওয়া হায়াতুহুস সূফীয়্যা, পৃ. ৩৩।

৪২ ড. মুহাম্মদ মুস্তাফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ. ৩৯-৫৫।

৪৩ 'উমর ফুর্‌রূখ, তারিখুল আদাবিল 'আরাবী, খ. ৩, পৃ. ৫২১।

৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২১।

৪৫ ড. মুহাম্মদ মুস্তাফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ. ৫৩-৫৫।

৪৬ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান (কায়রো: মাকতাবাতুল কাহিরা, ১২৭০/১৯৫১), পৃ. ২; ড. মুহাম্মদ মুস্তাফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ. ৫৪।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আবুল আতাহিয়্যা ও ইবনুল ফারিদ বিরচিত যুহ্‌দ কবিতা : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা (Ascetic Poems of Abul Atahiyya and Ibnul Farid:A Comparative Analysis)

আবুল আতাহিয়্যা বিরচিত যুহ্‌দ কবিতা ও তাঁর কাব্যপ্রতিভা

আবুল আতাহিয়্যা জন্মগতভাবেই স্বাভাবিক কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর কাব্যে অভিনবত্বের স্বাদ পরিলক্ষিত হয়। সহজ-সরল স্বাভাবিক লিখনভঙ্গি হ্রস্ব ছন্দ এবং উচ্চতর দার্শনিক ভাবধারা তাঁর কাব্যে লক্ষ্যণীয়। তাঁর কাব্যে ছিল এক মোহনীয় আকর্ষণ। নিরক্ষর বেদুঈন থেকে উচ্চ শিক্ষিত বিদগ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি পর্যন্ত তাঁর কবিতা আবৃত্তি করে থাকে। পৃথিবীর যে প্রান্তেই আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চা আছে সেখানেই আবুল আতাহিয়্যার কবিতা পঠিত ও সমাদৃত হয়ে থাকে। আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে সর্ব প্রথম তিনিই প্রমাণ করেছেন, কাব্যের সৌন্দর্যহানী না করেও অতি সহজ ও সাধারণ ভাষা ব্যবহার করে অসাধারণ সব কবিতা রচনা করা যায়। 'ভন ক্রেমার (von kremer) -এর মতে আবু নুওয়াস অপেক্ষা আবুল 'আতাহিয়্যার কাব্য-প্রতিভা ছিল অধিকতর উঁচু মানের।[১]

কবির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিলনা। ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচীন কাব্য সম্পর্কে তিনি পাঠ নিতে পারেননি। তথাপি তাঁর কবিতার মান সমসাময়িক কবিদের কবিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিল। ছন্দ মেলানোর জন্য তিনি দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করতেন না। প্রাচীন নিয়ম-কানুনের বন্ধন মুক্ত অনাবিল স্রোতের ন্যায় সহজগামী কবিতা জাতিকে তিনি উপহার দেন। এ জন্য তাঁর রচনা অনায়াসেই বেছে নেওয়া যায়। অনাবিল ভাবধারা ও সহজ-সরল ভাষা দ্বারাই তার পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। আরবী ছন্দ শাস্ত্র উপেক্ষা করে তিনি বহু কাব্য রচনা করেছেন কিন্তু এগুলো কাব্য হিসেবে অপূর্ব হিসেবেই পরিগণিত। এ কথা তাঁর কঠোর সমালোচকরাও স্বীকার করে নিয়েছেন। ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁর এতো দখল ছিল যে, তিনি অনর্গল পদ্যে কথা বলতে পারতেন। এমন হঠাৎ রচিত কিছু কবিতা আছে, যা তাঁর অন্যান্য রচনার মতোই মান সম্পন্ন। তিনি বলতেন, ইচ্ছা করলে তিনি সর্বদা পদ্যে কথা বলতে পারেন। আবুল আতাহিয়্যা এমন এক কাব্য প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন যা নানাবিধ প্রতিকূলতায় হার মানেনি। দারিদ্র্য আর শিক্ষার অভাব তার প্রতিভাকে ধ্বংস করতে পারেনি। অস্বচ্ছল ও নিচু শ্রেণির বংশীয় পরিচয় তাঁর কাব্য প্রতিভাকে আরো শানিত ও বিকশিত করেছিলো। তিনি ছিলেন প্রথাভাঙ্গা সাহসী কবি। কবিতা রচনার জন্য তিনি ছন্দের কাছে যাননি। ছন্দই তাঁর কাছে এসেছে।[২]

আবহমান কাল ধরে আরবী কবিতায় আলোচিত মরুভূমির বাগাড়ম্বরকে সম্পূর্ণ পরিহার করে নাগরিক সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যশীল কাব্য তিনি জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভা এতো বিভাময় ছিল যে, সমকালীন কাব্যের বিষয়বস্তু তিনি পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। যুহদ কবিতার মতো অজনপ্রিয় কবিতা লিখে

তিনি খ্যাতিমান হয়ে উঠেন। যুহদ কবিতায় তাঁর সফলতা দেখে সমকালীন অন্যান্য কবিও এ জাতীয় কাব্য রচনায় এগিয়ে আসেন। এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে আবু নুওয়াসের নাম প্রণিধানযোগ্য।[৩]

আবুল 'আতাহিয়্যার কবিতার বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনান্তে তাঁর কাব্য প্রতিভার বিষয়টি তাঁর কবিতার ভাষা, গঠনবিন্যাস ও প্রকাশভঙ্গিতে নিম্নলিখিতভাবে ফুটে উঠবে:[৪]

১. আবুল 'আতাহিয়্যার যুগে তাঁর রচিত কবিতার ভাষা, গঠনবিন্যাস, প্রকাশভঙ্গি ও বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ কৃত্রিমতামুক্ত ছিলো। তাঁর রচিত যুহ্দ কবিতা একটি সার্বজনীন কাব্যিক অবদান হিসাবে পরিগণিত হয়।

২. তাঁর রচিত কবিতায় প্রাকৃতিক শহুরে জীবনের আধুনিক ছাপ না থাকলেও সে সময়কার প্রাচীন কবিতার যাযাবর রীতিতে সদাসর্বদা তিনি যুহ্দ কাব্য রচনা করতেন।

৩. অবুল 'আতাহিয়্যাহ প্রথম সারির এমন একজন কবি ছিলেন যিনি সম্পূর্ণ শোকগাঁথা ও প্রাচীন কাসীদার মডেলে যুহ্দ কবিতা রচনা করেছেন।

৪. তিনি আরবী যুহ্দ কবিতায় বহুল ছন্দ ও মাত্রা ব্যবহারে ও সঙ্গীতবিষয়ক কবিতা রচনায়, বাগ্মিতা বাকপটুতায় অধিক সিদ্ধ হস্ত ছিলেন।

৫. তিনি আরব কবিদের প্রথম সারির একজন দার্শনিক কবি হিসাবেও বিবেচিত ছিলেন।

৬. তাঁর রচিত অধিকাংশ কবিতা সাধারণ ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন, নৈরাশ্যতা ও নৈতীকতার আঁধারে পরিপূর্ণ ছিলো।

৭. একজন উৎপথগামী কবির রচিত কবিতা হিসাবে আবুল 'আতাহিয়্যাহর রচিত কবিতায় জোরালোভাবে না হলেও কিছুটা এরকম সন্দেহের অবতার রয়েছে।

৮. আবুল 'আতাহিয়্যা ছিলেন স্বভাবজাত যুহ্দ কবি। বিশিষ্টতার এই গুণের কারণে তাঁর রচনা ছিল প্রচুর। সেই শিশুকাল থেকে আমৃত্যু ধারাবাহিকভাবে তিনি সবধরণের কাব্য রচনা করে গিয়েছেন।

৯. তিনি অনেক সময় মুখে মুখে কবিতা রচনা করতেন। তাঁর রচিত যুহ্দ কবিতার পরিমাণ এতো বেশী ছিলো যে, তার পূর্ণসংরক্ষণ বা সংকলন সম্ভব হয়নি।

১০. তবে, স্পেনের খ্যাতিমান মুসলিম মুহাদ্দিছ ও ধর্মতত্ত্ববিদ ইবন 'আবদিল বার্র (রহ.) আবুল 'আতাহিয়্যার যুহ্দ বিষয়ক (زهديات) কবিতা সমূহের একটি সংকলন তৈরি করেছেন। আর, আবুল 'আতাহিয়্যার বন্ধু ইব্রাহীম আল-মাওসিলী তাঁর বহু যুহ্দ কবিতার সুরারোপ করেছেন। এগুলো 'ইরাকের বহু শহর ও গ্রামে আঞ্চলিক গানরূপে গাওয়া হয়েছে। ১৮৮৬খ্রি. লেবাননের রাজধানী বৈরুতের ক্যাথলিক প্রেস থেকে الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهيه শিরোনামে তাঁর যুহ্দ কবিতার একটি মূল্যবান সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।[৫]

১০. সর্ব প্রথম ব্যক্তি পর্যায়ে কবি আবুল 'আতহিয়্যার রচিত যুহ্দকাব্য নিয়ে গবেষণা কর্ম পরিচালনা করেন স্বানামধন্য গবেষক ড. শুকরী ফয়সল। তিনি দামেশকের জাহিরিয়া লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত সপ্তম হিজরীতে সংকলিত একটি কপি এবং জার্মানীর তুবানজচান লাইব্রেরীতে অপর একটি সংকলন কপিকে গবেষণার উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অতঃপর হি.১৩৮৪/খ্রি. ১৯৬৫ সালে ابو العتاهية : اشعاره و اخباره শিরোনামে তাঁর গবেষণা কর্মটি দামেশক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এতে তিনি ৫৫০০ (পাঁচ হাজার পাঁচশত) কবিতার পঙক্তি সংকলন ও পরিমার্জন করেন। তিনি তাঁর গবেষণাকর্মে খ্রিষ্টানদের বিকৃতির করণ বিষয়েও বিশদ আলোকপাত করেছেন। উল্লেখ্য, এর পূর্বে দামেশকের দারুল মু'আল্লা থেকে তারিখ বিহীন এ গবেষণা কর্মটি প্রকাশিত হয়েছে।[৬]

১১. আবুল 'আতাহিয়্যা ছিলেন প্রকৃতির কবি। জন্মগতভাবেই তিনি স্বাভাবিক কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর কাব্যে অভিনবত্ব ও আধুনিকতার ছাপ ও স্বাদ পরিলক্ষিত হচ্ছে। সহজ-সরল স্বাভাবিক লিখনভঙ্গি হ্রস্ব- ছন্দ এবং উচ্চতর দার্শনিক ভাবধারা তাঁর কাব্যে ব্যাপক হারে লক্ষ্যণীয়।

১২. তাঁর কাব্যে ছিল এক মোহনীয় আকর্ষণ। নিরক্ষর বেদুঈন থেকে উচ্চ শিক্ষিত বিদগ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি পর্যন্ত তাঁর কবিতা আবৃত্তি করে থাকেন।

১৩. পৃথিবীর যে প্রান্তেই আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চা আছে সেখানেই আবুল 'আতাহিয়্যার কবিতা পঠিত ও সমাদৃত হয়ে থাকে।

১৪. আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে সর্ব প্রথম তিনিই প্রমাণ করেছেন যে, কাব্যের সৌন্দর্যহানী না করেও অতি সহজ ও সাধারণ ভাষা ব্যবহার করে অসাধারণ সব কবিতা রচনা করা যায়। 'ভন ক্রেমার (ড়হ শৎবসবৎ)-এর মতে আবু নুওয়াস অপেক্ষা আবুল আতাহিয়্যার কাব্য-প্রতিভা ছিল অধিক উঁচু মানের।

১৫. কবির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিলোনা। ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচীন কাব্য সম্পর্কে তিনি পাঠ নিতে পারেননি। তথাপি তাঁর কবিতার মান সমসাময়িক কবিদের কবিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিলো।

১৬. ছন্দ ও মাত্রা মেলানোর জন্য তিনি কখনো দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করতেন না। প্রাচীন নিয়ম-কানুনের বন্ধন মুক্ত অনাবিল স্রোতের ন্যায় সহজগামী যুহ্দ কবিতা তিনি তাঁর জাতিকে উপহার দিয়েছেন।

১৭. আবুল আতহিয়্যা তাঁর অনন্যসাধারণ কাব্যপ্রতিভা যথাযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে আরবী সাহিত্যে এমন এক স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন যা তাঁর জন্যই সংরক্ষিত ছিল। সহজ-সরল-স্বাভাবিক লিখন ভঙ্গি ও বিষয়বস্তু নির্বাচনের গভীর চিন্তন শক্তি তাঁকে আলোচ্য মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে।

১৮. ফারসী সাহিত্যের কবি শেখ সাদীর যে স্থান আরবী সাহিত্যে আবুল আতহিয়্যারও সেই স্থান।

১৯. আবুল আতাহিয়্যা আরবী যুহ্দ কাব্যসাহিত্যের প্রথম দার্শনিক কবি। কিন্তু দার্শিনিক ভাবাপন্ন হলেও তাঁর কাব্যে ইসলামী ভাবধারার মতাদর্শ ও ধর্মনিষ্ঠা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ ছিলোনা। কাজেই তাঁর রচিত যুহ্দ কাব্য সহজেই মুসলিম হৃদয় স্পর্শ করে ছিলো।

২০. আধুনিক যুগের জনৈক কাব্য সংকলক বলেন:[৭]

"কাব্যের মনোরঞ্জন ও চিত্তবিনোদনশক্তি উপলব্দি করে আমি কয়েকটি উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে মনস্থির করি। এ জন্য আমি অনেকগুলো দীওয়ান অধ্যয়ন করি। কিন্তু বিশুদ্ধ আরবীভাবধারা, মার্জিত রুচি, সরল ভাষা ও মধুর ছন্দের দিক বিচারে আবুল 'আতাহিয়ার দিওয়ানই আমার নিকট শ্রেষ্ঠতম মনে হয়েছে"।

২১. প্রকৃত কাব্যরীতি সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকেনা। বরং তা প্রশস্ত, উচ্চ ও মহত্তর গন্ডি পের হয়ে থাকে। এটা মানব জীবন ও দৈনন্দিন সত্যসমূহের মনোরম অভিব্যক্তি, মানুষের ভাব-চিন্তা, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার একটি সুন্দর বিকাশ মাত্র।

২২. মানব জাতির গহীন অনুভূতি কবির কাব্যছন্দে ও মাত্রায় মূর্ত হয়ে ধরা দেয়। তাদের হাঁসি-কান্না, সুখ-দুঃখের ইতিহাস তাঁর যুহ্দ কাব্যঝংকারে বাঁশিরসুরের ন্যায় গুঞ্জরিয়ে উঠে। একষ্টি পাথরে যদি আমরা আবুল আতাহিয়্যার যুহ্দকাব্য বিচার করি তা হলে আমাদেরকে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হবে যে, তিনি একজন উচ্চ শ্রেণির কবি। আরব-আজমে তাঁকে যে সমাদর ও সম্মান দেয়া হয়েছে তিনি তার প্রকৃত অধিকারী।

২৩. সমকালীন কবিগণ আবুল আতাহিয়্যার কাব্যপ্রতিভা ও তাঁদের মাঝে তাঁর অবস্থান মূল্যায়ন করে হারুন ইবন সাদান বলেন:[৮]

"একদা আমি প্রখ্যাত কবি আবু নুওয়াসের সঙ্গে কবিতা আবৃত্তির একটি আসরে উপস্থিত ছিলাম। তিনি (আবু নুওয়াস) সে আসরে কবিতা আবৃত্তি করলেন। এ আসরে উপস্থিত জনৈক স্রোতা তাঁকে প্রশ্ন করলো:[৯]
আপনি কি এ যুগের সবচেয়ে বড় কবি?"

উত্তরে তিনি বলেন:[১০]

"বৃদ্ধ আবুল আতাহিয়্যা জীবিত থাকতে আমি বড় কবি নই।"

আবু নুওয়াস তাঁকে অনেক সম্মান করতেন এবং বলতেন:[১১]

واللـه مـا رائيتـه قط إلاظننت أنـه سمـاء و أنـا أرض

"আল্লাহর কসম! আমি যখন তাঁকে দেখি, আমার ধারণা তিনি আকাশ আর আমি জমিন"।

২৪. জা'ফর ইব্ন ইয়াহইয়া ও প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ আল-ফাররা বলেন:[১২]

"সমকালীন কবিদের মধ্যে আবুল আতাহিয়্যা সবচেয়ে বড় কবি।"

২৫. স্বনামধন্য কবি দা'উদ ইব্‌ন রাযীনকে এ বলে জিজ্ঞাসা করা হলো, এ সময়ের বড় কবি কে? তিনি বলেন, আবু নুওয়াস। অতঃপর তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, আবুল 'আতাহিয়্যা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী? তিনি বলেন:[১৩] 'আবুল 'আতাহিয়্যা জীন ও ইনসানের মধ্যে বড় কবি।''

২৬. মূসা ইব্‌ন সাকিল বলেন, একদিন আমি আবুল 'আতহিয়্যার সমসাময়িক কবি সিলমুল-খাসির -এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে বললাম, তাঁর নিজের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে। তিনি বললেন, 'তা নয় বরং আজ তোমাকে জিন ও মানুষের বড় কবির কবিতা শোনাবো। অতপর তিনি আবুল 'আতহিয়্যার কবিতা শুনালেন।

২৭. অন্য এক বর্ণনা মতে ইব্‌ন মাসলামা বলেন, আমি সিলমুল খাসিরের নিকট সবচেয়ে বড় কবির কবিতা শুনতে চাইলে তিনি বললেন:[১৪]

"আমি তোমাকে জীন-ইনসানের মধ্যে বড় কবির কবিতা শোনাব। অতঃপর তিনি আবুল আতাহিয়া রচিত কবিতা "কোনো আনন্দ স্থায়ী নয় এবং কোন দুঃখও স্থায়ী নয়" শিরোনামের নিম্নের কবিতাটি শুনালেন:[১৫]

سكــنٌ يـبْـقَـي لـه سكـنُ   مـا بـهـذا يُـؤذنُ الـزمـنُ!

نـحـْنُ فـيْ دار يخـبـرنــا،   عـن بـلاهـا، نــاطـق لسن

"একটি বসবাসের জন্য নিরবতার বহাল রয়েছে। কালের গতির একোন ধরণের আহ্বান! আমরা এমন একটি ঘরে বাস করছি যার দুর্যোগ সম্পর্কে একজন বাগ্মী ব্যক্তি প্রতি নিয়ত আমাদেরকে সতর্ক বাণী প্রদান করছে"।

২৮. আহমাদ ইব্‌ন যুহায়র বলেন:[১৬]

"আমি মুস'আব ইব্‌ন 'আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি আবুল 'আতাহিয়্যা হলেন মানব জাতির শ্রেষ্ঠ কবি, আমি বললাম কী জন্য তিনি আপনার নিকট এমন মর্যাদার অধিকারী হলেন? তিনি "লোভের পর লোভ করা" সম্পর্কিত তাঁর কবিতটি শুনিয়ে বললেন, 'কবির রচিত নিম্নের এ কবিতাটির জন্য':[১৭]

تـمَـسكْـتُ بـــآمــالٍ   طـوالٍ، بـعـد آمـالٍ
وأقـبـلـتُ عـلـي الـدنـيـا،   بــعـزمٍ، أيَ إقـبـــالٍ

"প্রত্যাশার পর দীর্ঘ প্রত্যাশাসমূহকে আমি ধরে রেখেছি এবং পৃথিবীর যে কোন অবস্থার দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করেছি"।

মুস'আব বললেন, 'এগুলো সঠিক, সহজবোধ্য বাক্য। এতে বাড়তি-কমতি কিছুই নেই। বুদ্ধিমান তা জানে এবং অজ্ঞও তার স্বীকৃতি দেয়'।

২৯. এ ছাড়া আরো অনেক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কবি আবুল 'আতাহিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন। এদের মধ্যে ভাষাবিদ ও ব্যাকরণবিদ আসমা'ঈর নাম প্রনিধানযোগ্য।

৩০. আবুল ‘আতাহিয়্যার প্রেম ও ভালোবাসা ছিল খাঁটি–অকৃত্রিম, কিন্তু তিনি কাঙ্খিত প্রেয়সীকে নিজের করে পাননি। না পাওয়ার যন্ত্রণায় দগ্ধ কবি এক সময় দুনিয়া সম্পর্কেই হতাশ হয়ে পড়েন। কালক্রমে তিনি হয়ে উঠেন দুনিয়া বিমুখ মরমী কবি। এই ব্যর্থ প্রেমই কবির জীবনে বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করে। ফলে, তিনি সংসার বিরাগী সূফীবাদ এবং নৈতিকতা (زهديات) এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি তৎকালীন দরবারী ও অভিজাত শ্রেণীর ভোগ বিলাস, দুর্নীতি ও ধর্মের প্রতি উদাসিনতায় উত্যক্ত ও বিরক্ত হয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। তখন তাঁর কাব্য-প্রতিভা নতুন খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। ধর্ম নিষ্ঠা, পার্থিব জীবনের অসারতা, পরকালের জন্য পূণ্য সঞ্চয় ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর রচিত যুহ্দকাব্য এত অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, তিনি একাগ্রচিত্তে যুহ্দ প্রকার কবিতাই রচনা করে সর্বত্র সুখ্যাতি অর্জন করেন।[১৮]

৩১. কবির নারীর প্রতি প্রেম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও তিনি সংসার বিমুখ হননি। তিনি বাগদাদের জনৈক নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সংসার আলো করে তাঁর চারটি সন্তানও এসেছিল। এর মধ্যে তিনমেয়ে আর দুইজন ছেলে। মেয়েদের নাম ছিল যথাক্রমে, লিল্লাহ, বিল্লাহ ও রুকায়্যা। খলীফা মাহদীর পুত্র মানসুর লিল্লাহ কে বিয়ের প্রস্তাব দিলে কবি তা প্রত্যাখ্যান করেন। কবির পুত্রদ্বয়ের নাম ছিল যায়দ ও মুহাম্মদ। মুহাম্মও কবি ছিলেন।নসীহতপূর্ণ কবিতায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁর রচিত কবিতার নমুনা নিম্নরূপ:[১৯]

قَدْ افلحَ السالمُ الصموتُ كلامُ راعِي الكلامِ قُوتُ
جَوابُ ما يكْرهُ السُكُوتُ ما كل نطقٍ لهُ جَوابٌ

“সফলতা লাভ করেছে নিরাপদে চুপ থাকা ব্যক্তি, কথার রক্ষক হলো কম কথা বলা। প্রত্যেক কথারই উত্তর - হয়। অপছন্দনীয় কথার জবাব হলো চুপ থাকা।

কবি সংংসার জীবনে সুখী ছিলেন। স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে তিনি সুখেশান্তিতে ও নিরাপদে জীবন যাপন করেছেন।

৩২. একদা রূমসম্রাটের একজন ‘আরবী বিশেষজ্ঞ দূত খলীফা হারুনুর রশীদের দরবারে আগমন করে কবি আবুল ‘আতাহিয়্যা রচিত কিছু কবিতা সম্পর্কে জানতে পারলেন। অতপর দূত থেকে জেনে রূমসম্রাট তাঁর দরবারের ফটকে আবুল ‘আতাহিয়্যা রচিত নিম্মের দুটো কবিতা চরণ লেখার আদেশ দিলেন:[২০]

مَا اختلفَ الليْلُ والنهَارُ ولا دارتْ نُجُومُ السمَاءِ فيْ الفلَكِ
إلا لنقلِ السلطَانِ عنْ مَلِكٍ قدِ انْقضَى مُلْكُهُ إلى مَلِكِ

“দিন ও রাতের পরিবর্তন এবং আকাশের ভাসমান নক্ষত্ররাযির পরিবর্তন শুধু একজন বাদশাহর থেকে ক্ষমতার পরিবর্তন, যার ক্ষমতা শেষ হয়ে অন্য বাদশাহর কাছে এই ক্ষমতা চলে যায়”।

‘আব্বাসী যুগের অন্যতম কবিবৃন্দ হলেন– আব্বাস ইবন আহনায, ইবনুদ দুমায়না, বাশ্শার ইব্ন বুরদ, ও ‘উয়ায়না আল-মুহাল্লাবী। তাঁরাও নারীর প্রেমে পড়েছেন এবং প্রেমিকাকে নিয়ে অসাধারণ সব কবিতাও

লিখেছেন। তাঁদের প্রেমিকারা যথাক্রমে ফাওয, উমায়মা, আবদা ও ফাতিমা যাদের নাম উঠে এসেছে তাঁদের রচিত সেসব কবিতায়। ফারসী সাহিত্যের অমর কবি হাফিজ সিরাজী শাশ্বত প্রেমের আরেক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। পাইরিয়ার প্রেম তাঁকে সংগ্রামী সাধক হিসেবে তৈরি করেছিল।

৩৩. আমাদের উদ্দীষ্ট কবি আবুল 'আতাহিয়্যা প্রথম জীবনে সু'দা নামক এক নারীর প্রেমে পড়ে ব্যর্থপ্রেমিক হয়েছেন। পরে 'উতবা নামের যে নারীর প্রেমে পড়েছিলেন সে নারী স্বাধীন রমণী ছিলেন না। তিনি ছিলেন খলীফা মাহদীর এক দাসী। রাজকীয় এ দাসী ছিলেন পরমা সুন্দরী। কবি প্রথম দেখাতেই তার প্রেমে পড়ে যান। দাসী 'উতবা'র প্রশংসায় আবুল 'আতাহিয়্যা প্রেমের কবিতা লিখতে থাকেন। কেউ কেউ বলেন, 'উতবা ছিল কবির চাচাতো ভাই রায়তারের দাসী। এ তথ্য সঠিক নয় বলে প্রতীয়মান হয়।[২১]

৩৪. 'উতবার প্রতি আবুল আতাহিয়্যার আকর্ষণ সম্পর্কে খলীফা ওয়াকিপহাল ছিলেন। এমনকি 'উতবাকে কবির নিকট অর্পণের সিদ্ধান্তও তিনি নিয়েছিলেন। কিন্তু 'উতবা' তাঁর প্রতি কোন আগ্রহ দেখাননি। কপর্দকহীন কবিকে গ্রহণ করার মানসিক অবস্থা দাসীর ছিল না। এর কারণ হচ্ছে, প্রেমটা ছিলো এক তরফা। কবিই শুধু ভালোবাসতেন, দ্বিতীয় পক্ষের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়নি। 'উতবার প্রত্যাখ্যান কবি সইতে পারেননি। আমৃত্যু 'উতবার বিরহের যন্ত্রণায় তিনি দগ্ধ হয়েছেন। তাঁর ব্যাথাতুর হৃদয় থেকে বেরিয়ে এসেছে অকৃত্রিম প্রেমের পঙক্তিমালা, যা তাঁর রচিত কবিতা সংকলনের পরতে পরতে দৃশ্যমান।

৩৪. খলীফা মাহদী বিপুল অর্থ-সম্পদ কবিকে হাদিয়া দেন– যাতে তিনি উতবার কথা ভুলে যান। কিন্তু কবির হৃদয়ের গহীনে উতবা সুদৃঢ় স্থান করে নিয়েছিলেন; তাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাঁকে ভুলতে পারেন নি। খলীফার প্রশংসামূলক কবিতাতেও উতবার কথা স্মরণ করতে তিনি ভুলতেন না।

৩৫. খলীফা হারুনুর রশীদ কবিতা আবৃত্তি অস্বীকারের দরুন কবিকে জেলখানায় বন্দী করে রাখেন। অতঃপর কবি যখন কবিতা আবৃত্তি করার অঙ্গীকার করেন তখন তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। অতঃপর তাঁকে খলীফার নিকট নিয়ে গেলে তিনি তাঁকে কবিতা আবৃত্তি করতে বলেন। কবি তার প্রেয়সী উতবার গুণগান করে এবং তার প্রতি কবির ভালবাসা স্মরণ করে একটি অনবৈধ্য কবিতা রচনা করে কবি নিম্মলিখিত কবিতাটি আবৃত্তি করেন:[২২]

يا عتب سيدتي أمالك دين؟ حتي متي قلبي لديك رهين

وأنا الذلول لكل ما حملتني؛ وأنا الشقى البأس المسكين

খলীফা তাঁর এ কবিতায় মুগ্ধ হয়ে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম পুরস্কার প্রদান করেন।

৩৬. কবির সহজ-সাবলীল এসব গযল অনায়াসে শ্রোতাদের আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। ফলে প্রথম জীবনে তিনি গযলের কবি হিসেবে বিখ্যাত হয়ে উঠেন। উতবার প্রেমে দগ্ধ কবি তাকে না পাওয়ার বেদনায় অসহ্য

যন্ত্রণায় দিনাতিপাত করছেন। কবি মনে করেন তাঁর এই দহনজ্বালা অবলোকন করে বনের পশু-পাখি, জ্বীন-ইনসান সকলেই অশ্রু ঝরায়।[২৩]

এ সম্পর্কে কবি বলেন:[২৪]

يا عتب من لم يبك لي مما لقيت من الشقاء
بكت الوحوش لرحمتي والطير في جوالسماء

একই বিষয়ে কবি কবিতা রচনা করে আরো বলেন:[২৫]

والجن عمار البيو ت بكوا وسكان الفضاء
والناس فضلا عنهم لم تبك الا بالدماء

আমরা কবি আবুল 'আতাহিয়্যার ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি তাঁর বিশাল কাব্যভান্ডারে লক্ষ্য করেছি। এর পরিমাণ এতো বেশি যে তাঁকে কোনভাবেই ধর্ম বিষয়ে উন্নাসিক ভাবতে পারি না। আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই কবি আবুল আতাহিয়্যা ছিলেন ইসলামী ভাবধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। কবি আবুল আতাহিয়্যা গণমানুষের কবি ছিলেন। খলীফার দরবারে থেকেও তিনি সাধারণ মানুষের কাতারে ছিলেন। দরবারী কবির বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে ছিল না, বরং তাঁর কাব্যে ভোগ-বিলাসের বিপরীত বক্তব্যই পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে গযল কবিতা লিখে তিনি পারদর্শীতা অর্জন করলেও শেষ বয়সে যুহদিয়াতই ছিল তাঁর মূল অবস্থান। কবির কবিতাই তাঁর স্বভাব, প্রকৃতি বা চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে সমকালীন মুসলিম আরব সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফীসাধক হিসেবেই পেয়েছি। উন্নত নৈতিক চরিত্র তাঁর ব্যক্তিত্বকে সুমহান করে তুলেছিল। এ জন্য তিনি আজও দুনিয়া বিমুখ সুফী সাধক কবি হিসেবেই পরিচিত।[২৬]

৩৭. কবি আবুল আতাহিয়্যা গণমানুষের কবি ছিলেন। খলীফার দরবারে থেকেও তিনি সাধারণ মানুষের কাতারে ছিলেন। দরবারী কবির বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে ছিল না বরং তাঁর কাব্যে ভোগ বিলাসের বিপরীত বক্তব্যই পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে গযল কবিতা লিখে পারদর্শীতা অর্জন করলেও শেষ বয়সে যুহদিয়াতই ছিল মূল স্থান। কবির কবিতাই তাঁর স্বভাব, প্রকৃতি বা চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে সমকালীন সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফীসাধক হিসেবেই পেয়েছি। উন্নত নৈতিক চরিত্র তাঁর ব্যক্তিত্বকে সুমহান করে তুলেছিল। এ জন্য তিনি আজও দুনিয়া বিমুখ সুফী বুজুর্গ হিসেবেই পরিচিত। আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে সর্ব প্রথম তিনিই প্রমাণ করেছেন, কাব্যের সৌন্দর্যহানী না করেও অতি সহজ ও সাধারণ ভাষা ব্যবহার করে অসাধারণ সব কবিতা রচনা করা যায়। আরবী ছন্দ শাস্ত্র উপেক্ষা করে তিনি বহু কাব্য রচনা করেছেন কিন্তু এগুলো কাব্য হিসেবে অপূর্ব হিসেবেই পরিগণিত। এ কথা তাঁর কঠোর সমালোচকরাও স্বীকার করে নিয়েছেন। ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁর এতো দখল ছিল যে, তিনি অনর্গল পদ্যে কথা বলতে পারতেন। এমন হঠাৎ রচিত কিছু কবিতা আছে, যা তাঁর অন্যান্য রচনার মতোই মান সম্পন্ন। তিনি বলতেন, ইচ্ছা করলে তিনি

সর্বদা পদ্যে কথা বলতে পারেন। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "আপনি ছন্দশাস্ত্র জানেন কি? জবাবে কবি বলেন:[২৭]

أنـا اكـبـر مـن الـعـروض

"আমি সকল ছন্দের উর্ধ্বে"।

আবুল 'আতাহিয়্যা এমন এক কবির প্রতিভা নিয়ে জন্মে ছিলেন যা নানাবিধ প্রতিকূলতায় হার মানেনি। দারিদ্র্য আর শিক্ষার অভাব তার প্রতিভাকে ম্লান করতে পারেনি। অস্বচ্ছল ও নিচু শ্রেণির বংশীয় পরিচয় তাঁর কাব্য প্রতিভাকে আরো শানিত ও বিকশিত করে ছিলো। তিনি ছিলেন প্রথাবিরোধি সাহসী কবি। কবিতা রচনার জন্য তিনি ছন্দ ও মাত্রার আশ্রয়ে যাননি। ছন্দই তাঁর কাছে আশ্রয় নিয়েছে। আবহমান কাল ধরে আরবী কবিতায় আলোচিত মরুভূমির বাগাড়ম্বরকে সম্পূর্ণ পরিহার করে নাগরিক সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যশীল এক অপূর্ব কাব্যমালা তিনি বিশ্ব মানবজাতিকে উপহার দিয়েছেন। তাঁর কাব্যপ্রতিভা এতো বিভাময় ছিল যে, সমকালীন কাব্যের বিষয়বস্তু তিনি পরিবর্তন করে তাতে নবরূপের পোশাক পরিয়েছেন। যুহদ কবিতার মতো জনপ্রিয়তাহীন অসধারণ কবিতা রচনা করে তিনি বিশ্বের দরবারে খ্যাতির আসন অলংকৃত করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর সফলতা দেখে সমকালীন অন্যান্য কবিও এগিয়ে আসেন। সর্বাগ্রে আবু নুওয়াসের নাম প্রণিধানযোগ্য।[২৮]

৩৭. অনেক সময় মুখে মুখে কবি অনেক কবিতা রচনা করেছেন যা কেউ সংরক্ষণ করতে পারেনি। তাঁর বন্ধু ইব্রাহীম আল-মাওসিলী তাঁর অনেক কবিতায় সুরারোপ করেন এবং সেগুলো বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে গীত হয়। তিনি ও তাঁর কনিষ্ঠতর সমসাময়িক কবি 'আবদুল-হামীদই প্রথম দুই শ্লোকে অন্ত্যমিলযুক্ত পদ্য 'মুযদাবিজ' রচনা করেছেন। তবে, আবুল 'আতাহিয়্যা নিজেই সর্বপ্রথম 'মুদারি' ছন্দ আবিষ্কার করেন। আটটি দীর্ঘ শব্দাংশ বিশিষ্ট (Syllables) একটি ছন্দও তিনি আবিষ্কার করেন এবং তা কবিতায় ব্যবহার করেন।[২৯]

৩৮. আবুল 'আতাহিয়্যা সমকালীন দরবারী ও অভিজাত শ্রেণীর ভোগবিলাস, দুর্নীতি, সজনপ্রীতি, ধর্মীয় ও সামাজিক ন্যায়নীতির প্রতি উদাসিনতায় উত্তক্ত ও মনক্ষুন্ন হয়ে যুহদিয়াত বা বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। তখন থেকে তাঁর কাব্যপ্রতিভা নতুন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। ধর্মনিষ্ঠা, ইহজাগতিক জীবনের অসারতা, পরকালের জন্য নেক আমল আহরণ ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর রচিত কাব্য অসীম জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ফলে, তিনি একাই এপ্রকার কবিতা রচনা করে সর্বজনীন সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর বাঁধভাংগা জনপ্রিয়তা অবলোকন করে সমসাময়িক খামরিয়্যা কবি আবূ নুয়াস(মৃ.) ধর্মীয়, নৈতিক তথা যুহদিয়াত কবিতা রচনা শুরু করলে আবুল 'অতাহিয়্যা তাঁর নিজস্ব কাব্যভূবনে অনুপ্রবেশ করতে আবূ নুয়াসকে নিষেধ করেন।[৩০]

৩৯. আবুল 'আতাহিয়্যার খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার কারণে অনেকেই তাঁর প্রতি ঈষান্বিত হয়ে উঠে। তাঁর বিরোধী শিবির থেকে তাঁকে যিনদীক হওয়ার অপবাদ দেয়া হলে তিনি কাব্যে মৃত্যু, কিয়ামত, হাশর, নশর, বিচার দিবস সম্পর্কে অনেক কবিতা রচনা করে অপবাদ খণ্ডণ করেন। তিনি বলেন:[৩১]

سأُسألُ عن أمورٍ كنتُ فيها، فما عُذريْ هُناكَ، وما جوابيْ؟
بأيةِ حجةٍ أحتج يوم الـ حسابِ، إذا دُعيتُ إلي الحساب

"এ পৃথিবীতে থেকে কি কি কাজ করেছি তার সম্পর্কে যখন আমাকে পরকালে জিজ্ঞাসা করা হবে তখন আমার আপত্তি প্রদর্শনের কী উত্তর দেব? কিয়ামতের দিন যখন আমার হিসাব নেয়ার জন্য ডাকা হবে তখন কী যুক্তি দ্বারা নিজের পক্ষ সমর্থন করবো"।

সমকালীন কবিদের মাঝে আবুল 'আতাহিয়্যার স্থান

আবুল 'আতহিয়্যা তাঁর অনন্য সাধারণ কাব্য প্রতিভা যথাযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে আরবী সাহিত্যে এমন এক স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন যা তাঁর জন্যই সংরক্ষিত ছিল। সহজ-সরল-স্বাভাবিক লিখন ভঙ্গি ও বিষয়বস্তু নির্বাচনের গভীর চিন্তন শক্তি তাঁকে এ স্থানে সমাসীন করে। ফারসী সাহিত্যে শায়খ সাদীর যে স্থান আরবী সাহিত্যে আবুল আতহিয়্যার সেই স্থান। তাঁর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতি কবি আবু নুওয়াস। ভনক্রেমারের মতে, আবুল আতাহিয়্যার কাব্য-প্রতিভা আবু নুওয়াস অপেক্ষা অধিকতর ছিল। আবুল আতাহিয়্যা আরবী সাহিত্যোর প্রথম দার্শনিক কবি। কিন্তু দার্শিনিক ভাবাপন্ন হলেও তাঁর কাব্যে ইসলামী ভাবধারা মতাদর্শ ও ধর্মনিষ্ঠা সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা রয়েছে। কাজেই তাঁর কাব্য সহজেই মুসলিম হৃদয় স্পর্শ করে থাকে। আধুনিক যুগের জনৈক কাব্য সংকলক বলেন:[৩২]

"কাব্যের মনোরঞ্জন ও চিত্তবিনোদন শক্তি উপলব্দি করে আমি কয়েকটি উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে মনস্থির করি। এ জন্য আমি অনেকগুলো দিওয়ান অধ্যয়ন করি। কিন্তু পবিত্র ভাবধারা, মার্জিত রুচি, সরল ভাষা ও মধুর ছন্দের দিক দিয়ে আবুল আতাহিয়ার দিওয়ানই আমার নিকট শ্রেষ্ঠতম মনে হয়েছে"। প্রকৃত কাব্য সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকেনা। বরং তা প্রশস্ততর, উচ্চতর ও মহত্তর। এটা মানব জীবন ও দৈনন্দিন সত্যসমূহের মনোরম অভিব্যক্তি এটা মানুষের ভাব-চিন্তা, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার একটি সুন্দর বিকাশ। মানবের গহীন অনুভূতি কবির ছন্দে মূর্ত হয়ে ধরা দেয়। তাদের হাঁসি-কান্না, সুখ-দুঃখের ইতিহাস কবির বাঁশির সুরে গুঞ্জরিয়ে উঠে। কষ্টি পাথরে যদি আমরা আবুল 'আতাহিয়্যার কাব্য বিচার করি তা হলে আমরাবাধ্য হয়ে স্বীকার করতে পারি যে, কবি আবুল 'আতাহিয়্যা একজন উচ্চ শ্রেণির কবি। আরব-আজমে তাঁকে যে সমাদর ও সম্মান দেয়া হয়েছে তিনি তার প্রকৃত অধিকারী।[৩৩] আরবী কাব্যের ইতিহাসে কবি আবুল 'আতাহিয়্যার নাম সুবিখ্যাত। উচ্চ শিক্ষিত পাঠক হতে নিরক্ষর বেদুঈন পর্যন্ত সবশ্রেণীর লোকই তাঁকে চিনে এবং তাঁর কবিতা আবৃত্তি করে থাবে। যে খানেই আরবী ভাষা ও সাহিত্যেও চর্চা আছে সেখানেই তাঁর রচিত কবিতা অধীত ও সমাদৃত হয়ে থাকে। ফার্সী সাহিত্যে শায়খ স'দীর যে স্থান আরবী কাব্য সাহিত্যেও আবুল 'আতাহিয়্যা প্রায় সেস্থান অধিকার করেছেন। তাঁর সহজ সরল ভাষা ও অনাড়ম্বর স্বাভাবিক রচনা ভংগী প্রকৃত পক্ষে প্রশংসা পাওয়ার দাবী রাখে। তাঁর প্রভূত খ্যাতি ও উচ্চ সন্মানের মূলে রয়েছে তাঁর সহজ সরল ভাষা ও

অবাধগামী ছন্দ। এর সাথে যুক্ত হয়েছে তাঁর উঁচু মানের দার্শনিক ভাবধারা যা অনাবিলস্রোতের ন্যায় সহজগামী এবং কাব্যভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদে ভূষিত। আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম এবং হয়তো সর্বশেষ কবি যিনি দেখিয়েছেন যে, কাব্যেও সৌন্দর্যহানি না করেও অতি সহজ ও সরল ভাষা ব্যবহার করা যায়।[৩৪]

ছন্দের চাহিদায় অথবা ছন্দের অনুরোধে কখনো তাঁকে কবিতায় দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করতে হয়নি। অরবী ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁর এতখানি দখল ছিলো যে, তিনি অনায়াসে পদ্যে অনর্গল কথা বলতে পারতেন। এধরণের হঠাৎ রচিত তার কতকগুলো পদ্য আছে যা তাঁর অন্যান্য রচনার সাথে স্থান পাওয়ার যোগ্য। তিনি বরতেন, ইচ্ছা করলে তিনি সর্বদা পদ্যে কথা বলতে পারেন। আরবী ছন্দশাস্ত্রকে উপেক্ষা করেও তিনি অনেক সময় কাব্য রচনা করেছেন, কাব্য হিসাবে যরা সৌন্দর্য ছিলো অপূর্ব। মরু কাব্যের বাগাড়ম্বরকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিহার কওে চলতেন।[৩৫]

ইবনুল ফারিদ বিরচিত সূফী কবিতা ও তাঁর কাব্যপ্রতিভা

ইবনুল ফারিদ বিরচিত সূফী কবিতার বিষয়বস্তুগুলো আবুল ‘আতাহিয়্যা রচিত যুহ্দ কবিতার বিষয়বস্তু হতে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। ইবনুল ফারিদের সূফী কবিতার বিষয়বস্তুগুলো হলো, সুদূর প্রান্তে এগিয়ে যাওয়া সতীর্থ পথচারীদের উদ্দেশে রচিত কবিতা, মহান আল্লাহর প্রতি শৈল্পিকরূপে, শ্লেষাত্মক ও আলংকারিক বাক্যে নিবেদিত প্রেমকাব্য, কবিতায় প্রকৃতি ও কৃত্রিম উপাদানের সংমিশ্রণ, সমসাময়িক কবিদের ন্যায় তাঁর সব কবিতায় না হলেও তাঁর কিছু কবিতায় বিশেষ করে হিজাযের যাযাবর জীবনের প্রকৃতি ও কৃত্রিমতার উপাদান পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই কৃত্রিমতার মধ্যেও তাঁর কবিতা প্রকৃতির শক্তিতে বলিয়ান। প্রাতঃসমীরণের স্নিগ্ধবাতাসে বাতাসে ভাসমান অন্তরের সুরভি আকুতি তিনি তাঁর রচিত কাসীদায় ব্যাক্ত করেছেন। সূফী তরীকায় বিলুপ্তি ও বিলীনের জন্য পথচারীদের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। সূফীতত্ত্ব অনুসরণ করতে গিয়ে ইবনুল ফারিদ ঘোষণা দেন যে, তিনি সব সময় আল-কুর’আন ও আল-হাদীসের আদেশ-নিষেধ শক্তভাবে পালন করবেন। এ দু’টো প্রধান উৎস থেকে তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার সকল উপাদান আহরিত হয়েছে। মহান আল্লাহর সত্তায় তাঁর বিলীন(ফানা) হওয়ার ‘আকীদা(বিশ্বাস)টি রাসূলুল্লাহ(স.)-এর আদর্শ অনুসরণ থেকে প্রতিফলিত হয়েছে। কবিতায় উল্লিখিত হাদীসটি একটি হাদীস কুদসী সম্পর্কে ছিলো, আর তা হলো:[৩৬]

“যে ফরজ ইবাদত আমার প্রিয় তা আদায় করে আমার বান্দা আমার নিকটবর্তী হয় এবং যে নফল ইবাদত আমার পছন্দনীয় তা আমার বান্দা প্রতিনিয়ত আদায় করে আমার নিকবর্তী হয়, তখন আমি তাকে ভালবাসি। আমি তার শ্রবনশক্তি হই, যা দিয়ে সে শুনতেপায়, তার দৃষ্টিশক্তি হই যা দিয়ে সে দেখতে পায়, তার হাত হই

যা দিয়ে সে ধরতেপারে এবং তার পা হই যা দিয়ে সে হাটতে পারে। সে আমার কাছে কিছু চাইলে তা আমি প্রদান করি, আর আমার কাছে ক্ষমা চাইলে আমি অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দিই।" এই হাদীসে আল্লাহ-প্রেমে বিলুপ্তি (الانمحاء) ও বিলীন (الفناء) হওয়া সূফীকবির এই চিন্তাধারাটি হাদীসে প্রতিফলিত হয়েছে। মহান প্রিয়ার স্মরণে মদ্যপানে সূফীতাত্ত্বিক প্রতীকীর প্রতিফলন এই মদের প্রকৃতি ও ধরণের প্রতীকী রূপ হাকীকতে ইলাহিয়্যাহ ও হাকীকতে মুহাম্মদীয়া'র বর্ণনা দিয়ে কবিতা রচনা করেছেন।

মহান আল্লাহর প্রেম বিরহের যাতনা সহ্য করে তার যন্ত্রণায় কবির দেহ শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ-রাসূলের প্রেমবিরহে ধৈর্যধারণ করা সম্পর্কে কবি কবিতা রচনা করে বলেন। আল্লাহরপ্রেম কবিকে এমন দুনিয়াবিমুখ বানিয়েছে। মহান প্রভুরপ্রেম ও তাঁর বিরহের ব্যাথায় কবি দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সব বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছেন। কবি তাঁর আরাধ্য প্রেমময় মালিকের ভালোবাসা পাওয়ার আশায় অনাড়ম্বর জীবন বেছে নিয়েছেন। বিরহের যাতনায় কবির দেহমন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তাঁকে দেখতে এসে পরিচিতজনরা তাকে চিনতে পারেনা, কেননা, তার শরীরের অবস্থা আর আগের মতো নেই। দুনিয়াবিমুখ আল্লাহপ্রেমিক একজন নিষ্ঠাবান বান্দা দুনিয়ার প্রতি কোনো আকর্ষণ রাখতে পারেনা। কারণ, তার একমাত্র আরাধ্য বস্তু–মহান প্রভুর প্রেম ও সান্নিধ্য। তাই, দুনিয়ায় সে অবস্থান করে একজন প্রবাসীর মতো, মুসাফিরের মতো। প্রবাসজীবন যতই সুখময় হোক না কেন নিজ বাসভবনের মতো শান্তি সেখানে অনাহুত।[৩৭]

ইবনুল ফারিদ বিরচিত কবিতার সর্বত্রউদ্দেশ্য হলো আল্লাহপ্রেম যার ভিত ইত্তিহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। অস্তিত্বের সকল বাহ্যিক দৃশ্য মর্যাদা ও মূল্যামানে সমান বলে বিশ্বাস করাই হলো ইত্তিহাদ। কেননা, প্রকৃতপক্ষে এসব দৃশ্যাবলী প্রভুত্তের পার্শ্বদেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। তাই, সমুদ্র, পর্বত, মানুষ, পাখি, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, পুজার ঘর, আগুন সব কিছুই একে অপরের পার্শ্বদেশের প্রভূত্তের প্রতিনিধিত্ব করছে। সুতরাং, মদের দোকানের একজন মদ্যপায়ী ও উপাসনালয়ের একজন ইবাদতকারী ভিন্নভিন্ন দৃশ্যে একই কাজ করছে। সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টার অস্তিত্বের বিকাশ আল্লাহর প্রতি নিবেদিত প্রেম, সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টার অস্তিত্ব, সমগ্র সৃষ্টিজগত মহানআল্লাহর গুণগ্রাহী, আত্মশুদ্ধীর জন্য আল্লাহপ্রেম ও সূফীসাধনা আবশ্যক, বাহ্যিক চোখে আল্লাহরদর্শন অসম্ভব, মহান আল্লাহর সদৃশ কিছু হতে পারেনা, আল্লাহর দাসত্বই মানবসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য এবং আল্লাহর দাসত্বেই আখিরাতের সফলতা বিষয়গুলো অবলম্বনে তিনি কবিতা রচনা করেন। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাকে কবি তাঁর প্রধান ইবাদত হিসেবে গ্রহণকরেন। কবি মনে করেন, আল্লাহর নামে আত্মীয়তার সম্পর্ক তথা তাঁর সাথে ভালোবাসার সম্পর্কই একমাত্র মুক্তির পথ। আল্লাহর সাথে বান্দার যে আত্মিকসম্পর্ক রয়েছে তা-ই তাকে উচ্চ স্থানে(মাকামে) নিয়ে যাবে। বান্দার সাথে আল্লাহর যে হুব্বুল ইলাহীর সম্পর্ক তা রক্ত, বংশ ও গোত্রের চেয়েও অধিক শক্তিশালী। কবি এখানে বলেন তিনি চোখদ্বারা মহান আল্লাহর সৃষ্টিনৈপুণ্য

অবলোকন করে তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করেন। ফলে, এক পর্যায়ে তিনি বেহুশহয়ে যান। অতঃপর সানায়া তথা আল্লাহ তাআ'লার চারটি গুণবাচক নাম শ্রবণ করে অচৈতন্য কাটিয়ে উঠতে সক্ষমহন।[৩৮]

কবি বিশ্বাস করেন সমগ্রসৃষ্টি তার মহান স্রষ্টা আল্লাহতাআ'লার দিকে ইশারা করছে। অর্থাৎ অস্তিত্বশীল যা কিছু আছে সবই মহানআল্লাহর সৃষ্টি আর এগুলো তাঁরই অস্তিত্ব ও সীমাহীন কুদরাতের কথাই জানান দিচ্ছে। একজনবুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর সৃষ্টিকারী আল্লাহর অস্তিত্বকে খুঁজেপান। নফসের সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ কবি ইবনুল ফারিদ আল্লাহপ্রেমকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর দীওয়ানের প্রায়সর্বত্র এ বিষয়টিঅত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। তিনি মনে করতেন একজন সাধকের জন্য আল্লাহপ্রেম অপরিহার্য। আল্লাহ প্রেমছাড়া পরিপূর্ণ মানুষ(আল-ইনসানুল-কামিল) হওয়া সম্ভব নয়। তিনি মনে করতেন আল্লাহপ্রেমই একজন সূফীসাধকের জন্য ইবাদতের শক্তি ও পরকালীন মুক্তি আনয়ন করে। কবি মনে করেন মানুষের ক'টিদেশ যেমন মানব শরীরের মাঝখানে অবস্থান করে তার উপর ভাগ অন্তর এবং নিম্নভাগ পাশবিক কেন্দ্রকে সংযোজিত করে, তেমনি নফস মানুষের সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তিকে সংযোজন করে রেখেছে। আর নফসের সাধারণগতি খারাপ দিকেই থাকে। এজন্য এটি যদি ক্ষীণ ও দুর্বল হয় ততই মঙ্গল। আর এজন্য মানব শরীরকে দুর্বল করে রাখাই বাঞ্ছনীয়। কেননা শারীরিক দুর্বলতা কুপ্রবৃত্তিকে জয় করে নিতেপারে। কবি তার কাজের বহুস্থানে আল্লাহর তাশবীব করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কবির বিশ্বাস ছিল আল্লাহ তা'আলার বাহ্যিক দর্শন লাভ করা কারোপক্ষে সম্ভব নয়। যে বা যারা মনে করে আল্লাহকে দিব্য দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করেছে তা সর্বৈব মিথ্যা ব্যতীত অন্য কিছু নয়।[৩৯]

আল্লাহর গোলামীর প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালানো মহানআল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর গোলামী করার জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন:[৪০]

ومَا خَلَقتُ الْجِن والإنس إلا ليعبدون

"আমি জিন্ন ও মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।"

কবি মহান আল্লঅহর এ অমিয় বাণীর উপর সুদৃঢ় ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন একজন মানুষ তখনই সত্যিকার মানুষ হিসেবে পরিগণিত হবে যখন সে সঠিকভাবে খোদার গোলামী করতে প্রানান্ত প্রচেষ্টা চালাবে। কবি বিশ্বাস করতেন, যদি কেউ আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত দাস হতে পারে তাহলে তার আর কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তাঁর জন্য রয়েছে শুধু সুসংবাদ। সে এমন মুকুট পরিধান করবে যা তাকে মুক্তি ও স্বাধীনতার পয়গাম পৌঁছে দিবে। আল্লাহর সত্যিকার দাস আখিরাতের সকল ঘাঁটি অতিক্রম করে পৌঁছে যাবে মনযিলে মাকসাদে তথা জান্নাতের সুশীতল ছায়া তলে। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বিনয়ী প্রশংসায় স্তুতিকাব্য রাসূলুল্লাহ(স.)-এর প্রশংসায় ইবনুল ফারিদের কিছু স্তুতিকাব্য রয়েছে। তিনি প্রকৃত পক্ষে রাসূলুল্লাহ(স.)-এর প্রশংসায় ভিন্নভাবে কোন দীর্ঘ কাসীদা রচনা করেননি। স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর দীওয়ানে

রাসূলুল্লাহ(স.)-এর প্রশংসায় কোন দীর্ঘ স্তুতিকাব্য কেন রচনা করেননি? উত্তরে ইবনুল ফারিদ বলেন: রাসূলুল্লাহ(স.)-এর বিনয়ী প্রশংসায় স্তুতিকাব্য রাসূলুল্লাহ(স.)-এর প্রশংসায় ইবনুল ফারিদের কিছু স্তুতিকাব্য রয়েছে। তিনি প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ(স.)-এর প্রশংসায় ভিন্নভাবে কোন দীর্ঘ কাসীদা রচনা করেননি। স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর দীওয়ানে রাসূলুল্লাহ(স.)-এর প্রশংসায় কোন দীর্ঘ স্তুতিকাব্য কেন রচনা করেননি? উত্তরে ইবনুল ফারিদ বলেন:[৪১]

وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

"(ওহেনবী!) নিশ্চয় আপনি (সর্বোৎকৃষ্ট) মহান চরিত্রের অধিকারী।"

তবে, ইবনুল ফারিদ রাসূল্লাহ(স.)-এর পরোক্ষ প্রশংসায় তাঁর কাসীদা ফা(ف)অন্তমিল বর্ণের কাব্যে কয়েকটি চরণে যা বলেছেন তা অনেক উঁচু মানের রচনা; সাধারণত তা অন্য কোন কবি দ্বারা রচিত হওয়া সম্ভবপর হবেনা। ইবনুল ফারিদ নিম্নের কবিতাচরণদ্বয় রচনা করে খুশিমনে বলেন, রাসূলুল্লাহ(স.) সম্পর্কে অনুরূপপ্রশংসা আর সম্ভব নয়:[৪২]

كَمُلَتْ مَحَاسِنُهُ، فَلَوْ أَهْدَى السَنَا لِلْبَدْرِ، عِنْدَ تَمَامِهِ، لَمْ يُخْسَفِ
وَعَلَى تَفَنُنِ وَاصِفِيْهِ بِحُسْنِهِ، يَفْنَى الزَمَانُ، وَفِيْهِ مَا لَمْ يُوْصَفِ

"তাঁর (রাসূল্লাহ স.-এর) গুণাবলী এতই দীপ্তময় ও পরিপূর্ণ যে, পূর্ণচাঁদকে যদি তাঁর থেকে কিছু চমক প্রদান করা হয় তা হলে চাঁদের আর কখনো গ্রহণ হবেনা। তাঁর (রাসূলুল্লাহ স.এর) মহান সৌন্দর্য ও বহুমাত্রিক গুণাবলীর প্রশংসায় সর্বকালে বিভিন্ন শ্রেণীর বর্ণনাকারীর অব্যাহতপ্রচেষ্টা থাকলেও কালেরগতি শেষ হয়েযাবে, কিন্তু তাঁর প্রশংসা শেষ হবেনা।"

আলোচ্য চরণদ্বয় সম্পর্কে বলা হয়, এর আভ্যন্তরীণ ভাবার্থ সবই রাসূলুল্লাহ(স.)-এর প্রশংসায় পরিপূর্ণ। আর, কবির অধিকাংশ কবিতা এই মানের নয়।

আলোচ্য চরণদ্বয় সম্পর্কে বলা হয়, এর আভ্যন্তরীণ ভাবার্থ সবই রাসূলুল্লাহ(স.)-এর প্রশংসায় পরিপূর্ণ। আর, কবির অধিকাংশ কবিতা এই মানের নয়।

কবি ইবনুল ফারিদ লোকগীতি, রহস্যাবৃত ধাঁধাঁ ও প্রতীকী শিল্পের ব্যবহারসমকালীন কবিদের অনুকরণে প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও শৈল্পিকরূপ প্রদান করে লোকগিতী (مواليات), পালাক্রমী দু'পদী (دوبيتات), রহস্যাবৃত ধাঁধাঁ (ألغاز), প্রতীকী(رمزي), রূপকালঙ্কার(استعارة), শ্লেষালঙ্কার(جناس), অতিরঞ্জন(مبالغة), ক্ষুদ্রকরণ(تصغير) কাসীদায় সমকালীন কবিদের অনুকরণে প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও শৈল্পিকরূপ ব্যবহার করেন। তিনি আয়্যুবী সুলতানদের শাসনামলে সুলতান সালাহুদ্দীনসহ তাঁর বংশের চারজন সুলতানের সময়ের কাব্যধারায় কবিতা রচনা করেন। তিনি প্রেমকাব্য ও সূফী কাব্যের সমন্বিত রচনায় ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতি ইঙ্গিত(প্রতীকী ব্যবহার করে) করে বলেন:[৪৩]

لَهـا الـبَدْرُ كـأسٌ، وهيَ شـمسٌ، يُـديـرُهَـا   هِـلالٌ، وكَـمْ يَبـدُو إذا مُزِجَـتْ نَجْـمُ

"পূর্ণিমার চাঁদ(মহান প্রেমিক আল্লারহর মুখ মন্ডল) হলো তার পাণপাত্র, আর সে (আমার প্রেয়সী) হলো সূর্য যাকে কেন্দ্র কব্রে চাঁদ আবর্তণ করছে, সে কখনো উদিত হয় এমন সময় যখন আকাশে নক্ষত্র থাকে না।"

মক্কা গমনের মাধ্যমে তাঁর মনের আকুতি পূর্ণ হতে যাচ্ছে তার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন:[88]

يا سميـري! رَوح بمكـة روحي   شاديا إن رغبت في إسعادي

كـان فيهـا أنسي ومعراج قـدسي   ومقـامي المقـام والـفتـح بـاد

"ওহে আমার নৈশবার্তার সঙ্গী! পবিত্র মক্কার গুণগান করার মাধ্যমে তুমি আমার আত্মার পরিশুদ্ধি প্রদান কর, যদি তুমি আমাকে সুভাগ্যবান করতে চাও; তাতে(পবিত্র মক্কায়) রয়েছে আমার ঘনিষ্টতা, আমার পবিত্রতার সোপান, আমার লক্ষ্যস্থল মাকামে ইব্রাহীম(আ.) এবং আমার আলোক-সম্পাত স্বচ্ছ"।

ইবনুল ফারিদের সূফী কবিতা ও কাব্যপ্রতিভার তুলনা

ইবনুল ফারিদ বিরচিত কবিতায় শৈশব ও কিশোরকালের চিত্র, নানারঙ্গ ও বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ রয়েছে। তাঁর কাব্যে মহান আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রেমাধিক্য ব্যাপক স্থান পেয়েছে। ইবনুল ফারিদের যুহদ ও সুফীতত্ত্বের ক্ষেত্রে অবদান হিসাবে শুধু তাঁর রচিত একটি কবিতা সংকলনগ্রন্থ তথা দীওয়ান ইবনুল ফারিদ রয়েছে। তাতে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হিসাবে তাঁর সূফীতত্ত্বের বিষয়গুলোর অবস্থান রয়েছে। আখিরাতের বিষয়বস্তুকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে আখিরাতের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ। আখিরাতের সফলতাই প্রকৃত সফলতা। তিনি সকল কিছুর উপর আল্লাহর প্রেমকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। শারীরিক ও বাহ্যিক প্রেমের পরিবর্তে তিনি আত্মিক ও আধ্যাত্মিক প্রেমকে বেছে নিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন আল্লাহপ্রেমই মানুষের প্রধান ইবাদত। পার্থিব খ্যাতি অর্জনের পেছনে তিনি কখনো প্রতিযোগী হননি, বরং খ্যাতিই তাঁর পেছনে দৌঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। কোনো-শাসক সুলতান অথবা কোনো রাজা-বাদশাহর দরবারে তিনি গমন করেননি। এমনকি তিনি তাঁদের কারো প্রশংসায়স্তুতিকবিতা রচনা করেননি। রাজা-বাদশাহগণ তাঁর দরবারে আসতে চাইলেও, তিনি অনুমতি দেননি। ইবনুল ফারিদের অবস্থান ফার্সী সূফীকবি মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর (হি.৬০৪-৬৭২/খ্রি.১২০৭-১২৭৩) পরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ইবনুল ফারিদ রচিত ও ২২০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত আরবী কবিতাসংকলন দীওয়ানের ২০টি কাসীদায় সর্বমোট ১৬৪৪ টি চরণ মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রকৃত প্রেমনিবেদক পরিপূর্ণ গযল এবং সূফীতত্ত্বনির্ভর। তাঁর রচিত নাজমুস সুলূক বা তা'ইয়্যাহ কুবরা(التائية الكبري) শিরোনামের কবিতাকুঞ্জটিতে রয়েছে ৭৬১টি চরণ। আর, প্রেমনেশাযুক্ত আল-খারিয়্যাহ কাসীদায় (الخمرية) ৪১টি কবিতাচরণ স্থান পেয়েছে। অবশিষ্ট ১৮টি কাসীদায় আরো ৮৪২ টি চরণ মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেব প্রতি নিবেদিত প্রেমকাব্য বা গজল। ইবনুল ফারিদের কবিতাকে ইসলামীসূফীকাব্য(الشعر الصوفي),প্রেমকাব(غزل), নারীরপ্রতীক(رمز المرأة), মদের প্রতীক(رمز الخمرة),

প্রকৃতির প্রতীক(رمز الطبيعة), পালাক্রমী দু'পদী (دوبيت), রহস্যাবৃত ধাঁধাঁ(ألغاز) সমকালীন কবিদের অনুকরণে প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও শৈল্পিকরূপ প্রদান করে কবি লোকগিতী (مواليات), রহস্যাবৃত ধাঁধাঁ (ألغاز), প্রতীকী(رمزي), রূপকালঙ্কার(استعارة), শ্লেষালঙ্কার(جناس), অতিরঞ্জন(مبالغة), ক্ষুদ্রকরণ(تصغير) ইত্যাদি শিরোনামের কাসীদায় সমকালীন কবিদের অনুকরণে প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও শৈল্পিকরূপ ইত্যাদি শ্রেণীর কবিতা রচনা করেছেন।[৪৫]

সমকালীন কবিদের মাঝে ইবনুল ফারিদের স্থান ও তাঁর কাব্যপ্রতিভা

ইবনুল ফারিদের রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্যেও আলোকে সূফী কবি ও সমকালীন কবিদের মাঝে তাঁর স্থান নির্ণয় তরা যেতে পারে।তাঁর রচিত শৈল্পিকরূপ কবিতায় তাঁর বাস্তব অবস্থা ও অভিজ্ঞতার প্রকৃত প্রতিফলন হয়েছে। তাঁর কবিতা শৈল্পিক ও সূফীতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিপূর্ণ রচনা। ইবনুল ফারিদের গবেষকদের বিচারে তিনি আরবী কবিতায় তা'ইয়্যা কুবরা ও সুগরা কলার একজন অবিজ্ঞ ও বিদগ্ধ শিল্পী যাকে অনুসরণ করে পরবর্তী কবিগণ অনুরূপ কবিতা রচনা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর সময়ের সূফী কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন: মুহী উদ্দীন ইবনুল 'আরাবী (মৃ.৬৩৮/১২৪০), আবূ ইসহাক আল-ওয়া'ইজ (মৃ.৬৮৭/১২৮৮), আবূ হাফস আস-সুহরাওয়ার্দী (মৃ.৬৩২/১২৩৪) এবং তাঁর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন: ইনুন নাবীহ আল-মিসরী (মৃ.৬১৯/১২২২),ইব্নসানা আল-মুলক (মৃ.৬০৮/১২১১), ইব্ন মাতরূহ (মৃ.৬৪৯/১২৫১), বাহা উদ্দীন যুহায়র(মৃ.৬৫৬/১২৫৮) এবং লেখক, সাহিত্যিক ও লিপিকারদে মধ্যে ছিলেন কাজী আল-ফাদিল(মৃ.৫৯৬/১১৯৯)।[৪৬]

আরবী সূফীকাব্য ধারার কবিদের মধ্যে ইবনুল ফারিদ তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তিনি ক্রুসেড যুদ্ধ, ফরাসীদের স্পেইন দখল এবং মঙ্গলদের প্রাচ্যদেশ অক্রমণের সময় বাহ্যতঃ এক প্রকার অসম জীবনযাপন করেছিলেন। ফাতিমীশাসন পতনের দশ বছর পর মিসর নগরী পুনরায় সালাহুদ্দীন ও তাঁর পরিবারের লোকদের শাসনাধীনে চলে আসে। তিনি তাঁর পিতা ও দাদার ন্যায় সিরিয়ার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম সূফী শেখ পরিবারের লোক ছিলেন এবং বাল্যকাল থেকে মিসরে সূফীপথ অনুসরণ করেছেন। তিনি ইসলামী আইন ও হাদীসের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সময়ে প্রচলিত ও নির্দিষ্ট কোন সূফী পথের তিনি সরাসরি অনুসারী ছিলেন না। তবে তিনি কখনো কখনো শাফি'ঈ মতাবলম্বী ও নিরবে জীবন সম্পর্কে অধ্যয়নকারী একজন চিন্তাশীল আল্লাহপ্রেমিক কবি ছিলেন। যুগের অন্যান্য কবিদের ন্যায় তিনি কোনো রাজা-বাদশাহর দরবারে গমন করেননি এবং কবিতার মাধ্যমে তাঁদের কোনো প্রশংসাও করেননি। তিনি যৌবনে মিসরের চার দিকের পাহাড়-পর্বত ও মরূ অঞ্চলে নিরবে গমন করতেন এবং মিসরের আল-আজহার কেন্দ্রীয় মসজিদে আরবী কবিতার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাপন করতেন। ফলে তিনি প্রাচীন ধারার আরবী কবিতা রচনায় একজন প্রতিভাবান পারদর্শী কবি হয়ে গড়ে উঠেন।[৪৭]

৩৫ বছর বয়সে তিনি মিসরে শেখ আবুল হাসান আল-বাক্কাল নামক এক রহস্যময় সবজী বিক্রেতা সূফীর সন্ধান লাভ করেন এবং তাঁর অনুপম বাস্তব কৃপায় তিনি পবিত্র মক্কায় ভ্রমণের দীশা অর্জন করেন। মক্কায় গমন করে তিনি সেখানে ১৫ বছর অতিবাহিত করেন। তিনি বলেন:[৪৮]

لايكاد يتصل بالناس إلاحين كان يأتي إلي الحرم الشريف معطوفا به، مصليا، فيه.

"…as I entered it [Mecca] enlightenment came to me wave after wave and has never left".

ইবনুল ফারিদ তাঁর সেই আধ্যাত্মিক শিক্ষক অবুল হাসান আল-বাক্কালের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবনের শেষ চার বছর মিসরে অবস্থান করেন এবং মৃত্যুর পর সেখানে সমাধিস্থ হন। তাঁর মাজার এখনো প্রতিদিন তাঁর হাজারো ভক্তগণ যিয়ারত করে থাকেন। তাঁর নাতী 'আলী তাঁর মৃত্যুর প্রায় শতবছর পর দীবাজা আল-দীওয়ান শির্ষক একটি গ্রন্থে তাঁর যে জীবনী লিখেন তা থোমাস এমিল হোমারিন ইংরেজীতে অনুবাদ করে বলেন:[৪৯]

"Ibn Fāriḍ's poetic output was relatively small, or at least, the part that survives is relatively small compared to the vast heritage of people like Nizamī or Rūmī, or even Ibn 'Arabī".

ইবনুল ফারিদের দীওয়ানে কতটি কাসীদা স্থান পেয়েছে তা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন উৎসানুযায়ী মতপার্থব্য রয়েছে তবে ফাদার জোসেপ স্কাতুলীনের গবেষণা লব্ধ অভিমত হলো:[৫০]

"We are talking about around 30 poems altogether, of which there is a core corpus of about 14 fairly substantial works of between 20 and 150 verses, plus about15whichis called 'miscellenea'. In addition, there is one very extra ordinary poem of 761 which is called Naẓm al-Sulūk, which is usually translated as Poem of the Way, or it is called the Tā'iyya al-kubrā because it has the end rhyme of 'ta'(ت)".

কবির রচিত ৭৬১ চরণ বিশিষ্ট উল্লেখিত সব চাইতে দীর্ঘ তাইয়্যাহ কুবরা কাসীদাটি শৈল্পিক ও বিষয়বস্তুর বিচারে তাঁর নিজের আধ্যাত্মিক জগতের প্রতিভাবান সফর হিসাবে বিবেচিত। তিনি তার ৪১ চরণে রচিত খামরিয়্যা কবিতায় ও অন্যান্য প্রেমকাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে প্রতীকী অর্থ ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে প্রকৃতপক্ষে মদ হলো সুচিন্তিত স্বর্গীয় সুখ এবং মহান আল্লাহর এককত্বের প্রতি আধ্যাত্মিক ভালবাসার প্রতীক। আর, মুহাম্মদ(স.) হলেন আধ্যাত্মিক শিক্ষক।[৫১]

ইবনুল ফারিদ তাঁর সূফীদর্শনের মাধ্যমে কুতুব হিসাবে পরিপূণতা লাভ করেছেন। এসম্পর্কে ড. সাদ্দামের অভিমত হলো:[৫২]

عاش ابن الفارض حياته محبا الهيا والها يصبو الى المطلق وشاعرا صوفيا ادلى بشهادته على الواحد بعد شهوده في شعره اثار حماس الواجدين وقصائد ما تزال ثوابتها وارسالها وصورها ومعانيها تجسد هذا الشوق الانساني اللامتناهي الى قطب الكمالات.

ইবনুল ফারিদের রচিত কবিতার বৈশিষ্ট্য

আরবের একজন শ্রেষ্ঠ সূফী কবি হিসাবে তাঁর রচিত সব কবিতা সূফীতত্ত্ব সম্পর্কিত। তবে কারো কারো মতে তাঁর কিছু কবিতা পরমানন্দদায়ক ও আধ্যাত্মিক। যদিও ফার্সী কবি জালালুদ্দী রূমীর ন্যায় পাশ্চাত্য জগতে তিনি ব্যপকহারে পরিচিত নন, তবুও অধিকাংশ গবেষকদের মতে তাঁর রচিত কবিতাগুলো আরবী সূফীকাব্যের রূপকার্থে অবশ্যই শির্ষস্থানীয়। তাঁর রচিত তা'ইয়্যাহ ও খামরিয়্যা কাসীদাদ্বয় এখনো মুসলিম জগতের সূফী সমাপ্রদায় ও তাঁর ভক্তবৃন্দ মুখস্ত পাঠ করছে। তাঁর রচিত ভালবাসার কবিতাগুলো হলো জীবনসুরা এবং খামরিয়্যা হলো এই স্বর্গীয় মদের প্রতি উৎসর্গকৃত। এসম্পর্কে জর্জ নিকোলাস আল-হ্যাগ বলেন:[৫৩]

"Love is the 'wine of life'; the 'Khamriyya' dedicated to this divine wine, stands in its own right as an incomparable masterpiece in the history of Arabic mystical poetry".

ইবনুল ফারিদের কবিতার সঠিক অনুবাদ সম্ভব নয়। কারণ, তাঁর রচিত কবিতা বুদ্ধিদীপ্তশব্দ, পরোক্ষ উক্তি, শ্লেষালংকার ও অন্যসব কবির ভাষ্য সমন্বয়ে পরিপূর্ণ যা আধুনিক পাঠকদের বোধগম্য নয়। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আরব কবি যিনি শুধু নির্দিষ্ট সূফী মডেলে কবিতা রচনা করেছেন। তিনি প্রচলিত কোন মাযহাবের অনুস্মরণ করেননি, তবে কখনো কখনো শাফি'ঈ মাযহাবের অনুস্মরণ করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি তাঁর ৩৫ বছর বয়সে তাঁর আধ্যাত্মিক সূফী সাধক একজন সবজী বিক্রেতা আবুল হাসান আল-বাক্কালেব অনুপ্রেরণায় মক্কায় গমন কওে সেখানে ১৫ বছর অতিবাহিত করেন এবং প্রকৃত সত্য অর্জন করেন। তিনি প্রথম জীবনের বেশ কিছু সময় কায়রোর পাহাড়-পর্বত ও নির্জন মরুভূমিতে কাটিয়েছেন এবং আল-আযহার মসজিদে তাঁর আরবী কবিতার দক্ষতার রূপরেখার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।[৫৪]

মিসরে ফাতিমী খিলাফতের ঠিক ১০ বছর পর এবং কায়রোর শাসনে সালাহুদ্দী আয়্যুবীদের প্রত্যাবর্তনের সময় ইবনুল ফারিদ মিসরের প্রখ্যাত সূফী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তখন মুসলিম বিশ্বে বড় ধরণের রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সামাজিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। তখন ছিল ক্রুসেড যুদ্ধের দামাডুল পরিবেশ, ফরাসীদের স্পেন আক্রমণ এবং প্রাচ্যদেশে মঙ্গলদের আগ্রাসন। যুগের অন্যান্য কবিদের ন্যায় জীবন যাপন করলেও তিনি কোনো রাজা-বাদশাহর দরবারে গমন করেননি এবং তাদেও প্রশংসা করে উপঢৌকনও গ্রহণ করেনি। তাঁর মৃত্যুর প্রায় একশত বছর পর তাঁর দৌহিত্র 'আলী সিবত আল-ফারিদ তাঁর বিস্তারিত জীবন ও

কর্মের উপর ভিত্তি কওে তাঁর দীওয়ানে bi *Dibajat al-Diwan*(ديباجة الديوان) রচনা করেছেন। তাঁর রচিত তাইয়্যা কুবরা বা "বড় তা" কাব্যছন্দে রচিত ও খামরিয়্যা বা জীবনের স্বর্গীয়মদ কাসীদাদ্বয় আরবী সূফী কাব্যের ইতিহাসে অসাধারণ ও অতুলনীয় কাব্য মালা। তাঁর কাব্য রচায় প্রাচীন ও আধুনিক উভয় শৈল্পিক রূপধারার সূফী কবিতা স্থান পেয়েছে।[৫৫]

ইবনুল ফারিদের কবিতা ও দীওয়ানের সাহিত্যিক মূল্যায়ন

কবি ইবনুল ফারিদ তাঁর কবিতাসংকলন দীওয়ান ইবনুল ফারিদ ব্যতিত আর কোন গ্রন্থ, মাকালা বা প্রবন্ধ রচনা করেননি। তাঁর রচিত দীওয়ান আরবী পদ্যসাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ। এর ভাষা, বিষয়বস্তু ও ভাব অতি চমৎকার। তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যুহদ তথা দুনিয়াবিমুখতা। কবি যুহদিয়াত কবিতা রচনা করতেন এবং ব্যক্তিজীবনে এর উপর অনুশীলনও করতেন। কবির দুনিয়াবিমুখজীবন ছিল অনাড়ম্বর ও সাদাসিধে। খোদা প্রেমই ছিল তাঁর একমাত্র সূফীদর্শন। ইবনুলফারিদেও কবিতায় পুনরাবৃত্তি, অস্পষ্টতা, বিচ্ছিন্নতা, শাব্দিক আর্থিক শিল্পরূপের আধিক্য পাওয়া গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাতে মননশীলতা ও রুচীশীলতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। তবে তাতে পর্যাপ্ত রমযিয়্যাহ বা প্রতীকীর ব্যবহার দেখা যাচ্ছে।[৫৬]

তাই, সূফীকাব্যসাহিত্যে তাঁর স্থান ফার্সী কবি জালালুদ্দীন রূমীর(মৃ.৬৭২/১২৭৩) পর দ্বিতীয় স্থানে। এ পর্যায়ে 'উমর ফর্‌রূখ বলেন:[৫৭]

"وَمَعَ أَنَ شِعْرَ ابنِ الفارضِ يَنُوء بضَعْفِ كَثِيرٍ مِنَ التكْرارِ والغمُوْضِ والتخلْخُلِ، ومِنَ الإِسْرَافِ فيْ الصِنَاعَة المعْنويةِوالصناعةِ اللفظيةِ، فإنهُ شِعْرٌ عَذبٌ أنيقٌ فيْ أكثرِ الأحْيَان. والرمْزِ فيهِ غايةٌ فيْ البرَاعَةِ وحُسْنِ الإشارةِ."

মহান আল্লাহপ্রেমকে উপজীব্য করে তিনি নির্মাণ করেছেন কালজয়ী আরবী কাব্যমালা, যা বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনায় পরিগণিত হয়। বিশটি ছোট বড় কাসীদার সমন্বয়ে মোট ১৬৪৪টি চরণযুক্ত তাঁর একমাত্র সাহিত্যকর্ম কাব্যসংকলন "দীওয়ান ইবনুল ফারিদ"গ্রন্থটির বিভিন্নভাষায় এবং বেশকিছু পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক এর ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনির কারণে আরব সূফী সাহিত্যাঙ্গণে এর মর্যাদা অনেকবৃদ্ধি পেয়েছে। ইবনুল ফারিদের দীওয়ানের কাসীদাগুলোর ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনী অনেক সনামধন্য ব্যাক্তিগণ করেছেন, যেমন: সিরাজ হি হানাফী, শামস বিস্তামী মালিকী, জালালকাযভীনী শাফি'ঈ ইত্যাদি। কবির তাইয়্যাহ কাসীদার ব্যাখ্যা করেছেন ফারগানী, কাশানী, কায়সারী ইত্যাদী ব্যাক্তিবর্গ। তাঁর খামরিয়্যাহ কাসীদাটির ব্যাখ্যায় অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যাক্তি এগিয়ে এসেছেন। তাঁর রচিত দীওয়ানের উপর বিভিন্নভাষায় প্রচুর গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হিলমী "ইবনুলফারিদ ওয়াল-হুব্বুল ইলাহী" শিরোনামে ও প্রফেসর ড. ফাদার জোসেফ স্কাতুলীন "ইবনুল ফারিদ ওয়া শি'রুহুস-সূফী" শিরোনামে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেছেন। ফলে, কবির দীওয়ানে অবস্থিত ২০টি কাসীদারই ব্যাখ্যা এখন পাওয়া যায়।

ড. শাওকী দায়ফ ইবনুল ফারিদের দীওয়ান সম্পর্কে বলেন:[৫৮]

وَدِيْـوَانُـه كُلُـه ُمِـنْ هَـذاَ الـطِـرَازِ انْـتِـشَـاءٌ وَسُـكْـرٌ وَحُـبٌ وَوَجْـدٌ وَوَلْـهٌ وَالْـنِـيَـاعُ.

"তাঁর দীওয়ানের সবকটি কবিতা একই ধরণের নেশা, মাদকতা, ভালবাসা, প্রফুল্লতা, আকৃষ্টতা ও রকমারিতায় পরিপূর্ণ।"

ইবনুল ফারিদের দীওয়ানের রচনাশৈলী ও কাব্যালংকার বর্ণনা করে জর্জ নিকোলাস আল-হ্যাগ বলেন:[৫৯]

"poet's style is attractive and extremely stimulating. His easy flow of versification is unmistakeable; his playing with ideas and images, and his intelligent use of figures of speech to serve his meaning, and to reach his goal, shows his mastery of the Arabic language. It is equally conspicuous to assume that with the exception of 'the Kamriyya' and 'The Poem of the Way', the bulk of Ibn al-Farid's Diwan should be read simply as love poetry void of any mystical and spiritual overtones."

কবি হিসাবে ইবনুল ফারিদের মর্যাদা ও তাঁর সূফী কবিতার শৈল্পিকমূল্যায়ন করে জর্জ নিকোলাস আরো বলেন:[৬০]

"Here, I think, lies one of the important points which contribute to the poet's fame and endurance, for he could, at the same time, satisfy both critics; those who recognize him purly as a mystical poet, and those who see him as a great love poet, perhaps the greatest 'Sultan al-Ashiqin'. No two critics would disagree that 'The Odes' retain the form, conventions, topics, and images of ordinary love poetry. Ibn al-Farid's Diwan may well be considered 'a miracle of literary accomplishments'."

ইবনুল ফারিদ বিশেষজ্ঞ ড. মুহাম্মদ মুস্তাফা হিলমীর মতে ইবনুাল ফারিদ সর্বেশ্বরবাদী(وحدة الوجود)তথা "আল্লাহ সব কিছুতেই আছেন এবং সব কিছুই আল্লাহ" এই বিশ্বাসী ছিলেননা; বরং তাঁর মতের ঝুঁকছিল ঐক্যসংযুক্তিরইত্তিহাদ(وحدة الشهود)-এর দিকে যা তাঁর সূফীকাব্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে পরিগণিত। এ প্রসঙ্গে ইবনুল ফারিদ বিশেষজ্ঞ প্রাচ্যবিদ প্রফেসর ড. ফাদার জোসেফ স্কাতুলীন তাঁর মিসরের আন্তর্জাতিক সেমিনারে উপস্থাপিত "عمر بن الفارض وحياته الصوفية من خلال قصيدته التائية الكبرى: دراسةتحليلية بلاغية" শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে বলেন:[৬১]

"فَنَحْنُ لَا نَعْتَقِدُ أن ابن الفارض كان تلميذاً لابن العربي أوتأثر به تأثراً مباشراً، ولكن أرجح احتمال عندنا أن كليهما استلهما أفكارهما من تراث صوفي سابق مشترك ومنتشر في الأوساط الصوفية في القرن السابع الهجري المقابل للقرن الثالث عشر الميلادي. إلا أن كليهما صوغا ذلك التراث حسب معاناتها الشخصية وأسلوبهما الخاص. فبني ابن الفارض صرحاً ضخماً من الأفكار والتأملات الفلسفية الصوفية في حين نظم ابن الفارض قصيدة فريدة نسج فيها بين عمق المعاناة الصوفية وروعة الأداء الفني.

আমেরিকার নিউয়র্কের রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম বিভাগের প্রফেসর ড. থোমাস এ্যমিল হোমারিন বিখ্যাত আরব সূফী কবি ইবনুল ফারিদের উপর বিস্তারিত ও গভীর অনুসন্ধান চালিয়ে তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন:[৬২]

"Regarded as a saint within a generation of his death, 'Umar Ibn al-Farid (1181-1235) is still venerated at his shrine in Cairo. Contemporary religious singers and writers, including Nobel laureate Naguib Mahfouz, continue to cite the poet's verse. Using biographies, hagiographies, polemics, legal rulings histories, and novels, Homerin traces the course of Ibn al-Farid's saintly reputation. He relates the rise and fall of Ibn al-Farid's popularity to Egypt's changing religious, cultural, and political environment…No dout the poetic imagination, Sufi or not, is nurtured by the cumulative tradition and metaphors of previous poets; Sufi commentators find the ecstic experience in Ibn al-Farid's poetry, and Naguib Mahfouz's novel draws on the power of Ibn al-Farid's imagery".

সূফী কবি ইবনুল ফারিদ হিজরী ৭ম শতকের সূফী কুতুবদের সর্বশেষ কুতুব। তিনি সুলতানুল আশিকীন ও ইমামুল মুহিব্বীন খিতাবেও ভূষিত। ৭৬১ চরণে তাঁর রচিত তাইয়্যাহ কুবরা কাসীদাটি, ফরাসী, ইংরেজী, স্পেয়ানিসসহ অনেক বিদেশী ভাষায় অনুদিত হয়েছে। নিকলসন তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন করে বলেন:[৬৩]

لم يقم في العرب قبل ابن الفارض مثيل ولم يعرف بعده ضريب

"ইবনুল ফারিদের পূর্বে আরবে তাঁর সদৃশ কারো অবস্থান ছিলনা এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিল বলে আমাদের জানা নেই"। সূফী কবি হিসাবে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে এবং তাঁর পদবী সুলতানুল আশিকীন (প্রেমিকদের যুবরাজ) সম্পর্কে অনেক বিজ্ঞ লেখক ও সমালোচক বলেন:[৬৪]

The most striking appellation (পদবী, খেতাব) belongs to the Sufi poet Ibnul Farid as Sultan al-'Ashiqin or the 'Prince of the Lovers'. This may be explained by the fact that Ibn al-Farid was regarded by many authorities on Sufism, as the greatest and finest poet to write mystic poetry in Arabic. Ibn al-Farid gives clues as to the workings of his mind within his poetry. Ibn al-Farid utilises ambiguous and allegorical languages. He justifies his use of allegorical language where the plain words are not capable of conveying the desired meaning as he says:[৬৫]

أشَرْتُ بما تُعطيْ العبارةُ، والذي تغطي فقد أوضحتُهُ بلطيفةِ

ولـيس ألستُ الأمسِ غيرا لمن غدا، وجنحي غدا صُبحي ويوميَ ليلتي

"I have indicated (the truth concerning phenomenal relations) by the means which language yields, and that which is obscure I have made clear by a subtle

allegory; The "Am not I" of yesterday is not other (than what shall be manifested) to him who enters on to-morrow, since my darkness has become my dawn and my day my night".

ইবনুল ফারিদ বিরচিত কবিতা অন্যদের চাইতে ব্যতিক্রমধর্মী

অন্যান্য সূফী কবিদের তুলনায় ইবনুল ফারিদ একজন মৌলিক ও অদ্বিতীয় কবি। বর্তমান কাঠামো ও ধারণা ব্যবহারের কারণে কবি হিসাবে ইবনুল ফারিদের শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত আছে। তবে একজন সূফীকবি ও সাধক হিসাবে তাঁর শ্রেষ্টত্ব তাঁর বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল নয়, কারণ বাস্তবে তিনি একজন মৌলিক চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন না। তবে, তিনি ধর্মীয় সীমারেখার আওতায় ব্যাপকহারে ধর্মনিরপেক্ষ আরবী কাব্যের ঐতিহ্যগুলো তাঁর রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে বিধায় তিনি একজন প্রতিভাবান কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁর সময় সূফী সম্প্রদায় তাঁদের আধ্যাত্মিকপ্রেম প্রকাশের জন্য আরবী প্রেমকাব্যকে তাঁদের ব্যবহারের আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন: আরবী রোমান্টিক প্রেমকাব্যে লায়লী ও মজনুকে পেমিকদের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, যা মহান আল্লাহপ্রেমে বিলীন হওয়ার প্রতীক হিসাবে সূফীগণ ব্যবহার করেছেন। ইবনুল ফারিদসহ সকল সূফীপ্রেমকাব্যের ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁদের আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে সক্ষম। ইবনুল ফারিদ যেখানে তাঁর কাঙ্খিত অর্থ পূরণ হচ্ছেনা সেখানে তিনি রূপক ও প্রতীক অর্থ ব্যবহার করেছেন। যেমন, কবি বলেন:[৬৬]

فأوهمتُ صحبي أن شُرْبَ شرابهم، به سُرُسريْ، في انتشائي بنظرةِ
وبالحدق استغنيت عن قدحي، ومن شمائلها، لامن شمولي، نشوتي

"And in my drunkenness, by means of a glance I caused my comrades to fancy that it was the quaffing of *their* wine that gladdened my soul; Although mine eyes made me independent of my cup, and my inebriation was derived from her qualities, not from my wine".

ইবনুল ফারিদের কবিতায় যুহুদ ও সূফীতত্ত্বের প্রভাব

কবি ইবনুল ফারিদ দুনিয়াবিমুখ কবিই ছিলেননা, তিনি দুনিয়াবিমুখ যুহুদকবি ও আধ্যাত্মিকসাধক সূফীকবিও ছিলেন। তিনি শুধু যুহদ কবিতাই রচনা করেননি, তিনি তার বাস্তবজীবনেও এর প্রতিফলন ঘটান। তিনি দুনিয়ায় বিখ্যাত হওয়ার কোন চেষ্টা করেননি, বরং তিনি বহুবৎসর লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিলেন। আল্লাহরসন্তুষ্টি লাভের বাসনায় তিনি স্বেচ্ছায় আত্মার সাথে সংগ্রাম করে নিজেকে তারই পথে উৎসর্গ করেছেন। লোকালয় ছেড়ে পাহাড়ে, পর্বতে, উষ্ণ মরুঅঞ্চলে তিনি মহান স্রষ্টার রহস্য উদঘাটনে ঘুরে বেড়িয়েছেন। শারিরীকগঠনে তিনি দুর্বল হলেও কবিতায় প্রতীকীঅর্থ ব্যবহারে ও আত্মিকশক্তিতে বলিয়ান তিনি একজন উঁচুমানের ব্যতিক্রমধর্মীকবি ছিলেন। তিনিতাঁর এই ধী শক্তি সপ্নের মাধ্যমে নিম্নের কবিতা চরণদুটো রচনা করেছেন:[৬৭]

وَحَـيَــاةِ أَشْــوَاقِــيْ إِلَيْـ ـكَ وَتُـرْبَـةِ الصَبْـرِ الجَـمِـيْــلِ
مَــاسْتَحْسَنْتْ عَيْنِي سِوَا كَ وَلاَ صَبَــوْتُ إِلَــى خَلِـيْـــلِ

"তোমার প্রতি আমার জীবন্ত ঐচ্ছিক কামনা ও পবিত্র মাটির(মাকবারা) ধৈর্যের শপথ! তুমি ছাড়া আমার নয়ন কাউকে সুন্দও মনে করেনা এবং বন্ধু বলে কাউকে কামনা করেনা।"

ইবনুল ফারিদ সুলতানুল আশিকীন বা প্রেমিকসূফী কবিদের সম্রাট উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন:[৬৮]

فُـقْـتَ أَهْـلَ الْـجَـمَـالِ، حُسْنًـا وَحُـنْـنَـى،   فَـبِـهِــمْ فَــاقَـــةٌ إِلَـى مَـعْـنَـاكَـا
يُـحْشَـــرُ الـعَـاشِـقُـوْنَ تَـحْـتَ لِـوَائِـيْ،   وَجَـمِـيْـعُ الْـمِـلاَحِ تَـحْـتَ لِـوَاكَــا

"তুমি সৌন্দর্য ও মহানুভবতায় নান্দনিক জনতাকে অতিক্রম করেছ; সুতরাং তোমার সুপ্তসত্য ও গুণের প্রতি তাদের অতিব প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সকল আল্লাহপ্রেমিক শেষ বিচারেরদিন আমার (আত্মার) পতাকা তলে একত্রিত হবে এবং সকল সুন্দরজনতা তোমার (রব্বানী তাজাল্লীয়াতের) পতাকা তলে একত্রিত হবে।"

সূফী কবিতার ভাষায় রূপক ও কাল্পনিক অর্থের ব্যবহার

কালের প্রবাহে আরবী সূফী কবিতা বিভিন্ন রং ও রূপে আবির্ভূত হয়ে প্রশংসা, শোকগাঁথা, কুৎসা, প্রেম, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়বস্তুতে বিকশিত হয়েছে। সূফী সমাজের বিকাশ ধারায় আল-বুহতুরী, আল-মুতানাব্বী, আল-মা'আর্‌রী প্রমুখ কবিদের সাহিত্যের চাইতে মহান আল্লাহপ্রেমের কাব্য নামো উন্নত ও সন্মানজনক সাহিত্য বিকশিত হয়েছে। এপর্যায়ে ড. যকী মুবারক বলেন:[৬৯]

"إي والله! كان للصوفيَّة أدبٌ وهو أعلى وأشرف من أدب البحتري والمتنبي وأبي العلاء، ولكن طافت بالنفس طائفة من الجهل؛ فتوهّموا أن لا صِلة بين الأدبِ والدين، وراحوا يقفون فيما يتخيرون عند الكتاب والشعراء الذين ألفوا الروح المدنية، واتخذوا غذائهم من الكؤوس المترعة، والوجوه الصباح".

সকল বিতর্কের উর্দ্ধে থেকে ইবনুল ফারিদ আরবী কাব্যে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামী আরবী সূফীকবি ছিলেন। তিনি শুধু একজন কবিই ছিলেন না, বরং তিনি একজন কুতুবও ছিলেন। এসম্পর্কে পল স্মিথ বলেন:[৭০]

"He is not only a poet but a Perfect Master (Qutub) a God-realized soul, and it is his journey to unity with God he reveals in probably the longest qasida (ode) in Arabic (761 couplets), his famous The Mystic's Progress. The other poem for which he is most known is his Wine Poem".

সমকালীন কবিদের মাঝে আবুল 'আতাহিয়্যার স্থান

আবুল আতহিয়্যা তাঁর অনন্য সাধারণ কাব্য প্রতিভা যথাযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে আরবী সাহিত্যে এমন এক স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন যা তাঁর জন্যই সংরক্ষিত ছিল। সহজ-সরল-স্বাভাবিক লিখন ভঙ্গি ও বিষয়বস্তু

নির্বাচনের গভীর চিন্তন শক্তি তাঁকে এ স্থানে সমাসীন করে। ফারসী সাহিত্যে শায়খ সাদীর যে স্থান আরবী সাহিত্যে আবুল আতহিয়্যার সেই স্থান। তাঁর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতি কবি আবু নুওয়াস। ভনক্রেমারের মতে, আবুল 'আতাহিয়্যার কাব্য-প্রতিভা আবু নুওয়াস অপেক্ষা অধিকতর ছিল। আবুল 'আতাহিয়্যা আরবী সাহিত্যের প্রথম দার্শনিক কবি। কিন্তু দার্শিনিক ভাবাপন্ন হলেও তাঁর কাব্যে ইসলামী ভাবধারা মতাদর্শ ও ধর্মনিষ্ঠা সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা রয়েছে। কাজেই তাঁর কাব্য সহজেই মুসলিম হৃদয় স্পর্শ করে থাকে। তাঁর কাব্যের মনোরঞ্জন ও চিত্তবিনোদন শক্তি উপলব্দি করলে প্রতিয়মান হবে যে, তাঁর পবিত্র ভাবধারা, মার্জিত রুচি, সরল ভাষা ও মধুর ছন্দের দিক দিয়ে তাঁর দিওয়ানই সবার নিকট শ্রেষ্ঠতম মনে হবে। তাঁর কাব্য প্রকৃতপক্ষে সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নয়। বরং তা প্রশস্ততর, উচ্চতর ও মহত্তর। এাঁ মানব জীবন ও দৈনন্দিন সত্যসমূহের মনোরম অভিব্যক্তি, মানুষের ভাব-চিন্তা, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার একটি সুন্দর বিকাশ। মানবের গহীন অনুভূতি কবি আবল 'আতাহিয়্যার ছন্দে মূর্ত হয়ে ধরা দিয়ে থাকে। মানুষের হাঁসি-কান্না, সুখ-দুঃখের ইতিহাস কবির বাঁশির সুরে গুঞ্জরিয়ে উঠে। এ কষ্টি পাথরে যদি আমরা আবুল 'আতাহিয়্যার কাব্য বিচার করি তাহলে আমাদেরকে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হবে যে, আবুল 'আতাহিয়্যা একজন উচ্চ শ্রেণির কবি। আরব-আজমে তাঁকে যে সমাদর ও সম্মান দেয়া হয়েছে তিনি তার প্রকৃত হকদার।[৭১]

সমকালীন কবিদের মাঝে ইবনুল ফারিদের স্থান ও তাঁর কাব্যপ্রতিভা

ইবনুল ফারিদের রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্যেও আলোকে সূফী কবি ও সমকালীন কবিদের মাঝে তাঁর স্থান নির্ণয় তরা যেতে পারে।তাঁর রচিত শৈল্পিকরূপ কবিতায় তাঁর বাস্তব অবস্থা ও অভিজ্ঞতার প্রকৃত প্রতিফলন হয়েছে। তাঁর কবিতা শৈল্পিক ও সূফীতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিপূর্ণ রচনা। ইবনুল ফারিদের গবেষকদের বিচারে তিনি আরবী কবিতায় তা'ইয়্যা কুবরা ও সুগরা কলার একজন অবিজ্ঞ ও বিদগ্ধ শিল্পী যাকে অনুসরণ করে পরবর্তী কবিগণ অনুরূপ কবিতা রচনা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর সময়ের সূফী কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন: মুহী উদ্দীন ইবনুল আরাবী (মৃ.৬৩৮/১২৪০), আবূ ইসহাক আল-ওয়া'ইজ(মৃ.৬৮৭/১২৮৮), আবূ হাফস আস-সুহরাওয়ার্দী (মৃ.৬৩২/১২৩৮) এবং তাঁর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন: ইনুন নাবীহ আলমিসরী (মৃ.৬১৯/১২২২),ইব্নসানা' আল-মুলক(মৃ.৬০৮/১২১১), ইব্ন মাতরূহ(মৃ.৬৪৯/১২৫১), বাহা উদ্দীন যুহায়র(মৃ.৬৫৬/১২৫৮) এবং লেখক, সাহিত্যিক ও লিপিকারদে মধ্যে ছিলেন কাজী আল-ফাদিল(মৃ.৫৯৬/১১৯৯)।[৭২]

আরবী সূফীকাব্য ধারার কবিদের মধ্যে ইবনুল ফারিদ তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তিনি ক্রুসেড যুদ্ধ, ফরাসীদের স্পেইন দখল এবং মঙ্গলদের প্রাচ্যদেশ অক্রমণের সময় বাহ্যতঃ এক প্রকার অসম জীবনযাপন করেছিলেন। ফাতিমীশাসন পতনের দশ বছর পর মিসর নগরী পুনরায় সালাহুদ্দীন ও তাঁর পরিবারের

লোকদের শাসনাধীনে চলে আসে। তিনি তাঁর পিতা ও দাদার ন্যায় সিরিয়ার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম সূফী শেখ পরিবারের লোক ছিলেন এবং বাল্যকাল থেকে মিসরে সূফীপথ অনুসরণ করেছেন। তিনি ইসলামী আইন ও হাদীসের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সময়ে প্রচলিত ও নির্দিষ্ট কোন সূফী পথের তিনি সরাসরি অনুসারী ছিলেন না। তবে তিনি কখনো কখনো শাফি'ঈ মতাবলম্বী ও নিরবে জীবন সম্পর্কে অধ্যয়নকারী একজন চিন্তাশীল আল্লাহপ্রেমিক কবি ছিলেন। যুগের অন্যান্য কবিদের ন্যায় তিনি কোনো রাজা-বাদশাহর দরবারে গমন করেননি এবং কবিতার মাধ্যমে তাঁদের কোনো প্রশংসাও করেননি। তিনি যৌবনে মিসরের চার দিকের পাহাড়-পর্বত ও মরূ অঞ্চলে নিরবে গমন করতেন এবং মিসরের আল-আজহার কেন্দ্রীয় মসজিদে আরবী কবিতার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাপন করতেন। ফলে তিনি প্রাচীন ধারার আরবী কবিতা রচনায় একজন প্রতিভাবান পারদর্শী কবি হয়ে গড়ে উঠেন। ৩৫ বছর বয়সে তিনি মিসরে শেখ আবুল হাসান আল-বাক্কাল নামক এক রহস্যময় সবজী বিক্রেতা সূফীর সন্ধান লাভ করেন এবং তাঁর অনুপম বাস্তব কৃপায় তিনি পবিত্র মক্কায় ভ্রমণের দীশা অর্জন করেন। মক্কায় গমন করে তিনি সেখানে ১৫ বছর অতিবাহিত করেন।[৭৩]

ইবনুল ফারিদের সূফী কবিতা ও কাব্যপ্রতিভার তুলনা

ইবনুল ফারিদ বিরচিত কবিতায় শৈশব ও কিশোরকালের চিত্র, নানারঙ্গ ও বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ রয়েছে। তাঁর কাব্যে মহান আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রেমাধিক্য ব্যাপক স্থান পেয়েছে। ইবনুল ফারিদের যুহদ ও সুফীতত্ত্বের ক্ষেত্রে অবদান হিসাবে শুধু তাঁর রচিত একটি কবিতা সংকলনগ্রন্থ তথা দীওয়ান ইবনুল ফারিদ রয়েছে। তাতে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হিসাবে তাঁর সূফীতত্ত্বের বিষয়গুলোর অবস্থান রয়েছে। আখিরাতের বিষয়বস্তুকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে আখিরাতের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ। আখিরাতের সফলতাই প্রকৃত সফলতা। তিনি সকল কিছুর উপর আল্লাহর প্রেমকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। শারীরিক ও বাহ্যিক প্রেমের পরিবর্তে তিনি আত্মিক ও আধ্যাত্মিক প্রেমকে বেছে নিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন আল্লাহপ্রেমই মানুষের প্রধান ইবাদত। পার্থিব খ্যাতি অর্জনের পেছনে তিনি কখনো প্রতিযোগী হননি, বরং খ্যাতিই তাঁর পেছনে দৌঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। কোনো-শাসক সুলতান অথবা কোনো রাজা-বাদশাহর দরবারে তিনি গমন করেননি। এমনকি তিনি তাঁদের কারো প্রশংসায়স্তুতিকবিতা রচনা করেননি। রাজা-বাদশাহগণ তাঁর দরবারে আসতে চাইলেও, তিনি অনুমতি দেননি। ইবনুল ফারিদের অবস্থান ফার্সী সূফীকবি মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর (হি.৬০৪-৬৭২/খ্রি.১২০৭-১২৭৩) পরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।[৭৪]

পাদটীকা ও তথ্যনির্দেশিকা

১ ‘আবদুল হক ফরিদী, “আবুল ‘আতাহিয়্যা”, সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৫/২০০৫), খ.২, ২য় সংস্করণ, পৃ.১০৮-৯; আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী (কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, ১৩৬৯/১৯৫০), খ.৪. পৃ.১-১৫।

২ কিতাবুল আগানী, খ.৪. পৃ. ১৩; আবুল ‘আতাহিয়্যা, দওিয়ান, সমপাদনা, করম আল-বিস্তানী (বৈরূত: দারু বৈরূত, ১৪০৬/১৯৮৬), ভূমিকা. পৃ. ৯।

৩ আবদুল হক ফরিদী, “আবুল ‘আতাহিয়্যা”, ইসলামী বিশ্বকোস, খ.২, পৃ. ১০৮-১২; ইকিতাবুল আগানী, খ. ৪, পৃ. ১৫-৫০।

৪ Dr. Najah ‘Attar, Abu'l ‘Atahiyya His Life and His Poetry(London:Edinburgh University, 1958 A D), p.32-9.

৫ ড. শুকরী ফায়সাল, আবুল ‘আতাহিয়্যা অশ‘আরুহু ওয়া আখবারুহু(দামিশক: মাতবা‘অ জামি“আ দামিশক, ১৩৮৪/১৯৬৫), পৃ.২৩-৩১।

৬ ইব্ন ‘আবদিল বার্‌র আল-কুরতুবী, আল-ইহতিবাল বিমা ফী শি‘রি আবিল ‘আতাহিয়্যা মিনাল হিকামি ওয়াল আমছাল(আবু জাবী: সংযুক্ত আরব আমিরাত : আল-মাজমা‘উছ ছাকাফী, ১৪৩০/২০০৯), ১ম সংস্করণ, পৃ.৭-৩০।

৭ ড. শুকরী ফায়সাল আবুল ‘আতাহিয়্যা আশ ‘আরুহু ওয়া আখবারুহু, পৃ. ২৩-৩১; কিতাবুল আগানী, খ.৪, পৃ. ১-১১২।

৮ কিতাবুল আগানী, খ.৪, পৃ. ৩০-৫০; আবুল ‘আতাহিয়্যা, দীওয়ান, ভুমিকা, পৃ. ৫-১০।

৯ কিতাবুল আগানী, খ. ৪, পৃ. ২০-২৫।

১০ কিতাবুল আগানী, খ.৪, পৃ. ৫৫-৮০।

১১ কিতাবুল আগানী, খ.৪, পৃ. ৭১-৭২।

১২ আবুল ‘আতাহিয়্যা, দীওয়ান, ভুমিকা, পৃ. ৫-৭।

১৩ কিতাবুল আগানী, খ. ৪, পৃ. ১২-১৩।

১৪ প্রাগুক্ত, পৃ.১১-১২।

১৫ আবুল ‘আতাহিয়্যা, দীওয়ান, পৃ. ৪১২।

১৬ কিতাবুল আগানী, খ. ৪, পৃ. ১০-১১।

১৭ আবুল ‘আতাহিয়্যা, দীওয়ান, পৃ. ৩৪৬।

১৮ কিতাবুল অগানী, খ. ৪, পৃ, ২৪, ৬৫-৭৪।

১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

২০ আবুল ‘আতাহিয়্যা, দীওয়ান, পৃ. ৩১৬; কিতাবুল আগানী, খ.৪, পৃ. ১০৫।

২১ ড. মুজতাবা রহমান দোস্ত, “আবুল ‘আতাহিয়্যা হায়াহুহু ওয়া শি‘রুহু”, মাজাল্লাতুল লুগাতিল ‘আরাবিয়্যা ওয়া আদাবিহা, তিহরান: বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪২৬/২০০৫, সংখ্যা, ১‘, ১ম বর্ষ, পৃ.৪৯-৬৪।

২২ আবুল ‘অতাহিয়্যা, দীওয়ান, পৃ. ৪৫৮; কিতাবুল আগানী, খ. ৪, পৃ. ৬৫।

২৩ কিতাবুল আগানী, খ. ৪, পৃ. ৫০-১১২;

২৪ প্রাগুক্ত।

২৫ প্রাগুক্ত ।

২৬ কিতাবুল আগানী, খ. ৪, পৃ. ১০-১১২।

২৭ ‘আবদুল হক ফরিদী, “আবুল ‘আতাহিয়্যা”, সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.২, পৃ. ১০৮-১২।

২৮ কিতাবুল আগানী, খ. ৪, পৃ. ১০-১১২।

২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-১০০।

৩০ আখবার আবী নুওয়াস, (কায়রো: মাতবা‘আ মিসর, ১৩৭৩/১৯৫৩), পৃ.৭৪-১১৫।); Dr. Najah ‘Attar, Abu'l ‘Atahiyya His Life and His Poetry (London: Edinburgh University, ১৯৫৮ A D), p.৩২-৯.

৩১ আবুল ‘আতাহিয়্যা, দীওয়ান, পৃ.৪৭।

৩২ আবদুল হক ফরিদী, “আরব কবি আবুল ‘আতাহিয়্যা”, মাসিক মুহাম্মদঅ, ঢাকা, ১৩৩৪ বাং. ১ম বর্ষ, সংখ্যা, ৫।

৩৩ আবুল ফরাজ আল-ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী, খ.৪, পৃ. ১-১১২।

৩৪ Dr. Najah ‘Attar, Abu'l ‘Atahiyya His Life and His Poetry, pp.১৪৩-২৩৬।

৩৫ আবদুল হক ফরিদী, “আবুল ‘আতাহিয়্যা”, ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.২, পৃ. ১০৮-১২; কিতাবুল আগানী, খ. ৪, পৃ. ১০-১১২।

৩৬ প্রাগুক্ত।

৩৭ ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী(কায়রো: দারুল মা‘আরিফ, ১৯৮৫ খ্রি.)।

৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ.

৩৯ প্রাগুক্ত।

৪০ আল-কুর’আন, ৫১:৫৬।

৪১ আল-কুর’আন, ৬৮:৪।

৪২ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ১৫৪; ড. মুস্তফা হিলমী, ইনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ.১৭৭।

৪৩ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ১৪০।

৪৪ ড. মুস্তফা হিলমী, ইনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ. ৪৮।

৪৫ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ১৮৪-২০৫।

৪৬ ‘উমর মূসা পাশা, আল-আদব ফী বিলাদিশ শাম (কায়রো: মাতবা‘আ মুকতাতাফ, ১৯০৩খ্রি., পৃ. ১৫৫-৬৫৬।

৪৭ ড. মুস্তফা হিলমী, ইনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ. ৫০-৫-৮।

৪৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৮।

৪৯ থোমাস এমিল হোমারিন, *Umar Ibn alFarid; Sufi Verse, Saintly Life* (New York : Paulist Press, 2011), PP. 23-250.

৫০ The Mystical Experience of Umar Ibn al-Farid, or the realization of self (ana, I), the Poet and his mystery", The Muslim World, (July-October, 1992), V.82; ইবনুল ফারিদ ওয়া হায়াতুহুস সূফীয়্যা।

৫১ ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ. ২২১-৩২।

৫২ ড. সাদ্দাম ফাহাদ আল-আসাদী, "তামাহিয়্যাতু রুহিয়্যা ফী শি'রি ইবনিল ফারিদ", আল-মুছাক্কাফ পত্রিকা, ২০১৭ খ্রি. সংখ্যা, ৩৩।

৫৩ George Nicholas El-Hag, "Ibn al-Farid's Khamriyya or Ode on Wine", The Journal of Arab e Language, Literature and Culture, Columbia University press, December, 13, 2016 AD, pp.1-126.

৫৪ ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ. ৪৫-৮১।

৫৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৭০।

৫৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-১১০।

৫৭ 'উমার ফর্‌রূখ, তারিখুল আদাবিল 'আরাবী, খ. ৩, পৃ. ৫২১।

৫৮ ড. শাওকী দায়ফ, তারিখুল আদাবিল 'আরাবী, মিসর (কায়রো: দারুল মা 'আরিফ, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৩৬০।

৫৯ George Nicholas El-Hag, "Ibn al-Farid's Khamriyya or Ode on Wine, pp.1-126.

৬০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১-১২৬।

৬১ ড. জোসেফ স্কাতুলিন, "উমার ইবনুল ফারিদ ওয়া সহায়াতহুস সূফীয়্যঅ", পৃ.১-৩৪।

৬২ Th. Emil Homerin, From Arab Poet to Muslim Saint, p.27, 96-97.

৬৩ R A Nicholson, Studies in Islamic Mysticism, The Odes of Ibn al-Farid, pp.162-266.

৬৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২-২৬৬।

৬৫ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ৯২-৩।

৬৬ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ৪৬।

৬৭ ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ. ৭৮-৮১; ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ১৮২।

৬৮ ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান, পৃ. ১৫৯।

৬৯ ড. যকী মুবারক, আত-তাসাওউফ ফিল আদাবিল ইসলামী (কায়রো : মু'আস সাতু হান্দভী, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৪১-৪২।

৭০ Paul Smith, Introduction on his Life & Times & poems & his Museum, 2017. Website: www.newhumanitybooks.com

৭১ ফারাজ আল-ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী, খ. ৪, পৃ. ১-১১২; 'আবদুল হক ফরীদী, "আবুল "আতাহিয়্যা", ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১০৮-১২।

৭২ ড. উমার মূসা পাশা, আল-আদব ফী বিলাশি শাম, পৃ. ১৫৫-৬৫৬।

৭৩ ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ. ৪২-১০২।

৭৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-১০২।

উপসংহার

অরবী কাব্যরচনার সকল যুগেই কবিতা সংশিষ্ট জাতির জীবনদর্পন হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। বাগদাদের আব্বাসীয় ও সিরিয়-মিসরের আয়্যুবীয় আব্বাসী যুগেও সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতির সামগ্রিক চিত্রায়ন আরবী কবিতায় সফলভাবে ফুটে উঠেছে। সে সময় গোত্রীয় অহমিকা ও গোত্র প্রীতি না থাকায়, গোত্রীয় গৌরবগাথাঁ রচিত না হলেও শাসকদের সহযোগিতা ও সক্রিয় পৃষ্টপোষকতার ফলে শাব্দিক ও আলংকারিক রূপে রাসূলুলাহর (স).-এর প্রশংসা, রাজ বংশের শাসকদের বন্দনায় ও সূফী সাধকদের তত্ত্বজ্ঞানকে কেন্দ্র করে আধ্যাত্মিক, সামাজিক, শোকগাঁথা, প্রেমগাঁথা, বীরগাঁথা প্রভৃতি রীতি-নীতি এবং গঠনপ্রকৃতির রূপেও আকৃতিতে কাব্যচর্চা হয়। এই সময় প্রবাহমান ক্রুসেড যুদ্ধসহ মিসর ও সিরিয়ার বড় বড় ঘটনাবলী আরবী কবিতার উপজিব্য হিসাবে স্থান পায়। সিরিয়া ও মিসরে আয়্যুবী সুলতানদের মধ্যে রাজনৈতিক অবস্থার চড়াই উতরাই বিরাজ করলেও তাঁদের বিশাল সাম্রাজ্যের কবিগণ তাঁদের বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের বর্ণনা ও প্রশংসা করে কবিগণ কবিতার বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক কাব্য রচনা করেছেন। কবিগণ কখনো পূর্ববর্তী যুগের কবিদের সম্পূর্ণ অনুসরণ করে, আবার কখনো সম্পূর্ণ নতুন রূপালংকার, ভাব, গঠনরীতি ও অকৃতিপ্রকৃতিকে পুঁজি করে, আবার কখনো দুই এর সমন্বয়ে অতি উন্নত মানের ও নিম্নমানের কবিতা রচনা করেছেন। এই যুগের রচিত কবিতাগুলো গঠনপ্রকৃতি, রূপবৈশিষ্ট্য, লক্ষ্যউদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর মানের দিক দিয়ে আব্বাসীয় সোনালী যুগের সমকক্ষ নাহলেও সেইযুগের কবিদের রচিত কবিতার তুলনায় এই যুগের কবিদের রচিত কবিতা কখনো পিছিয়ে ছিলো না।

আরবী পদ্য সাহিত্য দেড় হাজার বছরেরও অধিক সময়ের আরব সভ্যতার ঐতিহ্য ও জীবনবোধের শিল্পায়িত একটি অভিব্যক্তি। এ সুদীর্ঘ চলার পথে আরবদের জীবন শত ধারায় প্রবাহিত হয়। ধারা প্রবাহের এ বহুমাত্রিকতা আরবী পদ্য সাহিত্যে যেমন এনে দিয়েছে বৈচিত্র্য তেমনি করেছে একে সমৃদ্ধ। কোন এক সময় বেদুঈন বেশে আরব কবিগণ তাদের মনের কথা রসসিক্ত-সরল অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ বর্ণনায় উচ্চারণ করেছেন। আব্বাসীয় যুগের শেষ প্রান্তে অথবা তারো অব্যবহিত পরে এসে আয়্যুবী-মামলূকী রাজবংশদ্বয়ের সুলতানদের শাসনামলে কাব্যসাহিত্যের মাধ্যমে কবিগণ সুন্দরতম শৈল্পিক রূপকে অনায়াসে নির্মাণ করেছেন। প্রাচীন কাল থেকেই আরবী ভাষাতেই কবিতার মাধ্যমে সাহিত্যের প্রথম উন্মেষ ঘটে। আর আরবী কবিতা আরবী সাহিত্যেরই একটি প্রধান শাখা। আরবী ভাষা সামী ভাষা গোষ্ঠির পরিবারভুক্ত। জাহিলী যুগে বৃহত্তর আরবের অধিবাসীরা যে আরবী ভাষায়

কথা বলতো তা সমস্ত আরবী উপভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম, আর সেই ভাষাই আসল আরবী ভাষারূপে পরিচিত। মিসর ও সিরিয়ার আয়্যূবী সুলতান ও শাসকবৃন্দ তুর্কী-কুর্দী বংশোদ্ভুত হলেও তাঁরা আরবী ভাষায় কথা বলতেন এবং ব্যাপক হারে এই ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতেন। তাঁদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় আরবী কাব্যচর্চা মন্থর গতিতে চললেও তা আব্বাসীয় কাব্য রচনার ধারায় অব্যাহত থাকে। খৃষ্টীয় ১২শ শতকের মাঝামাঝি সময় হতেই বিশেষ করে আয়্যূবী-মামলূকী সুলতানদের রাজত্বের (১১৮২-১৫১৬খৃ.) সাড়ে তিনশত বছরের মধ্যে মিসর ও সিরিয়ার আরবী কবিতায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকারী শক্তির দল এবং সূফীপন্থি কবিগণের দল নামে দু'টি কাব্যধারাশক্তি আত্মপ্রকাশ করে, যা সেখানকার কবিদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। এ উভয় আন্দোলনই সুন্নী মতাবলম্বী সালজূক সুলতানদের(১০৩৭-১৩০০খৃ.) অধীনে ফাতিমী 'আলবী শী'আদের বিপরীতে পরিচালিত এবং সাহিত্যিক পূণর্জাগরণের সঙ্গে সংশিষ্ট ছিল। আরবী কবিতার আকৃতি-প্রকৃতি ও স্বরূপের এই পুর্ণজাগরণ সালজূক সুলতানগণের অধীনে ইরাকে এবং যাঙ্গী, আয়্যূবী ও মামলূকী রাজবংশগুলোর সুলতানদের শাসনামলে সিরিয়া ও মিসরে বিস্তার লাভ করে। জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের প্রধান বাস্তব বিষয় ছিল সাহিত্যিক শিক্ষাদীক্ষা ও কাব্যচর্চাকে ক্রমান্বয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া, যা আয়্যূবী যুগে ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

বাগদাদ, মিসর ও সিরিয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও অবস্থায় কবিগণ স্থানীয় পরিবেশ ও অবস্থাকে উপজীব্য করে এবং আরবী কবিতার বিভিন্ন লক্ষ্যউদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর আলোকে কবিতার গঠনপ্রকৃতি ও স্বাভাবিকরূপের মধ্যে কিছুটা বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন এনে তাঁরা কবিতা রচনা করেছেন। সিরিয়া ও ইরাকের আতাবেকদের কুর্দিস্থানের অধিবাসী শাসক ইমামুদ্দীন যঙ্গীর মনোনীত জনৈক কুর্দী সর্দার সালাহ উদ্দীনের পিতা আয়্যূব ইবন শাযীকে তাঁর পক্ষ থেকে সিরিয়া অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করে পাঠান। কালক্রমে আয়্যূব একজন বড় নেতা ও দক্ষ প্রশাসক হিসাবে পরিগণিত হন। তাঁর ছেলে সালাহ উদ্দীন আয়্যূবী এবং ভাই আসাদ উদ্দিন শেরকূহও যঙ্গী সুলতানদের দক্ষ প্রশাসক হিসেবে আস্থাভাজন হন। ইমামুদ্দীন যঙ্গীর মৃত্যুর (মৃ.৫৪১/১১৪৬) পর তাঁর পুত্র নুরুদ্দীন মাহমূদ(মৃ.৫৬৯/১১৭৩) সিরিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শেরকূহকে সিরিয়ার হিমস্ ও রাহবা অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করেন। শেরকূহের যোগ্যতা ও কৃতিত্ব দেখে নুরুদ্দীন তাঁকে নিজের প্রধান সেনাপতি করেন। নূরুদ্দীন যঙ্গী শেরকূহকে মিসর অভিযানে পাঠানোর সময় শেরকোহের ভ্রাতুস্পুত্র সালাহ উদ্দীন ইবন আয়্যূবকেও মিসরে প্রেরণ করেন। ফাতিমী খলীফা 'অযিদ উবায়দীর মৃত্যুর পর সালাহউদ্দীন আয়্যূবী ৫৬৪/১১৬৮ সালে মিসরের সিংহাসন দখল করে সেখানে আব্বাসী খলীফার নামেমাত্র অধীনে স্বাধীন আয়্যূবী রাজত্বের গোড়াপত্তন করেন। তারপর অল্প

সময়ের মধ্যেই তাঁর রাজত্ব মিসর, সিরিয়া, দিয়ারে বাকর, ইয়ামান ও হিজায অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। অতপর মিসর ও সিরিয়ায় ৬৪৮/১২৫০ সাল পর্যন্ড় তাঁর বংশের রাজত্ব স্থায়ী হয়। সুলতান সালাহ উদ্দীনের মৃত্যুর(মৃ.৫৮৯/১১৯৩) পর তাঁর বংশের বিশাল রাজত্ব কয়েকটি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে যায়।

সালাহ উদ্দীন আয়্যুবীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বিশ্বকে খৃষ্টানদের হামলা ও আধিপত্য থেকে মুক্ত করা। এই মর্মে তিনি সকল ইসলামী শক্তিকে একত্রিত করেন এবং মিসর ও সিরিয়ার সামরিক স্থাপনা ও দুর্গগুলোর ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। সেখানকার অর্থনীতির ভিত মজবুত করেন এবং ফাতিমী শী'আ সম্প্রদায়ের বিপরীতে সুন্নী সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করেন। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন এবং মিসর ও সিরিয়ায় সর্বত্র মসজিদ, মাদ্রাসা, কারিগরী কলেজ ও উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। ফলে, সমকালীন কবিগণ সামাজিক, রাজনৈতীক ও সামরিক কর্মকান্ডে আয়্যুবীদের বীরত্ব ও কৃতিত্বের বর্ণনা দিয়ে প্রশংসামূলক ব্যাপক কবিতা রচনা করেন। সুলতান সালাহউদ্দীনের পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত আয়্যুবী সালতানাতের বৃহত্তর ঐক্য ভেঙ্গে পড়ে। তাঁর প্রতিনিধি সুলতানগণের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগাভাগী হয়ে যায়। মিসরের সালতানাত পায় তাঁর পুত্র আল-আযীয ইমাদুদ্দীন 'উসমান (মৃ.৫৮৯/১১৯৩), সিরিয়া তাঁর জ্যেষ্ট পুত্র আল-আফদাল নুরুদ্দীন আলী (মৃ.৫৮৯/১১৯৩), আলেপ্পো (হলব)-এর শাসনভার ন্যস্ত হয় তাঁর পুত্র আজ-জাহির গিয়াসউদ্দীন গাযীর উপর (৫৮২/১১৮৬), আল-কারক্, আশ-শুবাক ও জা'বার-এর দায়িত্ব পান তাঁর ভাই আল-মালিকুল আদিল সায়ফুদ্দীন মুহাম্মদ (মৃ.৫৯৬/১১৯৯)। হামাত ও আশপাশের এলাকার দায়িত্ব পান আল-মালিক আল-মানসূর মুহাম্ম ইবন তাকীউদ্দীন 'উমর (৫৭৪/১১৭৮), হিমস ও আল-বাহবা-এর ভার ন্যস্ত হয় জুনিয়ার আসাদুদ্দীন শেরকূহ-এর উপর (মৃ.৫৬৫/১১৬৯) এবং ইয়ামান অঞ্চলের স্থায়ী দায়িত্ব নিদ্ধারিত হয় সুলতান সালাহুদ্দীনের ভাই আল-মালিক জহীর উদ্দীন সায়ফুল ইসলাম তুগতাগীন ইবন আয়্যুবের (মৃ.৫৭৭/১১৮১) জন্য। এরই মধ্যে মিসর ও সিরিয়ার প্রতিনিধি যথাক্রমে আল-আফদাল ও আল-আযীয়ের মধ্যে প্রকাশ্যে বিরোধ বাধে। আল-আফদাল সালাহউদ্দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং সালাহ উদ্দীনের মৃত্যুর পর সালতানাতের উত্তরাধিকারী হওয়ার প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত। কিন্তু যিয়াউদ্দীন ইবনুল আছীর (মৃ.৬০৬/১২১০) সুলতান আফযালের মন্ত্রী পদে নিয়োগ পেয়ে সুলতানের পিতার নিয়োগ প্রাপ্ত আমীর উমারাকে অপসারণ করার জন্য সুলতানাকে প্ররোচিত করতে থাকেন। আমীর উমারাগণ তাঁকে তাঁর দুই ভাই আল-আযীয ও আজ-জাহির থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এদিকে নেতৃস্থানী আমীরগণ মিসরে সংগবদ্ধ হয়ে মিসরের আল-মালিক আল-আযীযের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করার সঠিক পরামর্শ দেয়। এবং তারা তাঁর ভাই সিরিয়ার সুলতানকে পদচ্যুত করার উৎসাহও প্রদান করতে

থাকে। তাদেরকে তাঁর চাচা আল-মালিক আল-আদিল সহযোগীতা করেন। ফলে তাঁদের মধ্যকার ঝগড়া ও বিরোধ চরম আকার ধারন করে। অন্য দিকে তাঁদের প্রতিপক্ষ খৃস্টান শত্রুরা সীমান্তে দুর্গে বসে সংগবদ্ধ হতে থাকে। বিরোধ থাকার পরও তারা আল-মালিক আল-আদিলের পক্ষে তাদের মত প্রদান করে। এই দিকে আল-আদিলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের বিরোধ নতুনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

পরস্পরের মধ্যে বিরোধ থাকার পরও আয়্যূবী সালতানাতের পরিধি তাঁদের রাজত্বকালে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। কবিরগণ তাঁদের এই বিজয়ের অনেক প্রশংসা করেন। আল-আদিলের সময়ে আয়্যূবী পরিবারের রাজত্ব সুদূর পারস্যের হামাযান প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। খৃষ্টানরা আয়্যূবী সাম্রাজ্যের প্রতি তাদের লোলোপ দৃষ্টি নতুনভাবে নিবদ্ধ করতে শুরু করে। এরই মধ্যে সালাহ উদ্দীনের মৃত্যু ঘটে এবং এর পর পরই সাম্রাজ্যের শাসকদের বিভক্তির সুযোগে খৃস্টান সম্প্রদায় প্রাচ্যের মুসলিম দেশের দিকে অগ্রসর হয়ে প্রথমেই ৫৯৪/১১৯৭ সালে সীমান্তে হামলা চালিয়ে সিরিয়ার আক্কা শহর আক্রমণ করে। ৬০১/১২০৪ সালে হামাত এবং ৬১৬/১২১৯ সালে মিসরের সীমান্তে নগরী দিময়াতে হামলা পরিচালনা করে। তবে এই সব যুদ্ধে তারা আয়্যূবীদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এদিকে আল-আদিলের পুত্রদের মাঝে ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে প্রচন্ড বিরোধ বাধে। মিসরের অধিপতি সুলতান আল-মালিক আল-কামিল মুহাম্মদ তাঁর ভাই আল-মালিক আল-মু'য়াজ্জাম 'ঈসাকে পদচ্যুত করার জন্য সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু মায়্যাফারিকীন ও আল-জাযারীয়া অঞ্চলের অধিপতি তাঁর ভাই আল-মালিক আল-আশরাফ মূসা নিজের সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি এই অভিযান পরিচালনা থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর আল-মালিক আল-কামিল তাঁর ভাই-এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আল-নাসির সালাহ উদ্দীন দাউদ থেকে দামিস্কের সালতানাত ছিনিয়ে নেয়ার জন্য ২য় বারের মত দামিস্ক অভিমুখে যাত্রা করেন। এ সময় তিনি তাঁর চাচা আল-মালিক আল-আশরাফের সাহায্য কামনা করেন। তবে খৃষ্টান বাহিনী এই বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করে সিরিয়া অঞ্চলের অধিপতির মৃত্যুতে ও তাঁর পুত্রের দুর্বলতার সুযোগে সিরিয়ায় পুনরায় হামলার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। তবে দুঃখের বিষয় হলো আল-মালিক আল-নাসিরের দুই চাচাই তাঁদের ভাতিজাকে পদচ্যুত করার ব্যাপারে এক মত হন এবং খৃষ্টান রাজার সাথে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হন যে, তাঁরা বায়তুল মুকাদ্দাস ও আশ-পাশের কিছু এলাকা খৃষ্টান রাজার জন্য ছেড়ে দেবেন। আর অবশিষ্ট শহর যেমন-আল-খালীল, নাবলুস, সুর, তাবারিয়া ইত্যাদি মুসলমানদের হাতে রেখে দেবেন। এই চুক্তির ফলে বায়তুল মুকাদ্দাসের মুসলিম অধিবাসী বিতাড়িত হয়ে কেউ দামিশকে, আবার কেউ মিসর এবং অন্যরা কারকে চলে যায়।

আয়্যূবী সুলতানদের(১১৮২-১২৫০খ্রি.) যুগে মিসর ও সিরিয়ায় যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ক আরবী কবিতার একটি উলেখযোগ্য শাখা নতুন ধারা ও প্রকৃতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদলে কিছু সময়ের জন্য হলেও বিকাশ লাভ করে। বিভিন্ন রাজবংশের সাথে সংগঠিত যুদ্ধে বিশেষ করে ক্রুসেড যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলিম যোদ্ধাদেরকে এই সব কবিতার মাধ্যমে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার যোগান দেয়া হয়। পরবর্তী দুই কি তিন শতাব্দী ধরে সামরিক কৌশল, আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র পরিচালনা ও সাধারণভাবে ধর্মযুদ্ধ বিষয়ক স্তুতি কবিতা, রাসূল প্রশস্তি, প্রশংসামূলক সূফী মুওয়াশশাহাত ও শোকগাঁথার বেশ কিছু কবিতা রচিত হয়। প্রচলিত ক্লাসিকধর্মী কাব্যসাহিত্যশিল্পের নিশ্চলতা এই সময়কার ধর্মনিরপেক্ষ লোকায়ত কবিতার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এ সময় দীওয়ান আকারে কবিতার সংকলন যথেষ্ট রচিত হয়, কিন্তু খুব অল্প সংখ্যাক ক্লাসিকধর্মী কবি স্থায়ী সুখ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হন। তবে ব্যতিক্রমী ভাগ্যবান কবিদের মধ্যে এমন কয়েকজন সিরিয়-মিসরিয় কবিও ছিলেন যাঁদের আলংকারিক ও ছান্দিক ভাষায় রচিত ক্লাসিকধর্মী নতুন জাগরণী কবিতা ও রাসূল প্রশস্তির মর্যাদা অদ্যবধি অক্ষুণ্ন আছে। আয়্যূবী রাজ্যগুলোতে ব্যাপক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের বিস্তৃতির একটি প্রধান কারণ ছিলো সেখানকার রাজনৈতিক অবস্থার স্বাভাবিকতা, নির্মল পরিবেশ ও মনোরম আবহাওয়া। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সিরিয়া মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল, যার বাহন ছিল আরবী ভাষা। কিছু কাল পর মিসরও এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ড় সেখানকার প্রাচীন উপাদান ও আয়্যূবীদের পছন্দনীয় নতুন উপাদানের মধ্যে কোন সমন্বয় হয়নি। সাংস্কৃতিক ব্যাপারে সকল কৃতিত্ব আয়্যূবীগণ প্রাপ্য নন। শাহাজাদাদের অবদান সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করাও যাবেনা। খলীফা বলে ঘোষণা করার বিস্ময়কর প্রচেষ্টা তাঁরা কেউ কখনো চালাননি। সালাহ উদ্দীনের মৃত্যুর পর আল-'আদিল ও আল-কামিল উভয়েই ইয়ামান যাতে তাঁদের হস্ড্ডুত্য না হয় সে বিষয়ে একমত হয়ে আল-কামিলের এক পুত্রকে সেখানকার শাসনভার দিয়ে প্রেরণ করেন। আল-কামিল রাসূলী সম্প্রদায়কে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হন। রাসূলীগণ প্রথম দিকে নিজেদেরকে আয়্যূবীদের মিত্র বলে ঘোষনা করলেও পরবর্তীকালে মক্কায় আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাধে। তা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয়নি।

এই সময়ে আয়্যূবী বংশের শাসক আল-মালিকুল আফজাল 'আলী ইবন সালাহউদ্দীন আয়্যূবী (মৃ.৬২১/১২২৪) আরবী কাব্যচর্চায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। সিরিয়ার যঙ্গী বংশের শাসনামলের (৪৮৯-৫৭৭/১০৯৫-১১৮১খ্রি.) অধিনায়ক নূরুদ্দীন যাঙ্গীর পিতা ইমামুদ্দীন যাঙ্গীর মৃত্যুর পর পুত্র নূরদ্দীন যাঙ্গী নাজমুদ্দীন আইয়্যূবকে রাজধানী দামিস্কের দূর্গাধিপতি নিযুক্ত করেন এবং তাঁর পুত্র সালাহ উদ্দীনকে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। ৫৬৭/১১৭১ সালে ফাতিমী আযিদ

‘উবায়দীর মৃত্যুরপর সালাহউদ্দীন আইয়্যূবী মিসরের সুলতান রূপে অধিষ্ঠিত হন। ৫৬৯ /১১৭৩ সালে যখন সুলতান নূরুদ্দীন যঙ্গীর মৃত্যু হয় তখন কাকে দামিস্কের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবেন এই নিয়ে সেখানকার রাজকীয় কর্মকর্তা ও সভাসদদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। সালাহউদ্দীন তখন মিসর থেকে দামিস্কে এসে সুলতান নূরুদ্দীনের পুত্র মালিক আল-সালিহকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন এবং সেই দিন থেকে সিরিয়াও সুলতান সালাহউদ্দীনের অধিকারে চলে আসে এর ফলে ইয়ামান এবং হিজাযেও সুলতান সালাহ উদ্দীনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপের খৃষ্টানরা তখন সম্মিলিতভাবে সিরিয়া ও মিসরের উপর হামলা চালায়। এটা ছিল ইসলামী বিশ্বের জন্য একটি দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্ত। এই সময় সুলতান সালাহউদ্দীন পাহাড়ের মত অটল থেকে এই হামলা প্রতিরোধ করেছিলেন। এই পশ্চিমা খৃষ্টানরা সুলতানকে হত্যা করার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এক পর্যায়ে সকল মুসলিম নেতৃবর্গ সর্বসম্মতিক্রমে সালাহউদ্দীনকে সিরিয়ার সুলতান বলে স্বীকার করে নেয়। সুলতান সালাহউদ্দীনের নের্তৃত্বে ৫৮৩/১১৮৭ সালে অনুষ্ঠিত ধর্মযুদ্ধ তথা ক্রুসেড যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসকে খৃষ্টানদের কবল থেকে মুক্ত করা হয়। পরবর্তী সময়ে মামলূক সুলতানদের শাসনামলে ১৩শ শতকের শেষার্ধে ফিলিস্তিনসহ সমস্ত আরব ভূখন্ড থেকে খৃষ্টানদেরকে যুদ্ধে পরাজিত ও বিতাড়িত করা হয়।

আয়্যূবী সুলতানদের শাসনামলে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের একটি বড় ধরনের প্রভাব লেখক শিল্পীদের চাইতে কবিদের স্বভাব চরিত্রের উপর পড়ে। ফলে কবিগণ খীলফা, সুলতান, আমীর, উযীর ও শাসক শ্রেণীর অতি কাছে অবস্থান করতে সমর্থ হন। মন মানসিকতার পরিবর্তনের সাথে সাথে তাঁরা নতুন সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করার প্রতি অধিক মনোযোগী হয়ে পড়েন। তাঁরা শাসকশ্রেণীর সভায়, দপ্তর ও বিভিন্ন আসরে তাঁদের সঙ্গী হয়ে ও তাঁদের সাথে মেলামেশা করে খোশ-গল্পে নিমজ্জিত হতেন এবং কবিতা রচনা করতেন। সুলতান ও শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে কবিগণ কবিতা রচনার উদ্দেশ্যে মিসর ও সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে থাকেন। এই সুযোগ তাদের পূর্বসূরী কবিগণ কখনো পাননি বলে প্রতিয়মান হচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে প্রকৃতিগত ও স্টাইলগত আরবী কাব্য রচনায় তাঁদের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিদেশী ফার্সী ভাষার শব্দ ক্ষেত্র বিশেষে আরবী কবিতায় অনুপ্রবেশ ঘটে। যেমন- ইবন সানা’ আল-মালিক-এর মুওয়াশশাহাত কাব্যে এর ব্যাপক অনুপবেশ ঘটে। তবে অপরিচিত শব্দের ব্যবহার পরিহার, বাক্য গঠনে কোমলতা ও সুক্ষতার আশ্রয়, নতুন কলা, শিল্প, ভাবধারা ও ভাষার অলংকারের অধিক ব্যবহার, বাস্তভিটার স্মরণে কবিতার সূচনা পরিহার, অট্রালিকা, মহল ও মদের বর্ণনা, উপমা, রূপালংকরের অধিক ব্যবহার, কাসীদার বিভিন্ন অংশের সাথে পরস্পর সম্পর্ক বজায় রাখা এবং কাব্যে

ছন্দগত মিল স্থাপনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদি বিষয়গুলো আয়্যূবী যুগের কবিতায় ব্যাপক বিস্তার লাভ করে।

আব্বাসীয় বাগদাদের কবি আবুল আতাহিয়্যা সাধারণ একজন কুম্বকার থেকে ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠেন। এজন্য তাঁকে দীর্ঘ বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। কবিত্ব শক্তির নিয়মিত পরিচর্যা ও কঠোর সাধনা তাঁকে সমকালীন সাহিত্যাঙ্গনে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে তিনি কঠিন বাস্তবতার মখোমুখি হয়েছেন। তিনি খুব কাছ থেকে ক্ষমতাসীন মানুষের ভোগ বিলাস ও অনাচার অবলোকন করে বিস্মিত ও হতভম্ব হয়েছেন সেই সাথে দুনিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এর আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন। ফলে প্রসাদের কবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি কালক্রমে হয়ে উঠেন দুনিয়াবিমুখ কবি। তাঁর কবিতার পঙক্তিতে ঝরে পরেছে চিরস্থায়ী আখিরাতের পুঁজি গ্রহণের আকুলতা সেই সাথে দুনিয়ার প্রতি অবজ্ঞা। আব্বাসী যুগে যুহদ কবিতায় তিনি ছিলেন অন্যতম পতাকাবাহী কবি। কবি আবুল আতাহিয়্যা সাধারণ একজন কুম্বকার থেকে ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠেন। এজন্য তাঁকে দীর্ঘ বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। কবিত্ব শক্তির নিয়মিত পরিচর্যা ও কঠোর সাধনা তাঁকে সমকালীন সাহিত্যাঙ্গনে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে তিনি কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছেন। তিনি খুব কাছ থেকে ক্ষমতাসীন মানুষের ভোগ বিলাস ও অনাচার অবলোকন করে বিস্মিত ও হতভম্ব হয়েছেন সেই সাথে দুনিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এর আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন। ফলে প্রাসাদের কবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি কালক্রমে হয়ে উঠেন দুনিয়াবিমুখ কবি। তাঁর কবিতার পঙক্তিতে ঝরে পরেছে চিরস্থায়ী আখিরাতের পুঁজি গ্রহণের আকুলতা সেই সাথে দুনিয়ার প্রতি অবজ্ঞা। আব্বাসী যুগে যুহদ কবিতায় তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ কবি।

অন্যদিকে সিরিয়া ও মিসরের আয়্যুবীয় আব্বাসী কবি ইবনুল ফারিদ ছিলেন একজন আল্লাহপ্রেমিক সূফীকবি বা মরমিকবি। হুব্বুল ইলাহী বা আল্লাহপ্রেমই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান অনুসঙ্গ। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এ প্রেমই তাঁকে তাঁর লক্ষ্যপথে তাড়িত করেছে। তাঁকে বলা হয় সুলতানুল আশিকীন বা প্রেমিকদের কবিসম্রাট। তিনি একাধারে আলিম, ধর্মতত্ত্ববিদ, ফিকহশাস্ত্রবিদ,ফকীহ, সূফীসাধক, সূফীকবি, সূফীতাত্ত্বিক, আরব মরমিকবি ও আশিকে ইলাহী। যুহুদ বা দুনিয়াবিমুখতা ছিল তাঁর কাব্যের প্রধান উপজিব্য এবং চিরন্তনবাস্তবতা। দিনে সিয়ামসাধনা এবং রাতজেগে সালাত আদায় করা ছিল তাঁর নিত্য নৈমত্তিক ইবাদত। তিনি দিনের পর দিন পাহাড়-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে, উষ্ণ মরুপ্রান্তরে দীনহীন ফকীরের ন্যায় মহান আল্লাহর অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আল্লাহপ্রেম তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও একই স্থানে স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। তিনি তাঁর প্রভুর ভালোবাসায় ঘর ছেড়েছেন, আবার তাঁরই ভালোবাসায় ঘরে ফিরেছেন। তাঁর যুগে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ যুহুদকবি, সূফীসাধক ও সূফীকবি। ইবনুল ফারিদ সর্বেশ্বরবাদী বা ওয়াহদাতুল ওয়াজূদ তথা ‘আল্লাহ সব

কিছুতেই আছেন এবং সব কিছুই আল্লাহ' এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেননা; বরং তাঁর মতের একান্তঝুঁক ছিল ঐক্যসংযুক্তির ইত্তিহাদ বা ওয়াহদাতুশ শুহূদ তত্ত্বের প্রতি যা তাঁর সূফীকাব্যদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে পরিগণিত। কবি ইনুল ফারিদ তাঁর শিক্ষক মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ সূফীতত্ত্ব দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হননি। তিনি কখনো তাঁর সাক্ষাৎ লাভেও ধন্য হননি। থোমাস এমিল হোমারিনের মতে, তখন মিসরে শুধু ইবনুল ফারিদই(১১৮১-১২৩৫খ্রি.)সাড়ে সাতশত বছরের সূফী কবির ভাগ্যাকাশ অলংকৃত করতে পেরেছেন। নোবেল বিজয়ী নাজীব মাহফুজসহ সমকালীন মিসরের কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁদের রচনায় এই সূফীকবির কবিতা তাঁদের লেখনির যথাযথাস্থানে উদ্ধৃত করেছেন।

আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমেই আমি আয়্যূবী যুগে মিসর ও সিরিয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়ার চেষ্টা করেছি। কেননা কবিগণ সেই পরিবেশ ও অবস্থাকে উপজীব্য করে এবং আরবী কবিতার বিভিন্ন লক্ষ্যউদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর আলোকে কবিতার গঠনপ্রকৃতি ও স্বাভাবিকরূপের মধ্যে কিছুটা বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন এনে তাঁরা কবিতা রচনা করেছেন। সিরিয়া ও ইরাকের আতাবেকদের কুর্দিস্থানের অধিবাসী শাসক ইমামুদ্দীন যঙ্গীর মনোনীত জনৈক কুর্দী সর্দার সালাহ উদ্দীনের পিতা আয়্যূব ইবন শাযীকে তাঁর পক্ষ থেকে সিরিয়া অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করে পাঠান। কালক্রমে আয়্যূব একজন বড় নেতা ও দক্ষ প্রশাসক হিসাবে পরিগণিত হন। তাঁর ছেলে সালাহউদ্দীন আয়্যূবী এবং ভাই আসাদউদ্দিন শেরকূহও যঙ্গী সুলতানদের দক্ষ প্রশাসক হিসেবে আস্থাভাজন হন। ইমামুদ্দীন যঙ্গীর মৃত্যুর (মৃ.৫৪১/১১৪৬) পর তাঁর পুত্র নুরুদ্দীন মাহমূদ(মৃ.৫৬৯/১১৭৩) সিরিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শেরকূহকে সিরিয়ার হিমস্ ও রাহবা অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করেন। শেরকূহের যোগ্যতা ও কৃতিত্ব দেখে নুরুদ্দীন তাঁকে নিজের প্রধান সেনাপতি করেন। নূরুদ্দীন যঙ্গী শেরকূহকে মিসর অভিযানে পাঠানোর সময় শেরকোহের ভ্রাতুস্পুত্র সালাহউদ্দীন ইবন আয়্যূবকেও মিসরে প্রেরণ করেন। ফাতিমী খলীফা 'অযিদ উবায়দীর মৃত্যুর পর সালাহউদ্দীন আয়্যূবী ৫৬৪/১১৬৮ সালে মিসরের সিংহাসন দখল করে সেখানে আব্বাসী খলীফার নামেমাত্র অধীনে স্বাধীন আয়্যূবী রাজত্বের গোড়াপত্তন করেন। তারপর অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর রাজত্ব মিসর, সিরিয়া, দিয়ারে বাকর, ইয়ামান ও হিজায অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। অতপর মিসর ও সিরিয়ায় ৬৪৮/১২৫০ সাল পর্যন্ড় তাঁর বংশের রাজত্ব স্থায়ী হয়। সুলতান সালাহ উদ্দীনের মৃত্যুর(মৃ. ৫৮৯/১১৯৩) পর তাঁর বংশের বিশাল রাজত্ব কয়েকটি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে যায়।

সালাহ উদ্দীন আয়্যূবীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বিশ্বকে খৃষ্টানদের হামলা ও আধিপত্য থেকে মুক্ত করা। এই মর্মে তিনি সকল ইসলামী শক্তিকে একত্রিত করেন এবং মিসর ও সিরিয়ার সামরিক স্থাপনা ও দুর্গগুলোর ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। সেখানকার অর্থনীতির ভিত মজবুত করেন এবং ফাতিমী শী'আ সম্প্রদায়ের বিপরীতে সুন্নী সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করেন। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন এবং মিসর ও সিরিয়ায় সর্বত্র মসজিদ, মাদ্রাসা, কারিগরী কলেজ ও উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। ফলে, সমকালীন কবিগণ সামাজিক, রাজনৈতীক ও সামরিক কর্মকান্ডে আয়্যূবীদের বীরত্ব ও কৃতিত্বের বর্ণনা দিয়ে প্রশংসামূলক ব্যাপক কবিতা রচনা করেন। সুলতান সালাহউদ্দীনের পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত আয়্যূবী সালতানাতের বৃহত্তর ঐক্য ভেঙ্গে পড়ে। তাঁর প্রতিনিধি সুলতানগণের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগাভাগী হয়ে যায়। মিসরের সালতানাত পায় তাঁর পুত্র আল-আযীয ইমাদুদ্দীন 'উসমান (মৃ.৫৮৯/১১৯৩খৃ.), সিরিয়া তাঁর জ্যেষ্ট পুত্র আল-আফদাল নুরুদ্দীন আলী (মৃ.৫৮৯/১১৯৩), আলেপ্পো (হলব)-এর শাসনভার ন্যস্ত হয় তাঁর পুত্র আজ-জাহির গিয়াসউদ্দীন গাযীর উপর (৫৮২/১১৮৬), আল-কারক্, আশ-শুবাক ও জা'বার-এর দায়িত্ব পান তাঁর ভাই আল-মালিকুল আদিল সায়ফুদ্দীন মুহাম্মদ (মৃ.৫৯৬/১১৯৯)। হামাত ও আশপাশের এলাকার দায়িত্ব পান আল-মালিক আল-মানসূর মুহাম্ম ইবন তাকীউদ্দীন 'উমর (৫৭৪/১১৭৮), হিমস ও আল-বাহবা-এর ভার ন্যস্ত হয় জুনিয়ার আসাদুদ্দীন শেরকূহ-এর উপর (মৃ.৫৬৫/১১৬৯) এবং ইয়ামান অঞ্চলের স্থায়ী দায়িত্ব নিদ্ধারিত হয় সুলতান সালাহুদ্দীনের ভাই আল-মালিক জহীর উদ্দীন সায়ফুল ইসলাম তুগতাগীন ইবন আয়্যূবের (মৃ.৫৭৭/১১৮১) জন্য। এরই মধ্যে মিসর ও সিরিয়ার প্রতিনিধি যথাক্রমে আল-আফদাল ও আল-আযীয়ের মধ্যে প্রকাশ্যে বিরোধ বাধে। আল-আফদাল সালাহউদ্দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং সালাহ উদ্দীনের মৃত্যুর পর সালতানাতের উত্তরাধিকারী হওয়ার প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত। কিন্তু যিয়াউদ্দীন ইবনুল আছীর (মৃ.৬০৬/১২১০) সুলতান আফযালের মন্ত্রী পদে নিয়োগ পেয়ে সুলতানের পিতার নিয়োগ প্রাপ্ত আমীর উমারাকে অপসারণ করার জন্য সুলতানাকে প্ররোচিত করতে থাকেন। আমীর উমারাগণ তাঁকে তাঁর দুই ভাই আল-আযীয ও আজ-জাহির থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এদিকে নেতৃস্থানী আমীরগণ মিসরে সংগবদ্ধ হয়ে মিসরের আল-মালিক আল-আযীযের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করার সঠিক পরামর্শ দেয়। এবং তারা তাঁর ভাই সিরিয়ার সুলতানকে পদচ্যুত করার উৎসাহও প্রদান করতে থাকে। তাদেরকে তাঁর চাচা আল-মালিক আল-আদিল সহযোগীতা করেন। ফলে তাঁদের মধ্যকার ঝগড়া ও বিরোধ চরম আকার ধারন করে। অন্য দিকে তাঁদের প্রতিপক্ষ খৃস্টান শত্রুরা সীমান্তের দুর্গে বসে সংগবদ্ধ হতে থাকে। বিরোধ থাকার পরও তারা আল-মালিক আল-আদিলের পক্ষে তাদের মত প্রদান করে। এই দিকে আল-আদিলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের বিরোধ নতুনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

রাজনৈতিক চড়াই উৎরাই ও যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে সুলতান সালাহউদ্দীন তাঁর সমগ্র শাসনামল মিসর, সিরিয়া ও দামিশক নগরীর মধ্যে অতিবাহিত করেন। কিন্তু তাঁর বংশের প্রতিনিধিরা পরবর্তী সময় শুধু মিসরকেই তাদের রাজধানী গড়ে তুলেন। ফলে তারা দুর্বল হয়ে পড়লে সিরিয়া সাম্রাজ্য আইয়্যুবীদের অধিকার থেকে মামলূকীদের অধিকারে চলে যায় এবং আইয়্যুবীরা শুধু মিসরের ওপরই তাঁদের দখলদারিত্ব বহাল রাখেন। রাজনৈতিক জটিলতা ও সমস্যা কাটিয়ে উঠার পর সালাহ উদ্দীন নিজের জীবদ্দশায় সাংস্কৃতিক বিষয়ের সমন্বয় সাধনের আপ্রাণ চেষ্টা করেন। নতুন শাসকদের জন্য ইবনুত-তুওয়ায়র ফাতিমী শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। খারাজ সম্পর্কে কাদী আবুল-হাসান প্রবন্ধ লিখেন। কবি ইবনুল-মাম্মাতীর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কাওয়ানীনুদ-দাওয়াবীনে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আয়্যুবী শাসনামলের শেষদিকে আরোও অনেক প্রবন্ধ ও পুস্তক রচিত হয়েছে, যা উছমান ইবন ইবরাহীম আন-নাবুলুসীর বিভিন্ন উদ্বৃতিতে সংরক্ষিত আছে এবং রচয়িতাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

আয়্যুবী সুলতানদের(১১৮২-১২৫০খ্রি.) যুগে মিসর ও সিরিয়ায় যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ক আরবী কবিতার একটি উলেখযোগ্য শাখা নতুন ধারা ও প্রকৃতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদলে কিছু সময়ের জন্য হলেও বিকাশ লাভ করে। বিভিন্ন রাজবংশের সাথে সংগঠিত যুদ্ধে বিশেষ করে ক্রুসেড যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলিম যোদ্ধাদেরকে এই সব কবিতার মাধ্যমে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার যোগান দেয়া হয়। পরবর্তী দুই কি তিন শতাব্দী ধরে সামরিক কৌশল, আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র পরিচালনা ও সাধারণভাবে ধর্মযুদ্ধ বিষয়ক স্তুতি কবিতা, রাসূল প্রশস্তি, প্রশংসামূলক সূফী মুওয়াশশাহাত ও শোকগাঁথার বেশ কিছু কবিতা রচিত হয়। প্রচলিত ক্লাসিকধর্মী কাব্যসাহিত্যশিল্পের নিশ্চলতা এই সময়কার ধর্মনিরপেক্ষ লোকায়ত কবিতার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এ সময় দীওয়ান আকারে কবিতার সংকলন যথেষ্ট রচিত হয়, কিন্তু খুব অল্প সংখ্যাক ক্লাসিকধর্মী কবি স্থায়ী সুখ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হন। তবে ব্যতিক্রমী ভাগ্যবান কবিদের মধ্যে এমন কয়েকজন সিরিয়-মিসরিয় কবিও ছিলেন যাঁদের আলংকারিক ও ছান্দিক ভাষায় রচিত ক্লাসিকধর্মী নতুন জাগরণী কবিতা ও রাসূল প্রশস্তির মর্যাদা অদ্যবধি অক্ষুণ্ন আছে। আয়্যুবী রাজ্যগুলোতে ব্যাপক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের বিস্তৃতি একটি প্রধান কারণ ছিলো সেখানকার রাজনৈতিক অবস্থার স্বাভাবিকতা, নির্মল পরিবেশ ও মনোরম আবহাওয়া। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সিরিয়া মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল, যার বাহন ছিল আরবী ভাষা। কিছু কাল পর মিসরও এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ড় সেখানকার প্রাচীন উপাদান ও আয়্যুবীদের পছন্দনীয় নতুন উপাদানের মধ্যে কোন সমন্বয় হয়নি। সাংস্কৃতিক ব্যাপারে সকল কৃতিত্ব আয়্যুবীগণ প্রাপ্য নন। শাহাজাদাদের অবদান সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করাও যাবেনা।

খলীফা বলে ঘোষণা করার বিস্ময়কর প্রচেষ্টা তাঁরা কেউ কখনো চালাননি। সালাহউদ্দীনের মৃত্যুর পর আল-'আদিল ও আল-কামিল উভয়েই ইয়ামান যাতে তাঁদের হস্তচ্যুত্য না হয় সে বিষয়ে একমত হয়ে আল-কামিলের এক পুত্রকে সেখানকার শাসনভার দিয়ে প্রেরণ করেন। আল-কামিল রাসূলী সম্প্রদায়কে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হন। রাসূলীগণ প্রথম দিকে নিজেদেরকে আয়্যুবীদের মিত্র বলে ঘোষনা করলেও পরবর্তীকালে মক্কায় আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাধে। তা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয়নি।

এই সময়ে আয়্যুবী বংশের শাসক আল-মালিকুল আফজাল 'আলী ইবন সালাহউদ্দীন আয়্যুবী(মৃ.৬২১/১২২৪) আরবী কাব্যচর্চায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। সিরিয়ার যঙ্গী বংশের শাসনামলের (হি. ৪৮৯-৫৭৭/খ্রি.১০৯৫-১১৮১) অধিনায়ক নূরুদ্দীন যাঙ্গীর পিতা ইমামুদ্দীন যাঙ্গীর মৃত্যুর পর পুত্র নূরদ্দীন যাঙ্গী নাজমুদ্দীন আইয়্যুবকে রাজধানী দামিস্কের দূর্গাধিপতি নিযুক্ত করেন এবং তাঁর পুত্র সালাহউদ্দীনকে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। ৫৬৭/১১৭১ সালে ফাতিমী আযিদ 'উবায়দীর মৃত্যুরপর সালাহউদ্দীন আইয়্যুবী মিসরের সুলতান রূপে অধিষ্ঠিত হন। ৫৬৯ /১১৭৩ সালে যখন সুলতান নূরুদ্দীন যঙ্গীর মৃত্যু হয় তখন কাকে দামিস্কের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবেন এই নিয়ে সেখানকার রাজকীয় কর্মকর্তা ও সভাসদদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। সালাহউদ্দীন তখন মিসর থেকে দামিস্কে এসে সুলতান নূরুদ্দীনের পুত্র মালিক আল-সালিহকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন এবং সেই দিন থেকে সিরিয়াও সুলতান সালাহউদ্দীনের অধিকারে চলে আসে এর ফলে ইয়ামান এবং হিজাযেও সুলতান সালাহউদ্দীনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপের খৃষ্টানরা তখন সম্মিলিতভাবে সিরিয়া ও মিসরের উপর হামলা চালায়। এটা ছিল ইসলামী বিশ্বের জন্য একটি দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্ত। এই সময় সুলতান সালাহ উদ্দীন পাহাড়ের মত অটল থেকে এই হামলা প্রতিরোধ করেছিলেন। এই পশ্চিমা খৃষ্টানরা সুলতানকে হত্যা করার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এক পর্যায়ে সকল মুসলিম নেতৃবর্গ সর্বসম্মতিক্রমে সালাহউদ্দীনকে সিরিয়ার সুলতান বলে স্বীকার করে নেয়। সুলতান সালাহউদ্দীনের নের্তৃত্বে ৫৮৩ /১১৮৭ সালে অনুষ্ঠিত ধর্মযুদ্ধ তথা ক্রুসেড যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসকে খৃষ্টানদের কবল থেকে মুক্ত করা হয়। পরবর্তী সময়ে মামলূক সুলতানদের শাসনামলে ১৩শ শতকের শেষার্ধে ফিলিস্তিনসহ সমস্ত আরব ভূখন্ড থেকে খৃষ্টানদেরকে যুদ্ধে পরাজিত ও বিতাড়িত করা হয়।

আয়্যুবী সুলতানদের শাসনামলে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের একটি বড় ধরনের প্রভাব লেখক শিল্পীদের চাইতে কবিদের স্বভাব চরিত্রের উপর পড়ে। ফলে কবিগণ খীলফা, সুলতান, আমীর, উযীর ও শাসক শ্রেণীর অতি কাছে অবস্থান করতে সমর্থ হন। মন মানসিকতার পরিবর্তনের

সাথে সাথে তাঁরা নতুন সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করার প্রতি অধিক মনোযোগী হয়ে পড়েন। তাঁরা শাসকশ্রেণীর সভায়, দপ্তর ও বিভিন্ন আসরে তাঁদের সঙ্গী হয়ে ও তাঁদের সাথে মেলামেশা করে খোশ-গল্পে নিমজ্জিত হতেন এবং কবিতা রচনা করতেন। সুলতান ও শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে কবিগণ কবিতা রচনার উদ্দেশ্যে মিসর ও সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে থাকেন। এই সুযোগ তাদের পূর্বসূরী কবিগণ কখনো পাননি বলে প্রতিয়মান হচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে প্রকৃতিগত ও স্টাইলগত আরবী কাব্য রচনায় তাঁদের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিদেশী ফার্সী ভাষার শব্দ ক্ষেত্র বিশেষে আরবী কবিতায় অনুপ্রবেশ ঘটে। যেমন- ইবন সানা' আল-মালিক-এর মুওয়াশশাহাত কাব্যে এর ব্যাপক অনুপবেশ ঘটে। তবে অপরিচিত শব্দের ব্যবহার পরিহার, বাক্য গঠনে কোমলতা ও সুক্ষতার আশ্রয়, নতুন কলা, শিল্প, ভাবধারা ও ভাষার অলংকারের অধিক ব্যবহার, বাস্তভিটার স্মরণে কবিতার সূচনা পরিহার, অট্রালিকা, মহল ও মদের বর্ণনা, উপমা, রূপালংকরের অধিক ব্যবহার, কাসীদার বিভিন্ন অংশের সাথে পরস্পর সম্পর্ক বজায় রাখা এবং কাব্যে ছন্দগত মিল স্থাপনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদি বিষয়গুলো আয়্যূবী যুগের কবিতায় ব্যাপক বিস্তার লাভ করে।

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুর'আনুল কারীম

আল-হাদীসুন নাবাবী

আহমদ সুবহী মানসূর, আত-তামহীদ লি-কিতাব আত-তাসাউফ ওয়াল-হায়াত আদ-দীনিয়্যাহ ফি মিস্‌র আল মামলূকীয়্যাহ(কায়রো, ২০১৪ খ্রি.)।

ড. আহমদ আমীন, জুহরুল ইসলাম(কায়রোঃ মু'আস সাসাতু হান্দাভী, ২০১২খ্রি.), খ.৪।

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী(কায়রোঃদারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, ১৩৬৯/১৯৫০), খ.৪।

ড. আবুল 'আলা আল-'আফীফী, আত-তাসাওফ আছ-ছাওরাতুর রুহিয়্যা ফিল ইসলাম(বৈরূতঃ দারুশ শা'ব, ১৯৬৩ খ্রি.)।

ড. আহমাদ আমীন, জুহরুল ইসলাম(কায়রোঃ মু'আস সাসাতু হান্দাভী, ২০১২ খ্রি.), খ.৪।

আহমদ হাসান আয-যায়্যাত, তারিখুল আদাবিল আরাবী (কায়রোঃ দারুন নাহদাহ, ২০১৮খ্রি.।

ড. 'আলী মাহমূদ আস-সালাবী, আল-আয়্যূবীয়্যূন বা'দা সালাহ উদ্দীন(কায়রোঃ দারু ইবনিল জাওযী, ২০০৮খ্রি.)।

আবুল-'আলা আল-মা'আর্‌রী, আল-ফুসূল ওয়াল-গায়াত ফী তামজীদিল্লাহ ওয়াল-মাওয়া'ইজ(বৈরূতঃদারুল-আফাখকিল-জাদীদা, ১৯৩৮খ্রি.)।

আকবর শাহ খান নজীবাবাদী মাওলানা, ইসলামের ইতিহাস(অনুদিত), (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খ্রি.), খ. ২।

ড. 'আবদুল জলীল, *আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি.)।

ড. আলী মুহাম্মদ আস-সালাবী, আল-আয়্যূবীয়ূন বা'দা সালাহুদ্দীন (কায়রোঃ দার ইবনুলজাওযী, ২০০৮খ্রি.)।

'আবদুল লতীফ হামযা, আল-হারকাতুল ফিকরিয়্যা ফী মিসর ফিল 'আসরিল আয়্যূবী(কায়রোঃ আল-হায়্যাতুল মিসরিয়্যা আল-'আম্মা, ২০১৬ খ্রি.)।

---------------, আল-আদাবুল মিসরী মিন কিয়ামিদ দাওলাতিল আয়্যূবিয়্যা ‌া মজিয়িল হামলাতিল ফ্রান্সিয়া(কায়রোঃ আল-হায়্যাতুল মিসরিয়্যা আল-'আম্মা, ২০০০খ্রি)।

'আবদুল ফাত্তাহ আল-শালবী, আল-বাহা যুহায়র(কায়রোঃ দারুল-মা'আরিফ, ১৯৮০ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

ড. আবদুল লতীফ হামযা, আল-হারাকাতুল-ফিকরিয়্যা ফী মিসর ফিল-'আসরায়নিল আয়্যূবী ওয়াল-মামলূকীল আওয়্যাল(কায়রো: আল-হায়্যাতুল-'আম্মা লিল-কুত্তাব, ২০১৬ খ্রি.)।

----------, আল-আদাবুল-মিসরী মিন কিয়ামিলদ-দাওলাতিল-আয়্যূবীয়্যা ইলা মাজিয়িল হামলাতিল ফ্রান্সিয়্যা (কায়রো: আল-হায়্যাতুল-'আম্মা লিল-কুত্তাব, ২০০০ খ্রি.)।

'আবদুল হোসায়ন সারা সালিহ গাযী, "আর-রাময ফি শি'রি ইবনিল ফারিদ", তিহরান: জামি'আতুল কাদিসীয়্যা, ১৪৩৮/২০১৭।

আবুল 'আতাহিয়্যাহ, দীওয়ান(বৈরূত: দার বৈরূত, ১৪০৬হি./১৯৮৬ খ্রী.)।

ড. আবদুল জলীল, *আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি.)।

ড. 'আলী মাহমূদ আস-সালাবী, আল-আয়্যূবীয়্যূন বা'দা সালাহুদ্দীন, কায়রো:দারু ইবনিল জাওযী, ২০০৮ খ্রি. পৃ.৫৬৩।

আরবী-বাংলা অভিধান সম্পাদনা পরিষদ(ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি.),খ.১।

আবদুর রহমান ইব্ন আহমাদ আল-জামী, নাফহাতুল উন্সইমন হাদরাতিল কুদস(তিহরান: মাতবা'আ মাহমূদী, ১৩৬৬/১৯৪৬।

'আতিফ জাওদা নাসর, শি'রু উমার ইবনিল ফারিদ, দিরাসাতুন ফি ফান্নিশ-শি'রিস-সূফী(বৈরূত:দারুল উন্দুলুস, তা বি)।

'আলী নাজীব 'আতবী, ইবনুল ফারিদ শা'ইরুল গাযল ওয়াল হুব্বিল ইলাহী(বৈরূত:দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা,১৯৯৪ খ্রি.)।

'আলী হোসাইন সাফী, আল-আদাবুস সূফী ফি মিসর ফিল কারনিস-সাবি' আল-হিজরী(কায়রো:১৯৭১খ্রি.)।

আকবর শাহ খান নজিবাবাদী মাওলানা, ইসলামের ইতিহাস (অনুদিত), (ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩) খ.২।

ড. আহমাদ 'আবদুল 'আযীয আল-কুসায়র, 'আকীদাতুস সূফীয়্যা ওয়াহদাতুল ওজূদ আল খুফিয়্যা (রিয়াদ: ১৪২৪/২০০৩)।

আমীমুল ইহসান মুফতী, আত তা'রীফাতুল ফিকহিয়্যাহ (করাচী: আস সাদাত পাবলিশার্স, তা.বি.)

'আতিফ জাওদা নাসির, শি'রু উমার বিন আল-ফারিদ, দিরাসাতুন ফী ফান্নিশ-শি'র রিস-সূফী, বৈরূত: দারুল আন্দালুষ, তা বি।

ড. আবুল 'আলা আল-'আফীফী, আত-তাসাওউফুছ ছাওরাতুল রুহিয়্যা ফিল ইসলাম, বৈরূত: দারুশ-শা'ব, ১৯৬৩ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

ড. আবুল ‘আশার মুরসিলী, আশ-শি‘রুস সূফী ফী দাওয়িল কির’আতিন নাকদিয়্যা আল-হাদীছা(আল-জাযা’ইর: জামি‘আতু ওয়াহরান,২০১৫ খ্রি.)।

ড. এস.এম.আব্দুছ ছালাম, আরবী সাহিত্য প্রতিভা(রাজশাহী:ছালেহা প্রকাশনী,২০০৯)।

ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বালী, শাযরাতুয-যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব(বৈরূত, ১৪১২/১৯৯১), খ. ৭।

ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০ খ্রি.),খ. ২।

ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান(বৈরূত: দার সাদির, ১৮৮৭ খ্রি.)।

----------, দীওয়ান(কায়রো:মাকতাবাতুল কাহিরা, ১২৭০/১৯৫১)।

ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ‘য়ান ওয়া আম্বাউ আবনাইয যামান(বৈরূত: দার সাদির, ১৯৭০ খ্রি.), খ. ৩।

ইসমা‘ঈল বুখারী, সহীহ বুখারী, হাদীস কুদসী নং ১৪০।

ইমাম গাযালী (রহ), *এহইয়াউল ‘উলুমুদ্দীন* (বৈরুত: দারুল মারেফা, তা.বি.), খ. ৪।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলদেশ, ১৯৯৬খ্রী., খ. ২১, পৃ.৬৬৯।

ইব্ন কাছীর, ইসমা‘ঈল ইব্ন উমার, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া(বৈরূত:দারু ইহয়াত তুরাছিল ‘আরাবী, ১৯৯৩ খ্রি.)।

ইবনুত তা‘আবীযী, দীওয়ান(কায়রো:মাতবা‘আতুল মুকতাতাফ, ১৯০৩খ্রি.)।

ইব্ন তাগরী বারদী আবুল মাহাসিন ইউসুফ, আন-নুজূমুয়-যাহিরা ফী মুলূকি মিসর ওয়াল-কাহিরা, কায়রো: আল-মৃ’আস-সাতুল মিসরিয়্যা আল-‘আম্মা, তা বি, খ. ৩।

ইবনুস সা‘আতী, দীওয়ান(বৈরূত:মাতবা‘আ আমিরকানিয়া, ১৯৩৮খ্রি.), খ. ১-২।

ইবনুন-নাবীহ আল-মিসরী, দীওয়ান(দামিশক:দারুল ফিকর, ১৯৬৯ খ্রি.)।

ইবনুল আছীর যিয়াউদ্দীন, আল-মাছালুস সাইর(কায়রো: মুস্তফা বাবী আল-হালাবী, ১৩৫৮/১৯৩৯), খ.১।

ইবন ‘উনায়ন, দীওয়ান, খলীল মুরদাম বেক সম্পাদিত (দামিশক: মাজমা‘ ইলমী ‘আরাবী, ১৩৬৫/১৯৪৬)।

ইবন ‘আবদিল বার্ও আল-কুরতুবী, আল-ইহতিবাল বিমা ফী শি‘রি আবিল ‘আতাহিয়্যা মিনাল হিকামে ওয়াল আমছাল(আরব আমিরাত: হায়্যাতু আবু জাবী, ১৪৩০/২০০৯)।

ড.‘উমর মূসা পাশা, আল-আদব ফী বিলাদ আশ-শাম(বৌরূত: দারুল ফিকর আল-মু‘আসির,১৪০৯/১৯৮৯)।

Dhaka University Institutional Repository

ড. ‘উমার ফার্‌রূখ, তারিখুল আদাবিল ‘আরাবী(বৈরূত: দারুল-‘ইলমি লিল-মালা’ঈন, ১৪০১/১৯৮১),খ.২।

––––––––––––––, তারিখুল আদাবিল ‘আরাবী(বৈরূত: দারুল-‘ইলমি লিল-মালা’ঈন, ১৩৯২/ ১৯৭২), খ.৩।

ড. শাওকী দায়ফ, তারিখুল আদাবিল ‘আরাবী, ‘আসরুদ দুওয়াল ওয়াল ইমারাত মিসর(কায়রো: দারুল মা‘আরিফ, ১৯৯০ খ্রি.), খ.৭।

----------, তারিখুল আদাবিল ‘আরাবী, ‘আসরুদ দুওয়াল ওয়াল ইমারাত জাযিরাতুল ‘আরব

––––––––––––, আয-যুহুদ ওয়াত-তাসাউফ, ইরাক, ইরান(কায়রো: দারুল-মা‘আরিফ, ১৯৮০ খ্রি.), খ.৫।

––––––––––, তারিখুল আদাবিল ‘আরাবী আল-“আসরুল ‘আব্বাসী আল-অওয়াল(কায়রো: দারুল মা‘আরিফ, ১৯৬৬ খ্রি), খ. ৩।

ড. শুকরী ফায়সাল, আবুল ‘আতাহিয়্যা অশ‘আরুহু ওয়া আখবারুহু, দামিশক: মাতবা‘আতু জামি‘আ দামিশক, ১৩৮৪/১৯৬৫।

শামসুদ্দীন আবু ‘আবদুল্লাহ মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন আল-আনসারী ইব্‌ন আয-যায়্যাত(বাগদাদ: দারুল-মুছান্না, তা বি,)।

ড. সালাহ হাস্যূন জাব্বার আল-‘উবায়দী, “আল-আলগায ফীশ শি‘রিস সূফী দিরাসাতুন ফান্যিয়্যা”, মাজাল্লা আল-কাদিসিয়্যা লিল ‘উলূমিল ইনসানিয়্যা, ২০১৬ খ্রি., সংখ্যা, ৩।

ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী(কায়রো: দারূল মা‘আরিফ, ১৯৮৫ খ্রি.)।

ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান(কায়রো: মাকতাবাতুল কাহিরা, ১২৭০/১৯৫১)।

ড. যাকী মুবারক, আত-তাসাওউফুল ইসলামী ফি’ল আদব ওয়া’ল আখলাক (কায়রো: মু’আস-সাতু হান্দাভী লিত-তা‘লীম ওয়াছ-ছাকাফা, ২০১২ খ্রি.)।

আল-মু‘আল্লাকাতুস-সাব‘(করাচী:মাকতাবাতুল বুশরা. ১৪৩২/২০১১), সম্পা. আয-যূযানী।

সিরাজুদ্দীন আবু হাফস ‘উমার ইবন ‘আলী আল-মিসরী, তাবাকাতুল আওলিয়া(কায়রো: মাকতাবাতুল খানজি, ১৪১৫/১৯৯৪)।

সাজিদা তাহির ফারহান, তাজাল্যিয়াতুর রামযিস সূফী ফী তা’ইয়্যা ইবনিল ফারিদ(তিহরান:জামি‘আতুল কাদিসিয়্যা, ২০১৭ খ্রি.)।

ড. মুহাম্মদ আত তুনজী, আল-ম‘জামুল মুফাসসাল ফি আল-আদাব(বৈরূত:দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৪১৯/১৯৯৯), খ.১।

Dhaka University Institutional Repository

মাহমূদ লুতফী নায়িফ 'আবদুল্লাহ, আত-তাজরিবাতুয যুহদিয়্যা বায়না আবিল 'আতাহিয়্যা ওয়া আবিল ইসহাক আল-আলবিরী(ফিলিস্তিন: জামি'আতুন নাজাহ আল-ওয়াতানিয়্যা, ২০০৯ খ্রি.)।

ড. মুজতাবা রাহমান দোস্ত, "আবুল 'আতাহিয়্যা হায়াতুহু ওয়া শি'রুহু", মাজাল্লাতুল লুগাতিল 'আরাবিয়্যা ওয়া আদাবিহা, তিহরান: তিহরান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪২৬/২০০৫, ১ম. বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

মুস্তাফা 'আবদুল কাদিও মুস্তাফা, আল-বাদী' ফী শি'রি উমার বিন আল-ফারিদ(মিসর:জামি'আ উম্মি দারমান আল-ইসলামিয়া, ১৪২৬/২০০৬)।

ড. মুস্তফা সাদিক আল রাফি'ঈ, তারিখু আদাবিল 'আরব(বৈরূত:দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৯৭৪ খ্রি.), খ.৩।

এুহাম্মদ 'আলী আতরুশী শাহরিদা, "আবল 'আতাহিয়্যা হায়াতুহু ওয়া শি'রুহু", বুহূছ ফিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যা, জামি'আতু ইস্পাহান, ১২৮৮/২০০৮, সংখ্যা, ১।

প্রফেসর ড. ফাদার জোসেফ স্কাটুলীন,"উমার ইবনুল ফারিদ ওয়া হায়তুহুস-সূফীয়্যাহ", আল-মাজমা'উল ইলমী আল-মিসরী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে, মিসর, ১৯৯৯খ্রি.।

----------, "ইবনুল ফারিদ শা'ইরুন ওয়া লয়সাা ফায়লাসূফান", ইত্তিহাদুল কুত্তাব ওয়াল উদাবা' আল-উর্দূনী'ঈন সম্মেলন, জর্দান, ২০১০খ্রি.।

ড. খালিদ আলী ইদ্রীস, "রমযিয়্যাতুল-খামর ফিশ-শি'রিস-সূফী", International Journal of

ড. হোমাদ সালীহা, আর-রামযুস সূফী ফী শি'রি ইবনিল ফারিদ(আল-জাযা'ইর:জামি'অতুল জীলালী, ২০১৭ খ্রি.)

ড. মুহাম্মদ যাগলুল সাল্লাম, আল-আদাব ফীল 'আসরিল আয়্যূবী(কায়রো: মানশা'আতুল মা'আরিফ, ১৯৬৭ খ্রি.)।

ড. যকী মুবারক, আত-তাসাওউফ আল-ইসলামী ফিল আদবি ওয়াল আখলাক(কায়রো:মু'আসসাতু হান্দাবী, ২০১২খ্রি.)।

ফাদার জোসেফ স্কাতুলীন লেবানন-আমেরিকান কবি, প্রফেসর, ভাষাবিদ, প্রশাসক ও লেখক ১৯৫২ সালে জন্ম। ইংরেজী ও আরবী ভাষার পন্ডিত। তিনি আধুনিক আরবী মুক্তছন্দ কবিতার আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। তিনি আরবী কাসীদায় সনাতন রীতির অনুসারী ছিলেন। দ্র. : www.amazon.com

মুহাম্মদ আলী আবুল হাসানী, "সুলতানুল আশিকীন ইবনুল ফারিদ ওয়া খাসা'ইসুহুশ শি'রিয়্যা", দাহকান বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল, ইরান, ২০১১খৃ., সংখ্যা নং ৩, পৃ. ২৫-৪১: WWW.

M.Aolhasani@gmail.com;

মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল্-আযহারী, *আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯ খ্রি.), খ.২।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী-বাংলা অভিধান, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি.), খ.১।

ড. মুহাম্মদ ফজলূর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রি.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ।

জুরজী যায়দান, তারিখুল লুগাতিল 'আরাবিয়্যা(বৈরূত:দারুল জীল, ১৪০২/১৯৮২), খ.১।

লুইস মালুফ, *আল মুনজিদ ফিল লুগাতি ওয়াল আলাম* (বৈরুত: দারুল মাশারিক, তা.বি.), ২৯শ সংস্করণ।

মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ফিরোজাবাদী, *আল কামুসুল মুহীত* (কায়রো: দারুল হাদীছ,১৪২৯/২০০৮, ১ম সংস্করণ।

মুফতী আমীমুল ইহসান, *আত-তা'রীফাতুল ফিকহিয়্যাহ* (করাচী: আস-সাদাত পাবলিশার্স, তা.বি.)।

কামাল উদ্দিন মুহাম্মদ বলখী, *আইনুল ইলম* (ঢাকা: ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি)।

ড. সৈয়দ আবদুস সাত্তার মুতাওয়াল্লী, আদাবুয-যুহ্দ ফিল-'আসরিল-'আব্বাসী, পিএইচ.ডি. থিসিস, ১৯৭২ খ্রি., উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়,পান্ডুলিপি শাখা, ক্রমিক নং. ৭৬৪।

আবুল 'আলা আল-'আফীফী, আত-তাসাওউফুছ ছাওরাতির রূহিয়্যা ফিল ইসলাম(বৈরূত: দারুশ-শা'ব, ১৯৬৩ খ্রি.)।

সিরাজুদ্দীন আবু হাফস 'উমর আল-মিসরী, তাবাকাতুল আওলীয়া, কায়রো:মাকতাবা আল-খানজী, ১৪১৫/১৯৯৪।

ড. নাজম মুজীদ 'আলী, "আশ'আরুল হুব্বিল ইলাহী মিন রাবি'আআল-'অদবিয়্যা ইলা ইবনিল ফারিদ", মাজাল্লা কুল্লিয়াতুত তারবিয়্যা আল-ইসলামিয়্যা, বাগদাদ: আল-জামি'আ আল-মুস্তানসিরিয়্যা, ২০০৯ খ্রি., সংখ্যা. ৫৮।

১২০. ড. নজম মজীদ 'আলী, "আশ'আরুল-হুব্বিল-ইলাহী, মিন রাবি'আ আল-'আদবিয়্যা ইলা ইবনিল ফারিদ", মাজাল্লা কুল্লিয়্যাতুল-আসাসিয়্যা, সংখ্যা. ৫৮, বাগদাদ: মুস্তানসিরিয়্যা 'আব্বাসীয়্যা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯ খ্রি., পৃ.২৪।

মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল্-আযহারী, *বাংলা একাডেমী আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯ খ্রি.), ২য় খ., ২য় পুনর্মুদ্রণ।

সম্পাদনা পরিষদ, *আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি.), ১ম খ., ১ম প্রকাশ।

ড. মুহাম্মদ ফজলূর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রি.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ।

Dhaka University Institutional Repository

লুয়াইস মালুফ, *আল মুনজিদ ফিল লুগাতি ওয়াল আলাম* (বৈরুত: দারুল মাশারিক, তা.বি.), ২৯শ সংস্করণ, পৃ.৩০৮

মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ফিরোজাবাদী, *আল কামুসুল মুহীত* (বৈরুত: দারুল এহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.), ১ম খ., ১ম সংস্করণ, পৃ. ৪১৮

ইমাম গাযালী (রহ), *এহইয়াউল উলুমুদ্দীন* (বৈরুত: দারুল মারেফা, তা.বি.), ৪র্থ খ.।

নাজাহ্ 'আত্তার,'আবুল 'আতাহিয়্যা;হিজ লাইফ এ্যান্ড হিজ পয়েট্রি,(লন্ডণ:এডিনবারগ ইউনিভার্সিটি, ১৯৫৮ খ্রি.)।

মুহাম্মদ যাগলূল সালাম, আল-আদব ফী আল-'আসর আল- আয়্যুবী(কায়রো:মানশাআত আল-মা'আরিফ,১৯৬৭)পৃ.১৫-৩০;

----------, আল-আদব ফীল 'আসরিল ফাতিমী(কায়রো: মানষা'আতুল মা'আরিফ, তা বি)।

আল-মাকরীযী, কিতাবু'স সুলূক, সম্পা, এম, মুসতাফা যিয়াদা:. et alu, কায়রো, ১৯৫৬ খ্রি.।

ইবন 'আবদি'জ-জাহির, আর-রাওদু'জ-জাহির ফী সীরাতিল-মালিকি'জ-জাহির, সম্পা, 'আব্দুল-'আযীয আল-খুওয়ায়তির, আর-রিয়াদ, ১৩৯৬/১৯৭৬।

কালাউন, ইবন 'আবদুজ-জাহির, তাশরীফুল-আয়্যাম ওয়া'ল-'উসূর ফী সীরাতুল-মালিক আল-মানসূও, সম্পা, মুরাদ কামিল, কায়রো,১৯৬১।

ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হিলমী, ইবনুল ফারিদ ওয়াল হুব্বুল ইলাহী, পৃ. ৪৩-৪৪

রশীদ ইব্ন গালিব আদ-দাহদাহ, শারহু দীওয়ান ইবনিল ফারিদ, দীবাজাতুদ-দীওয়ান লিশ-শায়খ 'আলী সিবদিশ-শা'ইর(বৈরূত:দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ২০০৩ খ্রি.)।

মুহাম্মদ আহমাদ দারনীকা, মু'জামু শু'আরাইল হুব্বিল ইলাহী(বৈরূত:মাকতাবা আল-হিলাল,২০০৩ খ্রি.)।

মাহমূদ 'আবদুল খালিক, শি'রু ইবনিল ফারিদফি দাওইন নাকদিল আদাবী আল-হাদীছ(কায়রো:আসয়ূত মাকতাবা তালী'আ, ১৯৮০ খ্রি.)।

মুফতী আমীমুল ইহসান, *আত তা'রীফাতুল ফিকহিয়্যাহ* (করাচী: আস-সাদাত পাবলিশার্স, তা.বি.)।

মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ফিরোজাবাদী, *আল কামুসুল মুহীত* (বৈরুত: দারুল এহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.), খ. ১, ১ম সংস্করণ।

ইমাম গাযালী, এহইয়াউল উলুমিদ্দীন (বৈরুত: দারুল মা'রিফা, তা.বি.), খ.৪।

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ সা'দুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ আল-ফারগানী, মুনতাহাল মাদারিক ফি শারহি তা'ইয়্যা ইবনিল ফারিদ(বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪২৮/২০০৭), খ.১-২।

ড. হাসান ইব্রাহীম হাসান, তারীখুল ইসলাম (বৈরূত:দার আল-জীল,১৪১১/১৯৯১),খ.৪।

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, *আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রি.), ২য় সংস্করণ।

মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ফিরোজাবাদী, *আল কামুসুল মুহীত* (বৈরুত: দারুল এহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.), খ.১, ১ম সংস্করণ।

ইমাম গাযালী (রহ), *এহইয়াউল উলুমুদ্দীন* (বৈরুত: দারুল মারেফা, তা.বি.), খ.৪।

জামাল উদ্দিন মুহাম্মদ বলখী, *আইনুল ইলম* (ঢাকা: ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি)।

সৈয়দ মুহাম্মদ মুজতাবা হুসাইন, ইবন সানা আল-মুলক ওয়া মুছাহামাতুহু ফী আল-আদাবুল আরাবী(অপ্রকাশিক পিএইচ.ডি. থিসিস, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত, ২০০৭)।

ড. হাসান ইব্রাহীম হাসান, তারিখুল ইসলাম(বৈরূত:দারুল জীল, ১৪১১/১৯৯১), খ.৪।

Academic Research Studies, Abu Dhabi University, United Arab Emirate, June, 1910, No.2.

George Nicholas El-Hage, "Ibn al-Farid's Khamriyy or Ode on Wine", The Journal of Arabe Language, Literature, Culture, Columbia University press, Decemder 13, 2016.

Marlene Rene Rene DuBois, Abdur Rahman Jami's: A Translation Study, New York: Stony Brook University, 2010 AD.

Martin Lings, "The Wine-Song(al-Khamriyyah) of 'Umar Ibn al-Farid", Studies in Comparative Religion, Vol. 14, Nos.3 and 4, Summer-Autumn, 1980 A D..

Dr. Sulayman Derin, From Rabi'a to Ibn al-Farid: Towards Some Paradigms of the Conception of Love, London: Leeds University Press, 1999 A D.

S.M. stern, Petitions from the Mamluk period, in BSOAS, xxix(1966),233-76.

Dhaka University Institutional Repository

A. J. Arberry, The Mystical Poems of Ibn al-Farid, Chester Beatty Monographs No.4, n5 and 6(London: Emery Walker Limited, 1952 and 1956).

R. A. Nicholson, Studies in Islamic Mysticism(London: Cambridge University Press, 1921 AD).

----------, "Ibn al-Farid", The Encyclopaedia of Islam(Leiden:E.J. Brill, 1986 AD), Volume.III.

_____, A Literary History of the Arabs(London: Cambridge University Press, 1956 AD).

A. Gullaume,"Abu'l ‘Atahiyya", The Encyclopaedia of Islam(Leiden:E.J. Brill, 1986 AD), Volume.I.

Dr. Najah Attar, Abul ‘Atahiya His Life and His Poetry, London: University of Edinburgh, 1958 AD.

E.G. Browne. *Literary History of Persia*. 1998, Volumes.1-4.

Paul Smith, Introduction on his Life & Times & poems & his Museum, 2017.

Website: www.newhumanitybooks.com

Thomas Emil Homerin *Umar Ibn alFarid; Sufi Verse, Saintly Life*, New York :Paulist Press, 2011.

_____, From Arab Poet to Muslim Saint: Ibn al-Farid, His Shrine(Columbia: University of South Carolina Press,1994).

প্রফেসর ড. জোসেফ স্কাটুলীন,“‘উমার ইবনুল ফারিদ ওয়া হায়াতুহুস-সূফীয়্যাহ”

----------, "The Mystical Experience of Umar Ibn al-Farid, or the realization of self(ana, I), the Poet and his mystery", The Muslim World, (July-October, 1992), V.82.

ড. খালিদ আলী ইদ্রীস,“রমযিয়্যাতুল-খামর ফিশ-শি‘রিস-সূফী”,International Journal of Academic Research Studies, United Arab Emirate: Abu Dhabi University, June, 2019, No.2

তাহা আব্দুল বাকী সুরূর, মুহীউদ্দীন ইবনুল ‘আরাবী(কায়রো,২০১২খ্রি.)।

Dhaka University Institutional Repository

'Ali Akbar, "Ibn 'Arabi's Notion of Wahdat al-Wujud", Journal of Islamic Studies Culture, June 26, 2016, vol. 4, No, 1.

ড. সাদ্দাম ফাহাদ আল-আসাদী, "তামাহিয়্যাতু রুহিয়্যা ফী শি'রি ইবনিল ফারিদ", আল-মুছাক্কাফ পত্রিকা, ২০১৭ খ্রি. সংখ্যা, ৩৩। www.almothaqaf.com

G. Scattolin, 'The Mystical Experience of Umar Ibn al-Farid, or the realization of self (ana, I), the Poet and his mystery', in The Muslim World, (July-October,1992), V.82.

Marlene Rene DuBois, Abstract of the Thesis entitled, Abdur Rahman Jami's Lawami': A Translation Study, Stony Brook University, 2010 A D.